শিবু ও তার সাথীদের

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে কলিকাতার দাঙ্গায় দপ্তরীপাড়া সর্বপ্রথমে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সারা বাংলার স্নায়ুকেন্দ্র হল ঐ কটি খোলার ঘরে অগণিত স্তূপীকৃত ফর্মা।

প্রথম মুদ্রণের ফর্মাগুলি একান্ত অতর্কিতে দুষ্কৃতিকারীদের লুঠের সামগ্রী হয়েছিল। অনেক কষ্টে তার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করে এই মুদ্রণ। তাই মুদ্রণ সৌষ্ঠবে হয় তো এর একটু তারতম্য ঘটে থাকবে। তাতে দুঃখিত হলেও লজ্জিত হবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি।

প্রকাশক

# প্রকাশকের কথা

নির্জিত শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে প্রগতিসাহিত্যের ভূমিকা হল প্রতিবাদের। তাকে হতে হবে বিপ্লবের হাতিয়ার। তার দৃষ্টিভঙ্গী হবে জনগণের। এখানে লেখকবাহিনীর কাজ হবে ধনিক সমাজের ক্রূর, নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ছলনার কথা পরিষ্কার করে সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া যেন জনসাধারণ সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রেরণা পেতে পারে তা থেকে! জনগণের সংগ্রামের অকুণ্ঠ প্রশংসাই থাকবে এতে।

প্রগতিসাহিত্যের বিচারে আধেয় এবং আধার এই দুইএর যথাযথ সংমিশ্রণ এক মহা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শুধু মাত্র আধেয় যেমন সব নয় তেমনি শুধু আধারই আবার সাহিত্যের উৎকর্ষের মানদণ্ড হতে পারে না। এবং সাহিত্যের আধার সম্বন্ধেও আমাদের মোহবিচ্যুতি ঘটানো প্রয়োজন।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিতে আজও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিজাত আধার (ক্লাশিক্যাল ফর্ম) ঝলকানি জাগায়। কিন্তু সত্যিকার প্রগতিবাদী সাহিত্য তৈরী করতে হলে অভিজাত আধার বর্জন করে আমাদের লোক-আধারকে করতে হবে আবিষ্কার। এ আধার খুঁজে পাওয়াও সহজ কথা নয়।

সত্যিকার গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে সাহিত্যিকদের জীবনের পরিবেশ সর্বতোভাবে বদলে ফেলতে হবে। শ্রমিক, কৃষকদের মধ্যে বাস করে তাঁদের জীবনস্রোতে একান্তভাবে নিজেকে বিলীন করে দিতে না পারা পর্যন্ত তাঁদের দৃষ্টিতে লেখা—গণ-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আধার আবিষ্কার করা অসম্ভব।

রাজনীতিক বিচারে যে সব সাহিত্যিক নিজেদের শ্রেণীচ্যুত, জাতিভ্রষ্ট মনে করে শ্রমিকশ্রেণীরই দর্শনকে জীবনাদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন—তাঁদের গভীর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় নতুন শ্রেণী-সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে। লেখিকার বর্তমান উপন্যাসটিকেও এই পর্যায়ে ফেলা চলে, অকুণ্ঠ চিত্তে। এমনি একজন মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা সমগ্র জাতির জীবন চাঞ্চল্য! গ্রাম্য পরিবেশ থেকে শহরের জনারণ্যে সর্বত্রই আশ্রয়চ্যুত মধ্যবিত্ত মনের ছোঁয়াচ! এ মধ্যবিত্ত মন নিজের সমাজের খোলস ছাড়িয়ে বের হয়ে পড়েছে অনন্ত যাত্রার পথে। উদ্বেগ, বিভ্রান্তি আর সমস্যা-সংশয় জড়িত সে পথ। আর তার পাশেই চলেছে দিগ্বলয় রেখায় কাতার দিয়ে বলিষ্ঠ মানুষের দল—শোষিত সর্বহারার মিছিল—উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র ব্যাকুল! দুঃখ আসে তাদের জীবনে—কিন্তু মূহ্যমান করে বিবশ করে দিতে পারে না সে দুঃখ। কর্ম প্রেরণায় এগিয়ে যায় তারা। তাঁদেরই দলে যে মিশতে হবে তাকেও!

সেই অবিনাশী প্রাণ শক্তির শিকড়ের সন্ধান যে লেখিকা খুঁজে পেয়েছেন তা নিঃসন্দেহ। আর কিছু না হোক গণ-সাহিত্য সৃষ্টির সযত্ন প্রচেষ্টা এর প্রতিছত্রে সুপরিস্ফুট! রসসৃষ্টির ও সার্থকতার মাপ করবেন অবশ্যই পাঠক ও সমালোচকবৃন্দ!

লেখিকার প্রথম গ্রন্থ 'সৃজন' মৃদু আলোড়ন তুলেছিল বাংলার প্রগতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। আশা আছে সে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকবে ত্রিস্রোতায়।

প্রকাশক।

পীতাভ ধানক্ষেতের বুকে নামিয়া আসিয়াছে পশ্চিমগামী সূর্যের স্তিমিত রৌদ্র নিকটে কোনও নিকুঞ্জ হইতে থা'কয়া থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছে বিহঙ্গ দয়িতের বিরহকাকলি। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের উদাস বনবীথি, নীচে ছায়ায় ঢাকা ভরা খালের ঘোলা ঘুর্ণি জল। খালের উপরে একটা সরু বাঁশের সাঁকো। দূরে ধান ক্ষেতের সীমান্ত ঘেঁষা একটা জলা ঝিল।

সাঁকোর উপর দিয়া সন্তর্পণে পা চালায় দুইটি কিশোর-কিশোরী। দূরের শেওলায় ঢাকা ঘন কালো জলের বুকে লাল-সাদা শাপলা ফুলের গুচ্ছ; তারই প্রান্ত ছোঁয়া কাশবনের মৌন ইশারায় চঞ্চল হইয়া ছোটে অশান্ত শিশু মনগুলি। সৌন্দর্য-পিপাসা নয়, তবু কিসের এক কুতূহলী আকর্ষণ এ অপরূপ রূপরাশির!

পদ্মা আর দীপু আসিয়া দাঁড়ায় জলা ঝিলের কিনারায়। এ অমূল্য সম্পদের খোঁজ রাখে শুধু তাহারাই। পাশের সড়ক দিয়া সকাল সন্ধ্যায় যায় আসে গৃহস্থ সংসারী মানুষেরা। তাহারা জানেও না, খোঁজও রাখে না, কত দুর্লভ রূপের খনি লুকাইয়া আছে তাহাদেরই রোজ সকালের চলার পথের প্রান্তে। এ রূপঢালা পৃথিবী ভুলাইয়া আনে দূরের শিশুমনকে।

নিস্তব্ধ অলস মধ্যাহ্নে জীবনমুখর কর্মব্যস্ততায় কিছুক্ষণের জন্য আসে বিরতি, গৃহছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম লয় গৃহীরা, শিশুরা তখন নিঃশব্দে

বাহির হইয়া পড়ে সেই মৌন মধ্যাহ্নের নীরব আহ্বানে। আম কাঁঠালের ছায়ায় ঢাকা মিঠা মাটির শীতল স্পর্শের মাদকতা নরম পায়ের তলায়। গোয়াল বাড়ীতে স্নেহভরা গো-মাতা সস্নেহে গা চাটে গোবৎসের। লিচু তলায় বসিয়া 'বৌ' 'বৌ' খেলে ঘোমটা-দেওয়া তিন বছরের শিশু কন্যারা। মায়েরা যখন ঘুমায়, তাহারা তখন মাতিয়া উঠে আধ-বোঝা জীবনের বাঙ্ময় আনন্দে।

পদ্মাও বাহির হইয়া আসে নিঃশব্দে তাহারই প্রতিবেশী কিশোর সাথী দীপকের ডাকে। লাল পদ্মের সন্ধান জানিয়া আসিয়াছে সে জলা ঝিলের কিনারায়।

দীপক আঁকশি দিয়া টানিয়া আনে সুন্দর ফোটা ফুলগুলি। পদ্মা কাশবনে ঢুকিয়া একমনে কাশগুচ্ছ তোলে।

ফুল তোলা শেষ হইলে আবার ফেরার পথ ধরে দুই জনে হাত ধরিয়া।

সন্ধ্যার ছায়া নামে দূরের বনসীমা রেখায়, গোচারণ ভূমিতে, জলভরা ঝিলে। খালের ওপারে শণের চালায় লতান কুমড়ার ডগায় তখনও লাগিয়া আছে পড়ন্ত রৌদ্রের দুই এক ঝলক। কিন্তু উহা দেখিবার মত দৃষ্টির পিপাসা জন্মায় নাই তখনও তাহাদের অপূর্ণ মনে। তাহারা পা চালায় খালের গা-ঘেঁষা বোর্ডিং বাড়ীর দিকে। নূতন মাষ্টার থাকেন সে ঘরে। পদ্মার দাদারই বয়সী—রথীন্দ্র মাষ্টার। উচ্ছ্বলিত প্রাণবন্ত নূতন শিক্ষক জীবন। কয় দিনেই আকৃষ্ট হইয়া উঠে তরুণ ছাত্রেরা। পদ্মা আর দীপু নূতন মাষ্টারের হাতে দিয়া যায় তাহাদের ভালবাসার উপহার—লালপদ্ম আর ফুলের গুচ্ছ।

নূতন মাষ্টার খুশি হইয়া বলে "বাঃ, চমৎকার ফুলতো, কোথা থেকে আনলে এসব?" সযত্নে কাঁচের গ্লাসে গুছাইয়া রাখে ফোটাফুলগুলি, খুশি

হইয়া উঠে শ্রদ্ধাকারী কোমল মনগুলি—সার্থক, হইয়া উঠে তাহাদের এ অভিযান।

সামান্য একটি বন্যপুষ্পগুচ্ছ!—কিন্তু তরুণ শিক্ষক জানে, ইহার সঙ্গে মাখা আছে কত কোমল মাধুরী। প্রাণের বন্ধন পড়ে অভিভূত মনে। গ্রামের স্কুল শিক্ষকের বৈচিত্র্যহীন একটানা জীবনের এইটুকুই ত সম্বল। এইত আনন্দ। ছাত্ররা ভালবাসে তাহাদের প্রিয় শিক্ষককে। এই ভালবাসাটুকুই ত শিক্ষক জীবনের মধুর সার্থকতা।

সন্ধ্যার পর পদ্মা প্রথমেই ইতিহাসের বই খুলিয়া বসে পড়া শিখিতে। নূতন মাষ্টার ইতিহাস পড়ান। কি সুন্দর হাসিমুখে পড়া বোঝান নূতন মাষ্টার। ছাত্ররা মুগ্ধ হয়, তারও বেশী মুগ্ধ হয় পদ্মা। ছেলেদের সঙ্গেই পড়ে সে। পড়া শেখা আর পড়া দেওয়ার ছন্দে মুখর ছেলেদের মাঝে ছোট্ট একটি ফ্রক পরা মেয়েকে খাপছাড়া লাগে না কাহারও চোখেই।

টিনের বেড়া দেওয়া স্কুলঘর। স্কুলের প্রথম ঘণ্টাতেই রথীন্দ্রের ক্লাস। ঘণ্টা পড়িয়া গিয়াছে—ছাত্রদের মুখে সপ্রতিভ খুশির বন্যা—ইতিহাস পড়া সযত্নে শিখিয়া আসিয়াছে তাহারা। নূতন মাষ্টার মশাইকে খুশি করার আগ্রহে অধীর ছোট ছোট মনগুলি।

রোলকল আরম্ভ হয়। একটি ম্লানবেশ কৃশ ছেলে দুয়ারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করে, "আসমু স্যার?"

"এসো।" মাষ্টার রোলকলের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া উত্তর দেয় মৃদু হাসিয়া।

বলাই-এর নির্দিষ্ট আসনে অন্য একটি ছাত্র বসিয়া পড়িয়াছে। মাষ্টার মহাশয় প্রদীপের পাশের শূন্য স্থানটুকু দেখাইয়া বলে, "ওখানে বসো।"

প্রদীপ স্থানীয় জমিদারের ছোট ছেলে। বলাই একটু ইতঃস্তত করিয়া বসিয়া পড়ে। প্রদীপ মনে মনে বিরক্ত হইয়া ফিসফিস করিয়া বলে "একটু সরে বস্—জামা কাচতে পারিস না—এত গন্ধ কেন তোর গায়ে?"

প্রদীপ উসখুস করিতে থাকে—তাহাদেরই বাড়ীর জঙ্গল পরিষ্কার করে বলাই এর বাবা—তাহাদেরই নফর সে। একটা মৃদু চঞ্চলতা খেলিয়া যায় দুষ্ট হাসিভরা চোখ গুলিতে। একটু মৃদু ফিস-ফিসানি। মাষ্টার মুখ তুলিয়া তাকায়—"কি হোল, আজ বুঝি ভাল লাগছে না পড়তে?"

পিছনের বেঞ্চি হইতে একটি ছেলে উঠিয়া বলে, "সে জন্য না স্যার। বলাই ভূঁইমালীর ছেলে কিনা—তাই।"

বলাই-এর চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠে শিশুমনের ক্ষুব্ধ অপমানে। তা রথীন্দ্রের নজর এড়ায় না। সে বলাইকে কাছে ডাকিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া মিষ্টি সুরে বলে, "ভূঁইমালীর ছেলে তাতে দোষ কি? যে জাতিই হোক, কোনও মানুষকেই ঘৃণা করতে হয় না, প্রদীপ।"

প্রদীপ উঠিয়া বলে, "স্যার, ওর কাপড় এত ময়লা থাকে কেন?"

বলাই লজ্জিত সুরে বলে, "মা যে সোডা কিনতে পয়সা দেয় না; বলে—পয়সা কোথায় পামু।"

কি উত্তর দিবে তরুণ শিক্ষক? মুহূর্তের জন্য চুপ হইয়া যায় সে।

টিফিনের সময় প্রদীপ বলাইকে খেলিতে লইতে চায় না। বলাই-এর বিষণ্ণ মুখখানা দেখিয়া পদ্মার ছোট্ট মনটুকু ভিজিয়া উঠে। সে বলে, "বেশ আমরা আলাদাই খেলবো।" তাহার দলই ভারী হইয়া উঠে। দুই দলে ভাগ হইয়া যায় খেলার সাথীরা।

খেলা শুরু হয়—নোনতা এক, নোনতা দুই, নোনতা তিন। পর পর তিনবারই পদ্মা চোর হইয়া যায়। পদ্মার ঠোঁট ফুলিয়া উঠে, "আমাকে ইচ্ছে করে চোর করে দীপু—দীপুর সঙ্গে আড়ি।" দীপুর মন খারাপ হইয়া যায়—সে কি ইচ্ছা করিয়া পদ্মাকে চোর করে! পদ্মা ছুটিতে পারে না বলিয়াইত চোর হয়।

ঘণ্টা পড়িয়া যায়। হুড়াহুড়ি করিয়া সবাই ক্লাসে ঢোকে। ভূগোলের ক্লাস। ভূগোলের মাষ্টারকে ভয় করে ছাত্ররা। প্রশ্ন আরম্ভ হয়—"পর্বত কাহাকে বলে?" টুকুর উত্তর জিভের আগায় "চারদিকে জল মধ্যে স্থল তাহাকে পর্বত বলে, স্যার?"

মাষ্টার গর্জিয়া উঠে, "কে বলতে পার? পদ্মা তুমি?" পদ্মা উঠিয়া বলে।

"যাও টুকুর কান মলে দিয়ে এসো", মাষ্টার মশাই আদেশ করেন। টুকু ঘামিয়া উঠে—পদ্মা কান মলিবে তাহার! কিন্তু পদ্মা মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

লাষ্ট বেঞ্চি হইতে রাম পদ্মার হইয়া কানমলাটা দিতে চায় টুকুকে। "আমি দেই স্যার?"

টুকু মনে মনে রাগিয়া আগুন হইয়া থাকে। ছুটির পর বাড়ী ফেরার সময় রামের পিঠে এক কিল বসাইয়া দেয়। রামও ছাড়িবার পাত্র নয়। দুইজনে রাস্তার বুকে লাগিয়া যায় রাম-রাবণের যুদ্ধ। কাদায় একাকার হয় শরীর। রামের সার্ট ছিঁড়িয়া যায়। উঁচু ক্লাসের দুইটি ছাত্র আসিয়া পড়ে। একই পথ তাহাদেরও। দুই জনকে দুইটি কান্‌-মলা দিয়া তারা বিচার শেষ করে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রশেখরের হৃৎপিণ্ড এই রূপসী গ্রামের হাইস্কুলটি। গ্রামের ছেলেদেরও প্রাণকেন্দ্র। মাঠের তিনদিক

ঘিরিয়া লম্বা লম্বা টিনের ঘর। স্কুলের সামনেই দক্ষিণে খোলামাঠ, তার গা ছুঁইয়া বাঁকিয়া গিয়াছে কাঞ্চনপুরের খাল। গ্রাম গ্রামান্তর ডিঙ্গাইয়া খালটা গিয়া মিশিয়াছে মেঘনা নদীর সঙ্গে। কীর্তিনাশা ও মেঘনার সংযোগ এই খালের ভিতর দিয়া। গ্রামের ব্যবসায়ী লোকের রক্তের নাড়ী এই কাঞ্চনপুরের খাল।

খালের উপরে কাঠের পুল হইতে দেখা যায় খালেরই গা-ঘেঁষা ছোট্ট একটি আশ্রম। দুইখানা টিনের ঘর। সামনেই সুন্দর একটি দেশী ফুলের বাগিচা। টিনের বেড়ায় ভারতমাতার ছবি। তারই নীচে স্বামী বিবেকানন্দের ফটো ও মহাত্মা গান্ধীর তৈলচিত্র। আশ্রমের সর্বত্র একটা নিখুঁৎ পরিচ্ছন্নতা।

আশ্রমের কাজের চাকা ঘুরিয়া চলে একসুরে—গীতাপাঠ, স্তবপাঠ, বা গান করা, ব্যায়াম করা, রান্না, বাসন মাজা সব মিলিয়া নূতন এক জীবন। একটা সহজ পরিতৃপ্তির ভাব সকলের চোখেমুখে। জীবনের বিরুদ্ধে কোনও ঝাঁঝ নাই, জটিলতা নাই, তিক্ততা নাই মনে। শান্ত ধীর স্থির অকুটিল জীবন যাত্রা।

সম্ভ্রম ও ভক্তির চোখে দেখে গ্রামবাসীরা সংসারে অনাসক্ত আশ্রম-বাসীদের কাজের চাকা। হাটুরেরা কাঠের পুলের উপর দিয়া উঠিতে নামিতে তাকাইয়া দেখে কর্মরত আশ্রমবাসীদের।

হেডমাষ্টার মহাশয়েরই খুল্লতাত ভাই, শশাঙ্কশেখরের হাতে গড়া এই আশ্রমটি গ্রাম্য মানুষের সরল দৃষ্টিতে সম্ভ্রম ছাপাইয়া উঠে তাঁহার হাটাচলার ঋজু ভঙ্গিতে। বয়স অনুপাতে গম্ভীর, প্রশান্ত মুখ-কান্তি, গভীর দৃষ্টি। বলাবলি করে খালপারের মুসলমান গৃহস্থ বৌ-ঝিরা, "ঠিক যেন হিন্দুগো দেবতার মত চেহারা।" সকালবেলায় ছোট বড় নানা আকারের শিশি হাতে উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের

চিঠি লাগিয়া যায় আশ্রমের দুয়ারে। শশাঙ্কশেখর হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স খুলিয়া ওষুধ দিয়া দেয়। সন্ধ্যার পর আবার খোঁজ লইয়া আসে, রোগীরা সব কেমন আছে।

গ্রামবাসীদের বিপদে আপদে এক ডাকে উপস্থিত হয় সে তাহার আশ্রমের ছেলেদের লইয়া। ঘরে ঘরে প্রশংসা ছড়াইয়া পড়ে এ দেবতুল্য মানুষটির।

এরই মধ্যে নূতন এক যুগ আরম্ভ হয়—চরকার যুগ। চরকার আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া লাগে পল্লীর প্রান্তে ও প্রান্তরে। এ আশ্রমেও আসিয়া পৌঁছায়—চরকা, তাঁত, মাকু, নলি, টীনের 'ব', তুলা আর তুলার বীজ। দেখিতে দেখিতে তুলা গাছের চারা বড় হয়, ফুল ধরে, ফল ধরে—বিদেশী পণ্যকে বিদায়ের ইঙ্গিত জানায়।

হাটে যাওয়ার পথে গৃহস্থেরা কাঠের পুলের উপর দাঁড়াইয়া দেখে একটু আশ্রমের এ নূতন কর্মতালিকা—সূতার তাগা দেওয়া, তুলা রোদে দেওয়া, তুলা পাঁজ করা—'ব' গাঁথা। তাঁতের মাকু চালাবার নূতন ছন্দে মুখর হইয়া উঠে আবার মৌন আশ্রমখানি।

নগেন্দ্রশেখরও বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তুলার বীজ দিয়া আসে। কুটীর শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রতি বাড়ীতে তুলার গাছ লাগাইতে হইবে। না হইলে বিদেশী বণিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

তাহার স্কুলের পেছনেও তুলার চারা লাগান হয়। নূতন করিয়া আবার 'রুটিন' করা হয় স্কুলের। প্রতি ক্লাসে একটা করিয়া তাঁতের পিরিয়ড থাকে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে তাঁতী করিমদ্দিকে আনান হয় কাপড় বোনা শিখাইতে।

সুতা কাটার ক্লাসে ছোট ছোট হাতে চরকা ঘুরায় দীপু, টুকু, রাম। পদ্মাও বসে একটা বড় চরকা লইয়া। তাঁতের মাষ্টার আসিয়া ধমক লাগায় টুকুকে, "এ কি সুতো কাটা হচ্ছে, না সলতে পাকান হচ্ছে।"

পদ্মার নলের সুতা দেখিয়া খুশি হয় করিমদ্দি। "বোন ঠারাণের সুতা দিয়া হইব তেনারি পরনের খাসা একখানি ডুইরা।'

চরকা ঘুরানর একটানা সুরের তালে তালে ছোট ছোট হাতগুলি উঠে নামে আবার উঠে। তাদের উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু কিছুদিন পরই উঁচু ক্লাসের ছেলেদের তাঁত বোনার উৎসাহে চিলা পড়ে। তাঁত ঘরে বসিয়া কি যেন কি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলে তাহারা। করিমদ্দি নিরুৎসাহ হইয়া বলে, "এইভাবে মাকু চালাইলে সারাবছরেও কাপড় শেষ হইব না।"

"তুমিই বুনে ফেল কাপড়খানা, করিমদ্দি।" চুপি চুপি আদেশ দেয় হেড মাষ্টার মহাশয়ের ছেলে সুকল্যাণ। তাঁতের ক্লাসে বসিয়া কি একটা বই পড়ে সে রোজই লুকাইয়া লুকাইয়া। বারান্দায় মাষ্টার মশাইর জুতার শব্দ শুনিলে বইখানা লুকাইয়া ফেলে। ভাব-গতিক দেখিয়া কেমন যেন ভয় ভয় করে করিমদ্দির, তবু নালিশ করে না সে উহাদের নামে।

সে জানে হেড মাষ্টারবাবু রাগিলে আর রক্ষা নাই। ছেলের পিঠেই বেত ভাঙ্গিবেন হয়তো কয় জোড়া।

কিন্তু গুপ্ত-সংবাদ গোপন থাকে না। পদ্মা ভয়ে ভয়ে শুনে একদিন তাহার জ্যেঠামনি ছোড়দাকে বাহিরের ঘরে ডাকাইয়া তিরস্কার করিতেছেন। সে নাকি কাঞ্চনপুরে গ্রামের কোন এক দেশের অনিষ্টকারী স্বদেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করিয়াছে।

রণেন চৌধুরীর সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে সুকল্যাণ! রাগে,

দুঃখ বেদনায় স্তম্ভিত হইয়া যায় নগেন্দ্রশেখর। পদ্মা ভীত হইয়া শুনে তাহার জ্যেঠামনির ক্রুদ্ধ ভৎর্সনা—“চুরী ডাকতি করে দেশের সেবা করা হয় না—তা’তে দেশের ক্ষতিই করা হয়।” পদ্মা ভাবিয়া পায় না—কি অপরাধ করিয়াছে তাহার ছোড়দা।

কেন এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহার জ্যেঠামনি? সে তাকাইয়া দেখে, তাহার জ্যেঠিমার মুখখানিও কেমন যেন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। ভয়ে ও ক্ষোভে ছায়াচ্ছন্ন হইয়া উঠে তারাসুন্দরীর মন। সন্তানের ভাবী অমঙ্গল আশংকায় ভয়ার্ত হইয়া উঠে তাহার মাতৃহৃদয়।

নগেন্দ্রশেখর কারাবরণ না করিলেও দেশের জন্যই জীবনের সকল সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিয়াছে! গ্রামে শিক্ষকতার কাজ লইয়াছে-ই সে তাহার এ আদর্শের জন্য। তারাসুন্দরী নিজেও তাহার কুমারী জীবনে হলুদ রংয়ের ছাপান শাড়ী পরেন, মাথার চুলে সাবান দিয়া ঘষিয়া স্বদেশী মিছিলে বাহির হইয়াছেন। তাহাদের সেই—“ভেঙে ফেলে কাচের চুরি—বঙ্গনারী” গান শুনিয়া কত মেয়ে বৌ কাঁদিয়া ভাসিয়াছে, রং-বেরঙ্গের কাচের চুরী হাত হইতে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। ধনী সম্ভ্রান্ত মহিলারা হাতের সোনার চুরি খুলিয়া দান করিয়াছে সেই দেশের ডাকে।

তারপর তাঁহার দেবর শশাঙ্কশেখর—এম-এস্-সি পাশ করা বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলে—সেও ত সব ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এ দেশের সেবায়। কিন্তু তাঁহারই সন্তান, সুকল্যাণ—তাহার পিতা পিতৃব্য—পিসীমার আদর্শ ভুলিয়া বিপথে চলিয়াছে এও কি সত্য হইতে পারে? বুঝিয়া উঠেন না তারাসুন্দরী। কিন্তু সুকল্যাণও তো প্রতিবাদ করিল না। তবে কি স্বামীর অনুমানই সত্য! একটা অকল্যাণকর আশংকায় বুক যেন শুষ্ক হইয়া যায়। তাহার সুকল্যাণ--

সে দেশের অনিষ্ট করিতে চলিয়াছে। চুরি ডাকাতি খুন জখম করিবে এই সুকল্যাণ?

পদ্মা বিহ্বল হইয়া পড়ে তাহার জ্যেঠামনির ক্রোধ, জ্যেঠীমার ভয়, ব্যাকুল বিবর্ণ মুখ দেখিয়া।

নগেন্দ্রশেখর চিন্তাভারাক্রান্ত মনে তাঁহার ঠাকুর ঘরে ঢোকে।

পদ্মা তাহার এই পিসীমা ও জ্যেঠীমার স্নেহেই বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বাবা ও মা থাকে বিদেশে। শশাঙ্কশেখরেরই সহোদর ভ্রাতা ইন্দুশেখর পদ্মার পিতা। পদ্মা এ বাড়ীতে আসিবার পর হইতেই দেখে—বাড়ীর সকলে ভোরে ও সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে বসিয়া, স্তব পাঠ করে ঠাকুরের ছবির সামনে। সেও বসে সকলের সঙ্গে স্তব পাঠ করিতে। সংস্কৃত স্তব—অর্থ বোঝে না। তবু ঐ ধূপের ধোঁয়ায় ও শুরু গম্ভীর ওঁকার ধ্বনিতে তাহার কিশোরী মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। সুর মিলাইয়া সেও স্তোত্রপাঠ করে—ওঁ হ্রীং......

সসম্ভ্রম ভক্তির সঙ্গে সে শোনে তাহার জ্যেঠামনির ধর্ম পুস্তক পাঠ। রামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমায়ের কথা, বীরবাণী। সামনে জলচৌকীতে সমাধিস্থ রামকৃষ্ণদেবের ও পরিব্রাজক বিবেকানন্দদেবের ফটো। উপরে দেওয়ালে টাঙান ঠাকুরের শিষ্যদের ছবি। নীচে শেল্‌ফ্‌ ভরা ধর্ম পুস্তক—গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দদেবের বই।

একটা পরিত্যক্ত বাড়ীতে মেয়েদের স্কুল করিয়াছে পদ্মার পিসীমা —কুসুমলতা। ছাড়াবাড়ীর ঘরগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া খান কয়েক

চাটাই পাতিয়া গ্রামের ধোপা নাপিত ভুঁইমালী নমপাড়ার মেয়েদের লইয়া আরম্ভ হয় এই কুসুমমায়ের স্কুল।

গ্রাম গ্রামান্তর হইতে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়া মেয়েরা আসে স্কুলে পড়িতে—গরীব গৃহস্থ কন্যা। তাহাদের বাপখুড়া ছেলেদেরই পড়াইতে পারে না খাতাপত্র যোগাইয়া, মেয়েদের পড়ান ত স্বপ্নাতীত, ইচ্ছাতীতও।

ভরা বর্ষা। নমপাড়ার মেয়েরা খাল সাঁতরাইয়া ভিজা কাপড়ে পড়িতে আসে। বৃদ্ধামায়ের মন ভিজিয়া উঠে—এদের এত আগ্রহ লেখাপড়া শেখার, বই পড়িবার, তবু শিখিবার কোনও সুযোগ পাইলেই প্রতিপদে বাধা—ঘরে বাইরে চতুর্দিকে। তবু নিরাশ হয় না কুসুমলতা। বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ছাত্রী সংগ্রহ করে।

"কি গো সৌদামিনী তোমার নাতনীরে আর পাঠাও না যে স্কুলে?"

সৌদামিনী অলসকণ্ঠে উত্তর দেয়, "চিঠিপত্র লিখতে শিখছে, আর কি হইবে ইস্কুলে গিয়া, এখন ঘরে থাকলে কামে লাগে। একা মা'টা ত আর পাইরা উঠে না। কর্তাবাড়ীর বাড়কির ধান সিদ্ধ দিছে—" বুড়ি তামাকের টিকা দিতে বসিয়াছে। বড় নাতনীকে ডাকিয়া বলে, "কই ল যমুনা আয় দেখি একটু হাতে হাতে সার দেখি। সন্ধ্যার আগেই চারকুড়ি টিকা গুইনা দিয়া আইতে হইবে সরকার বাড়ীর সেরেস্তায়।"

পদ্মার পিসিমা উত্তর দেয়, "নিজেরা ত মুখ্যু হইয়া সারাজীবন অন্ধকারেই কাটাইলা—এখন এদের একটু আলোর মুখ দেখতে দাও।"

সৌদামিনী হাসিয়া বলে, "বেশী বিদ্যা দিয়া মাইয়া সন্তানেরা ত আর জজ মাজিষ্টট হইব না, সেই সোয়ামীর ঘরের ভাত ফুটান আর পুরুষের কিল লাথি খাওয়া আর পোলা বিয়ান এইত মাইয়া মানুষের কপাল—।"

"সোয়ামীর কিল লাথি, না খাবার জন্যইত লেখাপড়া শেখা।"

"এইয়াই হইল বিধাতার লিখন। একমাত্র বিধাতাই পারে এ লিখন খণ্ডাইতে।" জবাব দেয় সৌদামিনী। অগত্যা সে তাহার ছোট নাতনী হারাণীকে ইস্কুলে পাঠায় মাষ্টারনী মায়ের সঙ্গে।

পদ্মাকে পাইয়া কুসুমলতার বহুদিনের হারাইয়া যাওয়া মেয়েকে মনে পড়ে—তাহার ইন্দ্রানী। তাহার বুকটা শূন্য করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কত দীর্ঘ যুগ কাটিয়া গিয়াছে—তবু ভুলিতে পারে না। উদ্বেলিত মাতৃহৃদয় চোখ ছাপাইয়া উঠিতে চায়। দায়িত্বের নাগপাশে বাঁধা অনবসর কর্মজীবন—তবু এ কর্মটানা দায়িত্বের আড়ালে গোপন হৃদয় জুড়িয়া ঘুমাইয়া আছে আজও তাহার ইন্দ্রানী। পূজা আসিয়া গিয়াছে। জমিদার বাড়ীতে নহবতে সানাই বাজিতেছে। স্মৃতির বুনানী—অতীতের জাল বোনা সানাইর সুরে। তাহারও বাড়ীতে এমনি রসনচৌকী বাজিত—আজ সে সবই নিশ্চিহ্ন পদ্মার স্রোতধারে। বহুদিনের ভুলিয়া থাকা দিনগুলি নাড়া দেয় স্নেহ-ভারাক্রান্ত মনে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, এক তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালা শুভ-সন্ধ্যায় নহবৎ, নাট মন্দির মণ্ডপঘর পার হইয়া পদ্মাপারের এক বিরাট মহলের দরদালানের সামনে পাল্কী আসিয়া থামিয়াছিল দক্ষিণবাড়ীর ছোটকর্তার নূতন বৌকে লইয়া। দশ এগার বছরের এক শ্যামাঙ্গী কন্যা বধূরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল যাত্রাকলস আঁকা উঠানে। তারপর যে বালিকাবধূ একদিন আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিল তাহারই জীবন দেবতাকে। বড়ঠাকরুণ, ছোটঠাকরুণ, বড় জা, সেজ জা, ঠাকুর-ঝিদের অন্দর ও ভাসুরদের মহল শেষে আরও একখানি ঘর অপেক্ষা করিয়াছিল শুধু তাহারই জন্য—যে ঘরে প্রথম দিন নিবেদন

করিল সে তাহার দেবতার পায়ে, যে ঘরে প্রথম চিনিল সে তার স্বামীকে।

কতকালের কথা—তবু মনে হয়—সেই শিশু কন্যার কোমল স্পর্শ আজও লাগিয়া আছে অঙ্গে অঙ্গে। মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিত কুসুম—কোমল অঙ্গে অঙ্গে মৃত স্বামীর স্মৃতি হু হু করিয়া উঠিত। বাইশ বছরের কুসুম আকুল হইয়া কাঁদিত—কোথায় তাহার স্বামী—কোথায় তাহার দেবতা!...

প্রতি বছর পূজার মাসটায় সরগরম হইয়া উঠে গ্রামখানি। বিদেশ হইতে চাকুরীকরা, কলেজে পড়া দাদারা সব বাড়ী আসে। দুর্গাপূজা প্রতি ঘরে না হইলেও, পূজার আড়ম্বর ঘরে ঘরে।

সার্বজনীন দুর্গোৎসব হইতেছে আশ্রমে। এদিকে জমিদার বাড়ীতে মণ্ডপের দুয়ারে শিশুদের ভিড় লাগিয়াই থাকে। মাস ভরিয়া তন্ময় হইয়া দেখে তাহারা কুমারদের প্রতিমা গড়ান— লক্ষ্মী সরস্বতীর আঁচল চিত্রিত করা।

তিল তিল করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকেন মাটির দেবদেবীরা শিশুদের অনুভূতিতে আর কল্পনায়।

সোনালী জাড় দিয়া জড়ান নাটমন্দিরের থামগুলির গায়ে গোপবালাদের সঙ্গে চপল কৃষ্ণের রহস্যলীলাখেলার বিচিত্র ছবি সব। পদ্মার মন বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমস্ত নাটমন্দির ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে সে, পৌরাণিক সচিত্রগাথা, আর বৈষ্ণব গীতিকাব্যের চিরমধুর কৃষ্ণ কাহিনী। ধার দশরার পর হইতে মুখর হইয়া উঠে নাটমন্দির। ষ্টেজবাধা আরম্ভ হয়।

সমস্ত বছরের চাকরির গ্লানি ঝাড়িয়া মুছিয়া যাইতে চায় গামের ছেলেরা এই একটি মাস ধরিয়া।

"হরিশ্চন্দ্র" না "ষোড়শী" হইবে এই লইয়া তর্ক উঠে। পৌরাণিক নাটক একঘেয়ে লাগে। উহা অপেক্ষা সামাজিক নাটকই জনপ্রিয় আজ কাল—মত প্রকাশ করে কেহ কেহ।

পোষ্টমাষ্টারের ছেলে আসিয়া ধরে, তাহাকেও একটা পার্ট দিতে হইবে। সবাই একবাক্যে অস্বীকার করে। 'অসম্ভব'! গেল বছরের "বিল্বমঙ্গল" অভিনয়টাই "মার্ডার" করল এই হতচ্ছারা কার্তিক। নাছোড়বান্দার অনুনয়ে উত্যক্ত হইয়া মড়ার পার্ট দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে গত বছর। তাহাতেই খুশি সে। প্রত্যহ নিয়মিত আসিত রিহার্সেল দিতে বৈঠকখানায়। কিন্তু এত করিয়া রিহার্সেল দিয়াও ছেলেটা শেষ পর্যন্ত মড়ার ভূমিকায় অসাড় হইয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ হাত তুলিয়া সশব্দে মশা মারিতে আরম্ভ করে।

এত বড় একটা কাণ্ড করিয়াও কোন মুখে আবার পার্ট লইতে আসে সে?

কার্তিক উত্তর দেয়, "কি করবো। যা মশা! কতক্ষণ আর মশার কামড় সহ্য করা যায়। তা' এবছর একটা জ্যান্ত মানুষের পার্ট দিন। তা' হ'লেত আর মশায় কামড়াতে পারবে না।"

কাকুতি জানায় কার্তিক। অবশেষে সকলের পরামর্শ লইয়া তাহাকে ছত্রধারীর পার্ট দেওয়া হয়। কিন্তু কার্তিকের চাইতেও বিপদে ফেলিয়াছিল বিলাসপুরের যোগেশবাবু 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় করিতে গিয়া রাণী মুরার পার্ট লইয়া। সাজঘরে সবাই ব্যস্ত পেন্টিং সাজ-সজ্জা লইয়া। অভিনয়ের সময় প্রায় হয় হয়। কিন্তু যোগেশবাবু একখানি থান কাপড় পরিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া সিগারেট পোড়ায় নির্বিকার চিত্তে। সবাই অবাক হয়, "একি আপনার গোঁফ কামালেন না?"

"একরাতের থিয়েটারের জন্য আমার এত বছরের গোঁফজোরা কামিয়ে ফেলি—আর কি।" পরিষ্কার উত্তর দেয় যোগেশবাবু।

অনুনয়, বিনয়, তর্ক বিতর্ক সবই বৃথা। অগত্যা প্রকাণ্ড এক ঘোমটা টানিয়া সে রাণী মুরার ভূমিকায় ষ্টেজে নামে। সেই হইতে জমিদারের বড়ছেলের সঙ্গে তাহার অসদ্ভাব হইয়া আছে। আর কোনও বছর তাহাকে ডাকিবে না রূপসী গ্রামের থিয়েটারে। যোগেশবাবুও দমিবার পাত্র নয়। তাহারা বিলাসপুরেই আলাদা থিয়েটার করিবে—"কারাগার।"

সাংঘাতিক বই কারাগার। সে অভিনয় দেখিয়া দারোগাবাবুও নাকি ভীত হইয়া উঠিয়াছিল কোন এক গ্রামে।

বিলাসপুরের ছেলেরা যোগ দিবে না এবছর রূপসী জমিদার বাড়ীর অভিনয়ে। বিলাসপুরের রমাপতির মত ফিমেল পার্ট কেহ ভাল করিতে পারে না। না পারুক। পাল্টা জবাব দেয় জমিদারের ছেলে। সে কলিকাতা হইতে ওরিয়েণ্টাল ডান্সার আনাইবে। কলিকাতার ডান্সার আসিতেছে—তাহার নাচ দেখিয়াই মুগ্ধ হইবে সকলে।

পূজার ছুটি শেষ হইয়া যায়। আবার শ্লথগতিতে ঘুরিয়া চলে গ্রামের চাকা। রবিশস্য বোনা ক্ষেতের বুকে কুয়াসার ওড়না জড়ায়, আবার শীতের রৌদ্রে কাটিয়া যায় সে কুহেলী। খালপারের মেয়েরা মাঘমণ্ডলের ব্রত করে। কুয়াশায় ঢাকা দীঘির ওপার হইতে শোনা যায় তাহাদের ব্রতকথা—

> "না উঠিতে পারি আমি হিয়লের লেইগা
> সূর্য উঠবেন কোনখান দিয়া—
> বামুন বাড়ীর ঘাটা দিয়া।"

দুপুর বেলায় গাছতলায় তলায় শীতের ঝরা পাতা ঝাড় দেয় খালপাড়ের অন্ত্যজ দুহিতারা। উপরে গাছের শাখায় আবার নূতন পাতা গজায়—আসে বসন্ত।

ফাল্গুন মাস কাটিতে না কাটিতেই হাহাকার ভরা রোগের বীজ ছড়ায় চৈতালী ঘূর্ণিহাওয়া। উত্তপ্ত ধরণী! রৌদ্রের তেজে পুড়িয়া যায় যেন নিড়ানে রত চাষীদের ঘামে ভেজা তামার বর্ণ শরীরগুলি। ডোবাখালের জল শুকাইয়া যায়। সবুজ শেওলার রং ধরে জল-নামিয়া যাওয়া পুষ্করিণীগুলিতে। দূষিত হইয়া উঠে পানীয় জল। আসে রুদ্রমূর্তি কলেরার মড়ক।

গ্রামের বুড়া ডাক্তার বাড়ী বাড়ী সতর্ক করিয়া দিয়া যায়, "সাবধানে থাইকো সব। চরে কিন্তু দারুণ কলেরা আরম্ভ হইছে।"

নিঝুম রাতে একটা নিম পেচক খাল পারের একটা নিষ্পত্র হিজল গাছের ডালে বসিয়া রোজই নাকি ডাকে নিম—নিম—নিম। অশুভ অকল্যাণের বার্তাবহ এই অলক্ষী পেচকের গম্ভীর ডাক শুনিয়া ঘরে ঘরে ভীত হইয়া উঠে মেয়ে বৌ স্ত্রী পুরুষ সকলে। কোলের সন্তানকে শক্ত করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরে মায়েরা। বুড়িরা ঘর হইতে চীৎকার করিয়া বলে, "লোহা পোড়া দিলাম—দূর দূর দূর।"

অর্থাৎ জলন্ত লৌহশলাকার ভয়ে মড়ক-অপদেবতার বার্তাবহ অলক্ষী পেচকটা তাহাদের গ্রামের সীমানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

যমুনার তিন বছরের ছোট বোনটাও ঠাকুরমার কথায় সুর মিলাইয়া বলে, "লোয়া পোড়া দিলাম—দুঃ দুঃ দুঃ।"

অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুইয়া শুইয়া ছোট ছেলেমেয়েদের ছোট্ট ছোট্ট বুকগুলিও একটা অজানা ভয়ে কুঁকড়াইয়া থাকে। ভয়ে বড়দের গা ঘেঁষিয়া শোয় একটু। বহুদূরে শ্মশানমুখী একটা হরিধ্বনি শোনা যায় 'বল হরি হরিবোল।'

"কে জানি আবার মরলোগো পিসী।" প্রতাপ ঘর হইতে চেঁচাইয়া বলে। আরেক ঘর হইতে উত্তর দেয় "পূবের চর নাকি এই বছর ছাপ হইয়া গেল।"

আসল কথা, কথা বলিয়া রাতের 'এ অশুভ অন্ধকার' নিস্তব্ধতাকে সহজ করিয়া লইতে যায় গৃহস্থরা। এ অপদেবতার ভয়ে তাহাদের গা ছম্‌ছম্‌ করে। প্রতাপ উঠিয়া দুয়ারের ঝাঁপ খুলিয়া বারান্দায় বসে তামাক ধরাইতে।

"টিকা ধরালি নাকি প্রতাপ? দে দেখি এক ছিলিম।" যমুনার বাবা হারাধনও উঠে।

"কোন দিক দিয়া উইড়া গেলরে অলক্ষ্মীটা?" বলিয়া সৌদামিনীও উঠে তামাক খাইতে। "দক্ষিণে" স্তিমিত কণ্ঠে উত্তর দেয় হারাধন।

এদিকে দিনে রাতে বিশ্রাম নাই আশ্রমের ছেলেদের। রাত ভরিয়া কলেরা রোগী 'নার্স' করে তাহারা। স্কুলের ছেলেরাও যায় সঙ্গে কেহ কেহ। সুকল্যাণও যাইতে চায়। নগেন্দ্রশেখর বাধা দেয় না। খুশিই হয়। কিন্তু তারাসুন্দরীর ভয় করিতে থাকে মনটায়। মনে মনে ঠাকুরকে ডাকে—কোনও অনিষ্ট যেন না হয়। "ইউক্যালিপ্টাস অয়েল" ছিটাইয়া দেয় ছেলের সার্টে।

সামনেই কোথায় যেন একটা পেচক ডাকিতেছে—তারাসুন্দরীর বুকটা অলক্ষ্যে কাঁপিয়া উঠে।

স্কুলের লাইব্রেরী ঘরের পেছনে একটা টিউব-ওয়েল বসানো হইয়াছে। নূতন। খালপারের ছেলেমেয়েদের চোখে বিস্ময় নামিয়া আসে। কি ভৌতিক ব্যাপার! লোহার ডাণ্ডাটা উঠা-নামা করিলেই জল নামিয়া আসে—টলটলে স্ফটিকের মত জল। পিপাসা থাক না

থাক ছেলেমেয়েগুলি বারে বারে আসিয়া জল খায়। আমোদ লাগে তাহাদের মনে—খাল না, বিল না, নদী না, মোটা নলের মুখ দিয়া জল পড়ে ঝলকে ঝলকে। সোনামিঞা ধমক লাগায়, "টিপকলটা তোরা শেষই করবি। যা বাড়ী যা।"

সোনামিঞা আর সূর্যভূইমালী স্কুলের বাগানের আগাছায় নিড়ান দেয়। হেডমাষ্টার মহাশয় ঢাকা গিয়াছেন ছুটিতে। সূর্যের উপর ভার—স্কুল পরিষ্কার রাখার।

স্কুলের মালি সূর্য। পাঁচ ছয়টি গ্রামের ভিতরে এই একটি মাত্র স্কুল। ক্রোশ দুই পথ হইতেও ছাত্ররা এই স্কুলে পড়িতে আসে। সূর্য গর্ব অনুভব করে। সোনা জঙ্গল সাফ করিতে করিতে উঠিয়া গিয়া একটু জল খাইয়া আসে, "কি কাল্ জল। পরানটা ঠাণ্ডা হয়।" পুষ্করিনীর জল গরম হইয়া উঠে একটু বেলা হইতেই। তৃষ্ণা মেটে না।

ছোট ছেলেপুলেগুলি যাইতে না যাইতেই বৌ ঝিরা আসে কলসী লইয়া জল লইতে। টিউব-ওয়েলটা বসানোর পর হইতেই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এপাড়ায় ওপাড়ায়। পুষ্করিণীর জল আর সুস্বাদ লাগে না।

সূর্য একমনে বাগান পরিষ্কার করে। এই মাস ভরিয়া বাগানে যত খুশি আগাছা জন্মাইতে দিয়াছে সে। কি এক শখের ফুলগাছ বার বছর পর নাকি একটি ফুল দিবে সে গাছে—এমনকি সেই শখের ফুলচারার গায়েও লতাইয়া উঠিয়াছে একটা তেলা-কুচের লতা। সূর্য দেখিয়াও দেখে না। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমায় সে দক্ষিণের ঘুমপাড়ানী হাওয়ায় উড়াইয়া লওয়া লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায়। কিন্তু কাল পত্র আসিয়াছে হেডমাষ্টারবাবু কয়দিন আগেই ফিরিবে—কারণ ইন্‌স্‌পেকটার সাহেব আসিবে স্কুল খোলা

মাত্রই। ভয়ে সূর্য অন্ধকার দেখে—সব এলোমেলো। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি ব্ল্যাকবোর্ড সবই। চতুর্দিক জঙ্গলে ভরিয়া আছে। কেরাণীবাবু ত আসিয়াই বকুনি লাগাইবে, "ব্যাটা—বন্ধের সময়ের মায়না গুলি নিতেত আলিস্যি নাই—যত আলিস্য কাজের বেলায়।"

সে তাড়াতাড়ি দোস্ত সোনামিঞার স্মরণ লয়।

সূর্য কাজ করে বাগানের ভিতর। সর্বনাশ! বিলাতী ফুল গাছগুলি শুকাইয়া গিয়াছে এরই মধ্যে। যতসব ছোটখাট ফুল-গাছ। তার চাইতে পঞ্চমুখী জবা লাগাইয়া দিলে এতদিনে রাঙ্গা হইয়া উঠিত ফুলবাগিচাটা।

আগাছা পরিষ্কার করে বসিয়া বসিয়া সোনা। কি একটা ফুলের ঘ্রাণে মো মো করে বাগানটা।

একটু শুঁকিয়া দেখে সে ফুলটা।

"যাই কওনা ক্যান্ মালিরপো—তোমার বড় বাহাইরা কাম। আর আমাগো দেখছোত—বীজ বুনছি সেই কবে, একটু পানির নাম নাই আকাশে। আল্লার কি মর্জি।"

সূর্যের দৃষ্টি ঘুরিয়া যায় অন্যদিকে। একটু চঞ্চল হইয়া উঠে যেন সে। "আবার জানি কে আইছে জল লইতে। টিপকলটা থুইব শেষ কইরা দেখতাছি।"

সে উঠিয়া যায় ঘরের পিছনে। "কে? যমুনা না কিলো।"

যমুনা ঘাবড়াইয়া যায়, "জলত বাইর হয় না।"

"দেখি সর দেখি।" সূর্য আগাইয়া যায়। জোরে জোরে পাম্প করে। গব গব করিয়া জল পড়িতে শুরু করে নল দিয়া। "নে, ধো তোর কলসী।" কলসী উপচাইয়া জল মাটিতে পড়ে। যমুনা তবু যায় না—বসিয়া বসিয়া পা ধোয়, হাত ধোয়, চোখেমুখে জল দেয়।

এদিক ওদিক একটু দেখিয়া সূর্য গলার স্বর নীচু করিয়া বলে, "যমুনা, তুই যদি আমাগো জ্ঞাতি না হতি..."

"কি হইত তাইলে।" যমুনা জলের কলসীটা কাঁখে তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসা করে।

"তোরে আমি বিয়া করতাম।"

যমুনা লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। "দাঁড়াও আমি তোমার ভাইয়ের কাছে কইয়া দিমু।"

আর কথা বলে না সে, দ্রুতপায়ে চলিয়া যায়। সূর্য কাকুতি করে, "দোহাই তোর, ভাইয়ের কাছে কইস না।"

পদ্মার খেলার সাথী, খালপারের সহচরীরা একে একে অনেকেই শ্বশুর বাড়ী চলিয়া যায়।

শ্বশুর বাড়ী! এই পরিচিত মাঠ ঘাট আঙিনা, খেলার ঘরবাড়ী, আত্মীয়, অনাত্মীয় অতি পরিচিত প্রতিবেশী, সব হইতেই সম্পূর্ণ পৃথক আলাদা মানুষের এক জগৎ! একটা অস্পষ্ট আবছা ভয়মাখা ধারণার কুয়াশা জড়াইয়া থাকে শিশুচিত্তে। বড়দের দেখাদেখি তাহাদের পুতুলেরাও শ্বশুরবাড়ী যায় হলুদগোলায় ছোপান শাড়ির দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া।

পদ্মা আর যমুনা ঘরের পিছনে "ছঙ্গাতলায়" বসিয়া খেলে শিশুঘরকন্যার খেলা। বাড়ীর উঠানে যমুনার ঠাকুরমার গলা শোনা যায়, "ও যমুনা শীগগীর বাড়ী চল্। তোরে দেখতে আইছে।"

যমুনাকে পুতুলের গৃহস্থালি হইতে উঠাইয়া লইয়া যায় তাহার ঠাকুরমা। পদ্মার পূবের ঘরের কাকীমার নিকট হইতে একটু

সুগন্ধ তেল চাহিয়া যমুনার রুক্ষচুলগুলি স্নেহসিক্ত মসৃণ করিয়া লয়।

মনে মনে ভাবে, এমন চাঁদবদন কি আর অপছন্দ হইতে পারে মিনষেদের। ক্ষীণ একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসে ভিতর হইতে, "আহা, মা-মরা মেয়েটার বরাতে সুখ থাকে তবেই হয়।"

মাস না বাটিতেই যমুনার বিবাহ হইয়া যায়। যমুনা শ্বশুর বাড়ী রওয়ানা হয়। নীলপাড় কোরাশাড়ি পরণে, গাটছড়াবাঁধা আঁচলে, দুই হাতে দুই জোড়া লাল শাঁখা—সিন্দূর লেপা মাথায় মস্ত ঘোমটা।

সূর্য বাগানে কাজ করিতে করিতে তাকাইয়া দেখে—বধূবেশী যমুনা চলিয়া যাইতেছে। পুলের তলায় নৌকা বাঁধা রহিয়াছে উহাদের জন্য। সূর্য নিড়ানিটা রাখিয়া উঠিয়া পড়ে, আস্তে আস্তে গিয়া দাঁড়ায় কাঠের পুলের উপরে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পদ্মাও চুপ করিয়া দাঁড়ায় আসিয়া খালের ধারে। মনটা খারাপ হইয়া আছে তাহার। সব চাইতে প্রিয় খেলার সাথী চলিয়া যাইতেছে শ্বশুরবাড়ী।

ধরণীবুড়ি নাতনীকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলে। মা-মরা মেয়েটাকে সেই বুকে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছিল এতদিন সৎমার অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে। চিরদিনের জন্য পর হইয়া গেল আজ যমুনা।

নৌকার পাটাতনে দাঁড়াইয়া মফিমিঞা ডাক দেয়, "ও মালিরপো —এই বেলা নাও না ছাড়লে আন্ধার লাইগ্যা যাইব কিন্তু—বুড়ির হাটের বাক ঘুরতেই।"

হারাধন মাকে তাড়া দেয়, "কাইন্দা আর কি করবি। মাইয়া সন্তানত পরের লেইগাই। এইবার নাও ছাড়ন লাগবো। পাও ধুইয়া নায়ে উঠুক যমুনা।"

যমুনা তাহার আলতাপরা পা ধুইয়া লয় খালের ঘোলাজলে। তাহার 'জামাই' আগেই উঠিয়া নৌকার গলুইয়ে বসিয়া আছে। চল্লিশের উপর বয়স—জুলফিটানা একমাথা বাবরি চুল। তেল কুচকুচে চুলের মাঝখানে দিয়া সিঁথি-কাটা। পান দোক্তা খাওয়া লাল দাঁতের মাঝে দুইটি সোনার খিল দেওয়া দাঁত।

ছইয়ের ভিতর হইতে বারে বারে তাকাইয়া দেখে সে ঘোমটা দেওয়া নূতন বৌকে। কাঠের পুলের উপর হইতে দেখে সূর্য—বধূবেশী যমুনার চোখের জলে ভেজা মুখখানি—সিন্দূর লেপা সিঁথি। হাতে হলুদ সূতার গ্রন্থী বাঁধা যমুনার 'স্বোয়ামীকেও' দেখে একটু তাকাইয়া। মদনের লালচক্ষুর বন্যলোলুপতা আর ক্রন্দনরতা ধরণীবুড়ি—সব মিলিয়া মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া যায় সূর্যের। মফি লগির খোঁচ মারে। ঠাকুরমা বুড়ি দুর্গার নাম স্মরণ করে—ইষ্ট দেবকে ডাকে মনে মনে "মেয়েটা সুখী হয় যেন।" সূর্যের লাল আভা আসিয়া পড়ে যমুনার সিন্দুরলেপা কপালে, লালপাড় শাড়ির ঘোমটা দেওয়া সুন্দর মুখ খানিতে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছে যমুনার। নৌকা খালের উপর ভাসিয়া দূরে ধানক্ষেতের আড়ালে সরিয়া যায়। বিদায়-বিষণ্ণ বনানী। শূন্যতাভরা দিগন্তে বিলীন ধানক্ষেত। সূর্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে পুলের উপরে। বহুদূরে দেখা যায়, নৌকার লগির মাথাটুকু।

সূর্য দাঁড়াইয়া ভাবে, কি কুৎসিত চেহারা ঐ মদন ব্যাটার। রান্নার হাঁড়ির মত গায়ের রং। তবু ঐ কুৎসিত লোকটাই যমুনার উপযুক্ত জামাই হইল! ইহার চাইতে সে যদি যমুনাকে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া যাইত। যমুনাকে লইয়া ঘর তুলিত নদীর চরে—যমুনার হাতে লাগান লাউগাছ লতাইয়া উঠিত সে

ঘরের চালায়…! কিন্তু সমাজ তা সহ্য করিত না। একঘরে করিত তাহাকে। কুলটা নামে পরিচিত হইত যমুনা—মনটা দমিয়া উঠে ভাবিতেও।

আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে সূর্যদেব ঢলিয়া পড়েন। সিন্দূরবর্ণ আকাশ মাথার উপরে। যমুনার সিন্দূরলেপা কপালটা বারে বারে মনে পড়ে। চোখের জলে ঝাপসা করুণ চোখদুটি—মনটা ভিজিয়া উঠে সূর্যের। “একটা নাকছাবিও দেয় নাই যমুনাকে। দিবেই বা কে।” সূর্য মনে মনে ভাবে, একটা নাকছাবি গড়াইয়া রাখিবে সে তাহার জন্য। দ্বিরাগমনের সময় দিয়া আসিবে যমুনার ঠাকুরমার হাতে।

অন্যমনস্ক সূর্য পুল হইতে নীচে নামিয়া আসে। খালের ধারে নমাজঘরে নমাজ পড়া আরম্ভ হইয়াছে। সোনার খোঁজে যায় সে খালের ওপারে। “সোনা মিঞা বাড়ী আছ।”

মফির বড় মেয়ে আমিনা ঘর হইতে উত্তর দেয়, “চাচাত হাট থেইকা ফেরে নাই।”

সূর্য হাটের পথে চলিতে থাকে একা। সোনাকে লইয়া যাত্রাগান শুনিতে যাইবে ঠিক করে। বাজারে পাঁচআনিরা পালাগান দিতেছে…তিনপালা।

বটতলায় সোনার সঙ্গে দেখা হয় সূর্যের। একটা ইলিশ মাছ হাতে চলিয়াছে সে।

“আউজকা যা মাছ সস্তা। চার পয়সা কইরা যাইতাছে ইলশা একটা। যাও কিনা লইয়া আস গিয়া একটা।”

“নাঃ আউজকা আর হাটে যামুনা—চল আউজকা রাতে পালাগান শুইন্যা আসি।”

দুইজনে একসঙ্গেই ফেরে। খালের উপর হাট-ফিরত বড় বড় পাটের নৌকাগুলি রাতের জন্য "পাড়া" "গাড়িয়া" আছে। মস্ত চওড়া খালের মুখে ঘূর্ণি খাওয়া ঘোলাজল। সারিবাঁধা নৌকার পাটাতনে চুলা ধরিয়া উঠিয়াছে সারিসারি। নীচে জলের বুকে উনানের আগুনের ছবিগুলি কাঁপিয়া ভাঙিয়া যায় স্রোতের টানে বহুদূরে। রাত্রির রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত মাঝিরা। মাটির সানকিতে রূপার বর্ণ তৈলাক্ত পদ্মার ইলিশ ধুইয়া উঠায় খলবল্ করিয়া। আরেক মাঝি মসলা বাটে। পেটে জ্বলন্ত ক্ষুধা। সেই কোন ভোরে নাস্তা খাইয়া বাহির হইয়াছে কোন দূর গ্রাম হইতে। সমস্ত বছরের পরিশ্রম সার্থক হইবে গুদামঘরে মালগুলি উঠাইয়া দিয়া আসিতে পারিলে।

বন্দর ভরিয়া মস্ত মস্ত টিনের গুদামঘরগুলি, বহু দূরের নদী হইতেও দেখা যায়। গ্রামে সমৃদ্ধির ছাপ আঁকা।

কাঠের পুলে পা দেয় সোনা আর সূর্য। মনটা আবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে, "আজ যমুনা শ্বশুর বাড়ী চইলা গেল", বিষণ্নকণ্ঠে দোস্তকে জানায়।

সোনা ঠাট্টা করে, "তোমার বরাত খারাপ মালির পো, পাখী উইড়া গেল। তোমাগো মধ্যে যত সব নটঘট।"

সোনা বলিয়া চলে, "এইত আমাগো মধ্যে হইলে যমুনারে তুমি বিয়া করতে পারতা। কোন এক বুড়া শালার লগে বিয়া হইল একরত্তি মাইয়াটার। ব্যাটা নাকি যাত্রার দলে কাম করে—তাইতে বাবরি রাখছে।" সোনার যেন যত রাগ ঐ জামাই ব্যাটার উপর। "তিনকুড়ি টাকার জোরে কিন্যা লইল যমুনারে। তার থেইক্যা কুঞ্জ ছোকরার লগে বেয়া হইলে কত মানাইত। কিন্তু কুঞ্জর বাপ নাকি দুই কুড়ি টাকার বেশী এক পয়সাও দিতে রাজী হয় নাই। ওদিকে যমুনার

বাপও তিনকুড়ি একের কমে মাইয়া দিব না। মা মরলে বাপ তালুই।”

সোনা সূর্যকে সান্ত্বনা দেয়, “আর কি করবা। টাকা রোজগার কর। ওর থেইকা সুন্দর মাইয়ার খোঁজ আমি দিমু। কেরায়ায় যামু যখন—তোমাগো জাইত্যা মাইয়ার খোঁজ লইয়া আমু ক্ষণ গেরামে গেরামে।”

“না, মিঞা আর বেয়া করুম না। এইত ভালু—খামু দামু ফূর্তি করুম। ঠিক করছি—শহরে চইল্যা যামু।”

“তুমি দেখি বেবাগী হইয়া উঠলা। যমুনারে না পাইয়া নাকি?” ঠাট্টা করে সোনা। সূর্য বিদায় লয়—“শীগগীর কইরা আইস কিন্তু—নাইলে জায়গা পামু না।”

কাঠের গুদামের পিছনে পালাগান আরম্ভ হইয়াছে। কুমিল্লার দল। ডে-লাইটের আলোতে ঝলমল করিয়া উঠে ঔৎসুক্যোজ্জ্বল দর্শকদের চোখমুখগুলি। ওদিকে শতরঞ্চির উপর দশ বার বছরের বিষ্ণুপ্রিয়ার নাকের ‘বেসর’ খসিয়া পড়ে। শূন্য কলসী ভাঙিয়া যায়, রাতে কোকিল ডাকে, অমঙ্গল আশংকায় ভীতা বধূ শাশুড়ীর স্মরণ লয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ সুরে দর্শকদের চোখে চোখেও বেদনা জমিয়া উঠে। ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে মহামায়া আসিয়া নিদ্রা ঢালিয়া দিয়া যায়। প্রিয়ার অঞ্চলের গ্রন্থী খুলিতে থাকে নিমাই।

করুণ সুরে গাহিয়া উঠে চতুর্দশবর্ষীয় নিমাই—

“যাই যাই মনে করি—যাইতে না পারি
মায়ার বাঁধন ছাড়ায়ে যাই।”

নিশ্চল দর্শকদল—চোখের পাতা পড়ে না। তাহাদের বুকগুলিও ভারী হইয়া উঠে বিদায়ের সুরে।

সাজ পরিবর্তনের সময়। দলের কর্তা বড় খুশি, ষ্টেশনের বড় বাবু একটা মেডেল পুরস্কার দিবেন নিমাইকে, খাসা জমাইয়া তুলিয়াছে আজ ছোকরা।

রূপসী কর্তাবাড়ীর সেরেস্তার তহসিলদার একটু আড়ালে ডাকাইয়া লইয়া যায় দলপতিকে। পাঁচপালা গান দিবে সামনের কালীপূজায় রূপসীর কর্তা। খুব জম্মান চাই। পাঁচআনিকে ছাড়ান চাই।

পালা শেষ হইয়া যায়। মাথার উপর হিম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত আর বেশী বাকি নাই। সূর্য ও সোনা বাড়ী ফেরে। খুশিতে ভরপুর শ্রোতাদের কণ্ঠ, আগে পিছে, এদিকে ওদিকে। সূর্যের কানে তখনও বাজে আলুথালুবসনা শচীমাতার করুণ বিলাপগুলি। একটা বেদনা মাখান সংলাপ হিমে ভিজা বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে। বিদায় দুঃখ ভরা এ দুনিয়া। প্রাণের জনকে ছাড়িতে চায় না মন—তবুও ছাড়িতে হয়। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়া গেল নিমাই। যমুনাও ছাড়িয়া গেল তাহাকে।

কুসুমলতার দিনেরাতে মুহূর্ত সময় নাই। শিল্প প্রদর্শনী আসিয়া গিয়াছে। বড়দিনের সময় প্রতি বছরই স্কুলের ঘরগুলিতে শিল্প-প্রদর্শনী হয় তাহার উদ্যোগে। সুদূর গ্রাম হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রকমারি পল্লীশিল্প সংগ্রহ করে কুসুমলতা—শীতলপাটি, বাঁশের সাজি, ডালা, কুলা, মাদুর, গৃহস্থ বধূদের শেলাইকরা নক্সার কাঁথা, চটের আসন, পাড়ের সূতার পাখা, বালিশ ঢাকনী—ইত্যাদি রাশীকৃত পল্লীর মেয়েদের হাতের কাজ।

কুসুমলতার স্কুলের মেয়েরাই ভলান্টিয়ার হইয়াছে শাড়ির উপর খদ্দরের ব্যাজ লাগাইয়া। পদ্মাও ভলান্টিয়ার হইয়াছে। দায়িত্ব সম্বন্ধে

সচেতন করিয়া দেয় ছোট মনগুলিকে ঐ রঙিন ফুলআঁকা ব্যাজগুলি। স্ত্রীলোকের রাস্তা দিয়া পুরুষেরা যাইতে পারিবে না। কৃষ্ণনগরের পুতুলের ঘরের দুয়ারে ভলাণ্টিয়ার হইয়াছে পদ্মা ও লক্ষ্মী। দলে দলে মহিলারা আসে যায়। অবাক হইয়া দেখে গ্রামের বৌ-ঝিরা— কৃষ্ণনগরের কুমারদের হাতের সুনিপুণ দক্ষতা। তাহাদেরই সকাল সন্ধ্যার কর্মগাথা বিচিত্র হইয়া ফুটিয়াছে ঐ মাটির পুতুলের দেহভঙ্গিতে।

ঘন ঘন আসে যায় দর্শকেরা। ঠাসাঠাসি লাগে দুয়ারে। পদ্মা ও লক্ষ্মী হিমশিম খাইয়া যায় তাহাদের সামাল দিতে। বছর সাতেকের একটি ছেলে তার ঠাকুরমার পিছন পিছন ঢুকিয়া পড়িতে চায় মহিলাদের দুয়ার দিয়াই।

লক্ষ্মী বাধা দেয়, "এ পথ দিয়া পুরুষরা যাইতে পারবে না।"

সাতবছরের পুরুষটি 'ভ্যাবাচাকা' খাইয়া যায়, কি উপায়, তাহার ঠাকুরমার আঁচল ছাড়িলে এই ভিড়ের মধ্যে সেত পথ খুঁজিয়া পাইবে না। অথচ বার বছরের ভলাণ্টিয়ার মেয়েও সমান হুঁশিয়ার তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে। পদ্মার একটু দয়া হয়—"ওকে যেতে দেরে লক্ষ্মী, ওত ছোটই।" লক্ষ্মী একটু গজ গজ করিতে করিতে হাত ছাড়িয়া দেয়, "ছোট হ'লে কি, পুরুষত।"

বিকাল বেলা মাঠে মেয়েদের ছোরাখেলা, লাঠিখেলা দেখান হইবে। সদর মহকুমার হাইস্কুলের মেয়েরা আসিয়াছে খেলার প্রতিযোগিতায়। বাঁশ দিয়া সীমানা করা চতুষ্কোণ উন্মুক্ত খেলার মাঠে খেলা আরম্ভ হয়— "শির, তামেচা, বাহেরা।" চকচকে ছোরাগুলি উঠে নামে বিদ্যুৎ-গতিতে।

নিশ্বাস পড়ে না দর্শকদের। পদ্মাও বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া দেখে— তাহারই সমবয়সী কি কিছু বড় মেয়েদের কথায় বার্তায় হাঁটাচলায়

সাজসজ্জায় সপ্রতিভ শালীনতা। ভাল লাগে তাহার। ফরসা লম্বা মেয়েটির লাল রিবনবাধা বিনুনিটা দোলে লাঠিঘুরানোর তালে তালে। পদ্মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। পড়ন্ত রোদের আভা আসিয়া পড়িয়াছে মেয়েটির মুখে—সোনার বরণ গায়ের রং যেন ফাটিয়া পড়ে সূর্যের আভায়। এইবার ছেলে ও মেয়েতে লাঠি খেলার প্রতিযোগিতা—বিস্ময় উঠে পঞ্চমে। চোখের পলক পড়ে না কোথায়ও।

খেলার পর পদ্মার সঙ্গে আলাপ হইয়া যায় লালরিবনবাঁধা মেয়েটির। কি চঞ্চল কথাবার্তা—চোখেমুখে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা—পদ্মা অভিভূত হয়। বিপাশা কেমন সহজ ভাবে কথা বলিয়া যায় পদ্মার সঙ্গে, যেন কত দিনের পরিচিত তাহারা। পদ্মার হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়া বলে সে, "চল পদ্মা, আমাদের স্কুলে পড়বে। দেখো তোমাকে কি রকম লাঠি খেলা শিখিয়ে দেবো।"

সন্ধ্যার আগে অধিবেশন আরম্ভ হয়। সকলের শেষে বর্তমান স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয় কুসুমলতা। পদ্মা মন দিয়া শোনে তাহার পিসীমার বক্তৃতা—বৃদ্ধার স্খলিত কণ্ঠের ওজস্বিনী কথাগুলি কাঁপিয়া যায় মৌন শ্রোতাদের মনের তরঙ্গে। পদ্মা তাকাইয়া দেখ, সুন্দর মেয়েটিও শুনিতেছে মন দিয়া। একটু গর্ব অনুভব করে মনে মনে সে। তাহারই পিসীমা। দীর্ঘ বক্তৃতা দেয় কুসুমলতা।

অন্ধকার হইয়া আসে। দূরের এক বাড়ী হইতে শাঁখের শব্দ ভাসিয়া আসে। সন্ধ্যার বাতি পড়িতেছে ঠাকুরঘরে। একটু চঞ্চল হইয়া উঠে মেয়েরা। ভলাণ্টিয়াররা অনুরোধ জানায়, "গোলমাল করবেন না আপনারা।"

দুই একটি কোলের শিশু কাঁদিয়া উঠে গরমে। তাড়াতাড়ি স্তন মুখে দেয় শিশুদের মায়েরা।

পদ্মা মন দিয়া শুনিয়া চলে বক্তৃতা, যদিও সব অর্থ বোঝে না। ভলান্টিয়াররা আবার আসিয়া পাম্প করিয়া ডে-লাইটে আরও উজ্জ্বল করিয়া দেয় আলো। সে উজ্জ্বল আলোর আভা আসিয়া পড়ে লোল-চর্মে। একটা বেদনাক্লিষ্ট তপস্যার দ্যুতি নিষ্প্রভ চোখের মণিতে। বৃদ্ধা দুঃখের স্বরে বলিয়া যায়—"বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত আসিয়া পড়ায় নারী প্রগতি ভিন্ন পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে আমরা ভারতীয় ও বঙ্গনারী। ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য কোথায় ?"

বিপাশা চলিয়া যায় সেই রাতেই। কিন্তু পদ্মার মনে ছাপ রাখিয়া যায় চিরদিনের জন্য। মাত্র একদিনের পরিচয় তবু বিপাশার মিষ্টি কথাগুলি নাড়া দেয় মনে বারে বারে। ভুলিতে পারে না পদ্মা সেই অপরিচিতা মেয়ের প্রথম বলা কথা কয়টি, "এই যে, পদ্মা, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান।"

অবাক হইয়াছিল পদ্মা। আশ্চর্য মেয়ে ত; জানা নাই চেনা নাই তবুও তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান! খুশি হইয়াছিল সে। ভাল লাগিয়া যায় এক মুহূর্তে এই নূতন দেখা লম্বা বিনুনিবাঁধা মিষ্টি মেয়েটিকে। তাহার ক্লাসেই নাকি পড়ে বিপাশা। বিপাশা জিজ্ঞাসা করে, "ম্যাট্রিক পাশ করে কি পড়বে তুমি? সায়েন্স না আর্টস?"

পদ্মা অত ভাবে না। তাহার জ্যেঠামণি যাহা ঠিক করিয়া দিবেন তাহাই পড়িবে সে।

কিন্তু বিপাশা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, আই-এস-সি পাশ করিয়া ডাক্তারী পড়িবে সে। পদ্মা শোনে বিপাশার জীবনের পরিকল্পনা। তাহার চাইতে একবছরের মাত্র বড় তাও এরই মধ্যে কত কিছু ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে বিপাশা। অবাক হয় পদ্মা।

প্রদর্শনী শেষ হইয়া গিয়াছে, আবার ঠিক মত চেয়ার টেবিল গুছাইয়া রাখে সূর্য। পদ্মা স্কুলের বারান্দায় বসিয়া সংস্কৃত শব্দরূপ মুখস্ত করে। স্কুলের বোর্ডিং-এর ছেলেরাও চেক চাদর গায়ে জড়াইয়া রোদবিছান মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়া শেখে। শীত পড়িয়া গিয়াছে। শীতের সকালের কুয়াশা-চেরা রোদটুকু লোভনীয় সকলের।

নূতন একটি ছেলে আসিয়াছে বোর্ডিং-এ। সুকল্যাণ আলাপ করে নূতন-আসা শোভনের সঙ্গে। কলিকাতায় নাম করা কি একটা স্কুলে পড়িয়া আসিয়াছে সে—স্কুলের ফার্ষ্ট বয়। ছলেটি কথা বলে যেন দম না লইয়া, মুখের আগে চোখ দিয়াই যেন সব কথা ঝরিয়া পড়ে। এই বয়সেই এত বই পড়িয়া ফেলিয়াছে সে! গ্রামের ছেলেরা নামও জানে না তার। লা মিজারেবল, বিস্ময়কর শিহরণ নাকি পাতায় পাতায়। পদ্মাও লজ্জিত হয়—নিজের বিদ্যাকে নিস্প্রভ মনে হয় শোভনের তুলনায়। ডিকেনস, ভিক্টর হিউগো, সুইফট—কিছুইত পড়ে নাই পদ্মা! শোভন পড়িয়া আসিয়াছে কত কিছু।

দূর হইতে দেখে পদ্মা—অশোক গাছের তলায় বসিয়া শোভন বইয়ের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে কোন বিস্ময়ময় রহস্যের আড়ালে। এক অজানা পুলকের সুন্দর প্রকাশ ঈষৎ-কটা চোখের চাঞ্চল্যে। রোজই দেখে পদ্মা—শোভনকে রোদে-ভেজা স্কুলের মাঠে। কিন্তু কথা হয় না কোনদিনই। তবু পদ্মা মুগ্ধ হয়—তাহার এই গর্বের আমেজ মাখান ভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যে। একমাস যাইতে না যাইতেই সুকল্যাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘন হইয়া উঠে শোভনের। রহস্যের জালবোনা রবিঠাকুর, সেক্সপীয়ার, ফরাসী উপাখ্যান, ওমর খৈয়াম আর মেঘদূতের মায়াময় পরিসীমা ছাড়াইয়া সে আসিয়া পড়ে ফাঁসীর সত্যেন

আর কানাইলাল ক্ষুদিরামের রোমাঞ্চকর বিপ্লব কাহিনীর অগ্নিশিখার মাঝে। সুকল্যাণদের পোড়োবাড়ীর গোপন আড্ডায় পথ খুঁজিয়া লয় সেও। হাতের লেখায় "সবুজ" পত্রিকা বাহির করে পোড়ো বাড়ীর গুপ্ত সমিতির আবছা অন্ধকার ঘর হইতে। বিপ্লবের সূক্ষ্ম বীজ ছড়ান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে গল্প, কবিতা, অনুবাদ আর প্রবন্ধ।

পদ্মাও পড়ে লুকাইয়া লুকাইয়া। একটা রোমাঞ্চকর চঞ্চল অনুভূতি!

বৈকালের ছায়া নামিতে না নামিতে গ্রাম ভাঙিয়া ছেলেরা সব জড়ো হয় স্কুলের মাঠে। পদ্মাও আসিয়া বসে অশোক গাছের তলায়, পোষ্টাফিস হইতে সদ্য আনা 'বেণু' পত্রিকাটা কোলের উপর বিছান। অদূরে খেলার মাঠ হইতে থাকিয়া থাকিয়া কানে আসে ছেলেদের সমস্বরে উৎফুল্ল চিৎকার—"গোল্'।

আরও কিছু নিকটে কাঁঠালীচাঁপার তলায় বসে ছোট্ট একটি গোলবৈঠক। "গ্রামেতে ছেলেদের জন্য একটি রিডিং রুম ও লাইব্রেরী একান্ত প্রয়োজন।" সুকল্যাণ কথাটা তোলে। সমর্থন করে শোভন বহু দেশের তুলনা ও উপমার প্রাচুর্য দিয়া। সাড়া পড়িয়া যায় মনে মনে চোখে মুখে—আগ্রহে আর চাঞ্চল্যে। প্রশ্ন উঠে—টাকা কোথায়? প্রশ্নের উত্তরও আসে নিজেদের ভিতর হইতেই। শোভন আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়, "নূতন রাস্তা হ'বে শুনছি ডিষ্ট্রিকবোর্ড হ'তে ঐ খালের ধার দিয়ে। ও রাস্তাটা তোলার ভার আমরাই নেব।"

উৎসাহে ভাঙিয়া পড়ে সন্ধ্যার ছায়ায় ঢাকা কাঁঠালীচাপার তলাটা। "দি আইডিয়া।"

অন্ধকার ভোরে, দিন কয়েক পরই "বিগল্" বাজিয়া ওঠে কাঠের পুলে। মাটি টানার ঝুড়ি লইয়া জড়ো হয় গ্রামের ছেলেরা খালের

পারে। বড়রাও উৎসাহ দেয়, "এই ত চাই।" শশাঙ্কশেখর তাহার আশ্রমের ছেলেদের লইয়া আসে খালের ধারে উহাদের উৎসাহ বাড়াইতে। আসে রথীন্দ্রমাষ্টার ও বোর্ডিং-এর ছেলেরা বিপুল উৎসাহ খালপারে। বিগলের শব্দ কাঁপিয়া কাঁপিয়া প্রতিধ্বনিত হয় দূরের নিষ্কম্প বনভূমিতে।

নিড়ানি হাতে ক্ষেতে যাইতে যাইতে চাষীরা তাকাইয়া দেখে অবাক চোখে ভদ্রলোকবাবুর ছেলেদের কাণ্ড কারখানা। একদল মাটি কোপাইয়া দেয় ঝুড়িতে তুলিয়া, আরেকদল ঝুড়ি মাথায় করিয়া লইয়া যায় রাস্তায়। মাটির ঝুড়ি মাথায় গামছাবাঁধা মাথাগুলি নামে উঠে—দূর হইতে তাকাইয়া দেখে চাষীরা। পদ্মাও আসিয়া যোগ দেয়। শোভনের মাথায় নিঃশব্দে তুলিয়া দেয় মাটির ঝুড়ি। আবার শূন্য ঝুড়ি হাতে আসিয়া দাঁড়ায় রবি, "পদ্মাদি, দাওত তুলে ঝুড়িটা।"

ছেলেদের সাথী পদ্মা গ্রামের সর্বত্র। পুকুরের বাঁধান ঘাটলা, স্কুলের মাঠ, আশ্রমের তাঁতঘর, পোষ্টাফিসের দুয়ার জমিদার বাড়ীর নাটমন্দির—অবাধ গতি তাহার সর্বত্র। কলকণ্ঠে মুখরিত স্কুল, খালপারের মুসলমান, নমভূইমালিদের বৈচিত্র্যবহুল জীবনযাত্রা, পিসীমার মেয়েদের স্কুল আর আশ্রম—সব লইয়াই পদ্মার দুনিয়া। এ গ্রাম্য পরিবেশের মাঝে মিশিয়া গিয়াছে তাহার মন অলক্ষ্যে নিঃশব্দে। বিগলের শব্দনিনাদিত এ খালের ধারেও পদ্মা আসিয়া হাজির হইয়াছে কোদাল হাতে, ইহাতে বিস্মিত হয় না ছেলেরা, অস্বাভাবিক মনে হয় না বৃদ্ধদের মনেও। পদ্মা মাটি ভর্তি ঝুড়িগুলি তুলিয়া দেয় গামছাবাঁধা মাথায়।

খালের ওপারে দিগন্তেবিলীন কর্ষিত শস্যভূমি—দূরে কুয়াশায় ঢাকা পার্শ্ববর্তী গ্রামের সীমারেখা, এপারে জীবনরসে মুখর গ্রাম্য ছেলেদের

কলধ্বনি। পদ্মার মনে দিন ভরিয়া রেশ থাকে এ শিশির ভেজা সকালগুলির।

পদ্মা বাড়ী ফিরিয়া শোনে, তাহার মা বাবা বাড়ী আসিতেছেন ভাইবোনদের লইয়া, তাহার মামার বাড়ী যাইবার পথে। পদ্মার মনটা কেন যেন দমিয়া যায় সংবাদ শুনিয়া।

দুপুরের ষ্টীমারেই আসিয়া পৌঁছান তাঁহারা।

পরের দিন ভোরে পদ্মা তাহার ছোট ভাইবোনদের—প্রসাদ আর চিত্রিতাকে লইয়া যায় খালের ধারে।

পদ্মার দাদা প্রকাশ ঠাট্টা করে সুকল্যাণকে, "এ ভাবে কি আর টাকার সমস্যা মিটবে। কটা বই-ই বা তোরা কিনবি ঐ টাকায়?"

পদ্মার বাবা একটু গম্ভীর হইয়া যান, মেয়ের এই যেখানে সেখানে স্বাধীন চলাফেরা দেখিয়া। গম্ভীরভাবেই বলেন, "যা তোরা বাড়ী যা, এখানে কি কাজ তোদের।"

পদ্মা বিস্মিত হয় মনে মনে বাবার এ গম্ভীর আদেশ শুনিয়া।

সে তাহার মাকেও বলিতে শোনে, "এখন ত বড় হয়েছে পদ্মা, ওর এখন ছেলেদের সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ান ভাল দেখায় না। তাছাড়া ঘরের কাজকর্মও শেখা উচিত। এসব তাঁত ফাত বোনা শেখা কি কাজে লাগবে ওর ভবিষ্যতে?" পদ্মার পিসীমা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলেন, "ঘরকন্নার কাজ বাঙালী মেয়েদের আর শেখান লাগে না আলাদা করে, ওটা তাদের জন্মগত শেখা।" পদ্মার মা চিত্রিতাকে প্রতি রবিবারে নিয়মিত রান্না শেখান—মাছের ফ্রাই ও পুডিং করিতে শিখিয়াছে সে এই বয়সেই। গর্ব ঝরে মায়ের চোখে।

পদ্মাও ত গৃহকর্মে অপটু নয়। কিন্তু কুসুমলতা উহার উল্লেখ করে না এখানে। চিত্রিতা পদ্মার সহোদরা। কাজেই প্রতিযোগিতার প্রশ্নই আসে না।

বিষয়টা এইখানেই শেষ হয় না। পদ্মার বাবাও আলাপ করে তাহার জ্যেঠামণির সঙ্গে। মেয়েদের স্কুল যখন নাই গ্রামে, তখন ওর একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করাই শ্রেয়। এ ভাবে গ্রাম্য ছেলেদের সঙ্গে হৈ চৈ করা ভদ্র ঘরের মেয়ের পক্ষে অশোভন।

ব্যথিত হয় নগেন্দ্রশেখর—ব্যথিত হয় কুসুমলতা। গ্রাম্য ছেলেদের প্রতি প্রচ্ছন্ন এই অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসে সূক্ষ্ম পীড়া দেয় তাহাদের মনে। এভাবে বন্ধন দিয়া কি মানুষের কু-প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে আনা সহজ হয়। উহাতে ক্ষতি হয় বরং।

পদ্মা আর মাটি কাটিতে যায় না। তারাসুন্দরী নিষেধ করে, "থাক না গেলি আর।" তাহার মাবাবা যখন পছন্দ করিতেছে না গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে মেলা মেশাটা—নাই আর গেল ভাবে তারা-সুন্দরী।

কিন্তু এক ক্ষীণ অপমানের বোধে আহত হইয়া উঠে পদ্মার অভি-মানী মন। তাহার পিতাও তাহাকে বিশ্বাস করে না। ঘরের বারান্দায় বসিয়া পরীক্ষার পড়া শেখে সে—দূরে বিগল বাজিয়া উঠে। যেন ঘর-ছাড়ার ডাক আসিতেছে দূরের বাতাসে কাঁপিয়া। পদ্মার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। বসিয়া বসিয়া ভাবে সে, এতক্ষণে হয়তো খালপারটা ভরিয়া গিয়াছে কোদাল আর ঝুরি হাতে গ্রামের ছেলেদের কর্ম-ক্ষিপ্রতায়।

রাস্তা বাঁধান প্রায় শেষ হইয়া আসে—পুল ছোঁয় ছোঁয়। উৎসাহে খাল পারটা ফাটিয়া পড়ে যেন, খালপারের উলঙ্গ ছেলেরা

সারি দিয়া দাঁড়ায় আসিয়া, বৌরা ঘরের ফাঁক হইতে দেখে—ভদ্রলোকের ছেলেদের তাজ্জব ব্যাপার।

পদ্মা দূর হইতে শোনে তাহাদের উল্লসিত চিৎকার "পোল্ পোল্।"

পদ্মার মনটা ম্লান হইয়া আছে সারাদিন। তাহার বহু প্রতীক্ষার দিনটি আগত আজ। আজই থাকিতে পারিল না সে সেই কচি রোদ বিছান মাঠের প্রান্তে!

স্কুলের মাঠ, পুকুরের ঘাটলা পোষ্টাফিসের বারান্দা, সব হইতেই দূরে সরিয়া আসে সে।

পদ্মা নিঃশব্দে নীরবে বন্ধ অন্দর মহলে ঢুকিয়া পড়িল সকলের অজান্তে—অলক্ষ্যে।

আপন আনন্দেই সে যেমন অধিকার বিস্তার করিয়া ছিল সর্বত্র আবার আপন ব্যথার সুরেই লুকাইয়া রাখে সে নিজেকে—কেহ জানিলও না—খোঁজও রাখিল না বন্দিনী পদ্মার এ আহত ব্যথার স্থানের।

সন্ধ্যার ছায়া নামে অশোক গাছে—দূর হইতে দেখে পদ্মা। তাহার মনেও ম্লান ছায়া নামিয়া আসে। ছেলেরা সব হল্লা করিতে করিতে মাঠ হইতে ফিরিতেছে—পদ্মা শোনে দালানের সিঁড়িতে বসিয়া ছেলেদের কলধ্বনি। শোভনও চলিয়াছে তাহাদেরই বাহির বাড়ীর সামনে দিয়া—হাস্নাহানার মৃদু গন্ধ ছড়ান সরু মাটির পথে।

পদ্মা অনুভব করে কি এক অতনু ব্যথার কাতরতা। সামনেই একটা-কাঠ-গোলাপ গাছে লক্ষ্মী পেচকগুলি ডাকিয়া উঠে একসঙ্গে। খালের ওপারে ভূইমালী বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি নারিকেলের মালা বাজাইয়া ঝিঁ ঝি পোকা ধরিবার ছড়া শুরু করিয়াছে—

"ঝিঁ ঝি লো আয় লো।..."

পদ্মা উন্মনা হইয়া যায়। দূর হইতে ভাসিয়া আসে তাহাদের এ ছড়া বলার সুর। পদ্মার নূতন কাকীমা তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে চলিয়াছে। জ্যেঠীমা ধূনা ঘুরাইয়া যায় ঘরে ঘরে। এখুনি ডাক পড়িবে জ্যেঠামণির—স্তোত্র পাঠে। পদ্মা বিষণ্ণ হইয়া ভাবে, আর কোনদিনই কি সে ঐ স্কুলের মাঠে যাইতে পারিবে না। আশ্রমেও যায় না পদ্মা আজ কতদিন। তাহার অসমাপ্ত কাপড় খানা কে বুনিতেছে কে জানে।

পূজা আসিয়া পড়িতেছে—ছেলেরা অভিনয় করিবে। কিন্তু পদ্মা আর কোনদিন যাইবে না তাহাদের রিহার্সেল শুনিতে।

সুকল্যাণ তেল মাথায় দিয়া ডাকে, "কই পদ্মা নাইতে যাবি না?" তারাসুন্দরী আপত্তি জানায় "ও বাড়ীতেই চান করুক।"

"ও পদ্মা বুঝি লেডী হ'য়ে উঠেছেন!" ঠাট্টা করে সুকল্যাণ।

পদ্মা বোঝে, একটা মৃদু বেদনা বোধের সঙ্গেই বোঝে, সে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার এত আদরের ছোড়দা ও তাহার মাঝখানে যেন একটা পর্বত প্রমাণ পার্থক্যের চেতনা উঁকি মারিয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে একটা লজ্জা ও সংকোচের পর্দার আড়াল হইতে।

যমুনার জামাই দ্বিরাগমণ করিতে যে শ্বশুর বাড়ী আসে আর নিজের দেশে ফিরিবার নাম করে না। যমুনার বুড়ি ঠাকুরমার ঘর-

খানিতে সে দখল বসাইয়া লয়। দেশে তাহার আছেই বা কি? একখানা দোচালা ঘর—তারও টিনগুলি আবার বন্ধক দেওয়া এক মুদীর কাছে। এখানে কয়দিনেই পাড়াপড়শী শালীদের আদর আপ্যায়নে ও ঠান্দি শাশুড়ির যত্নে করা মুড়িমুড়কিতে তাহার মন জমিয়া উঠে। শীগ্গীরই নাকি কর্তা বাড়ীতে কবিগানের বায়না দেওয়া হইয়াছে। সে নিজেও কিছুদিন যাত্রার দলে কাজ করিয়াছে। দলের কর্তার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় এখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। অবশ্য সে খবরটুকু শ্বশুরবাড়ীতে বলা চলে না, বৌয়ের কাছেত একেবারেই না।

সবাই জানে তাহাদের দলের কর্তার কোনও বায়না হাতে নাই, তাই মদনের ছুটি এখন কিছুদিন।

সারা সকাল মদন বড়শির 'আধার' (টোপ) ঠিক করে ভাত আর রাব-গুড় মাখিয়া। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন সারিয়া, একটু ঘুম দিয়া উঠিয়া, বসে খালের ধারে। একেবারে সন্ধ্যার আগে 'খালুই' ভরা টেংরা, পুটি, টাকি লইয়া ঘরে ফেরে। ঠান্দি খুশিতে ফোকলা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলে, "খাসা তর তাজা মাছত"। একটু মাছ হইলে তবু চারটি ভাত খাইতে পারে—বুড়া হইলে রুচির বড় বাছ আরম্ভ হয় মানুষের।

বছর ঘুরিয়া আসে। কর্তাবাড়ীতে কবিগান। সপ্তাহ ভরিয়া দিনেরাতে গান চলে। গ্রাম গ্রামান্তরের পুরুষেরা চঞ্চল হইয়া উঠে—মেয়ে কবির দলের গোলাপী নাকি পুরুষদলের দলপতিকে ছড়া কাটায় একেবারে নাজেহাল করিয়া দিয়াছে। মফিমিঞা উৎফুল্ল হইয়া সুর টানে একটু গোলাপীর অনুকরণে। মদনও খুশি হইয়া উঠে। সে একটা পানবিড়ির দোকান দিয়াছে কর্তাবাড়ীর পথে। গোলাপীকে নিজ হাতে পানের খিলি সাজিয়া দিয়াছে সে। তাহার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। মদনের রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটি চকচক্

করিয়া উঠে মফিমিঞার মুখে গোলাপীর প্রশংসা শুনিয়া। সেও সায় দেয়, "মিছরির মত গলা গোলাপীর, আমার বাপের জন্মে এমন গলা কেউ শোনে নাই।" পানবিড়ি কেনা বেচার ফাঁকে ফাঁকে বাবরি চুলে একটু চিরুনি বুলায় সে। কে জানে কখন গোলাপী পান দোক্তার প্রত্যাশায় আসিয়া পড়ে। শুভ মুহূর্ত বৃথা না যায়। গোলাপী আসে ঠিকই। দোকানীকে সে চিনিয়া রাখিয়াছে। কাল রাতে পানের খিলিতে সুগন্ধ কেশরবিলাস ঢালিয়া দিয়াছিল দোকানী। কেন জানে গোলাপী।

নাটমন্দিরে আসর জমিয়া উঠিয়াছে। দলের আর একটি কবিমেয়ে শৈলর গানের পালা এখন। শৈলর গলা সপ্তমে উঠিয়াছে তবলার তালে। মেয়েলী সুরের মাদকতা দর্শকদের চোখেমুখে। গোলাপী উঠিয়া আসে আসর হইতে—পান না খাইলে গলা শুকাইয়া আসে তাহার। দলপতির চোখ এড়ায় না। তিনতিনটা মেয়ে জোগাড় করিয়াছে সে। উহাদের জন্যইত তাহার আজ এত পসার। তাহার উপর গোলাপীর গলাও আছে, রূপও আছে।

"একখিলি পান খাওয়াও দেখি—ঠিক কালকের মত করে সেজে।"

মদন গলিয়া যায়। মনে আছে তবে, গতরাত্রির পানের সুগন্ধ ভোলে নাই গোলাপী।

পানের খিলি হাতে লইতে লইতে জিজ্ঞাসা করে গোলাপী কামনা কাতর ঠোঁটের সরস হাসিতে—"কি নামগো তোমার দোকানী—ঘর বুঝি কাছেই।"

দিনের বেলায় রাত্রি জাগরণের অবসাদ মাখা সমস্ত শরীরে—ঘুম ভরা চোখে কাজ করে যমুনা। "বাসী" কাজ সারিয়া রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসনের পাঁজা লইয়া ঘাটে যায়।

এখনও কানে বাজে কবি মেয়েদের গানের সুর। বাদ্যকর ব্যাটার মাথা ঝাঁকুনিরই বা ঢং কত। মনেমনেই হাসে যমুনা। হঠাৎ চোখ পড়ে খালের ওপারে। মদন বঁড়শি লইয়া বসিয়াছে এই ভোর বেলায়; তাহার পাশে বসিয়া কে এক মেয়েমানুষ। লক্ষ্য করিয়া দেখে সে, সেই কবির দলের সুন্দরী মেয়েটি। এক মূহূর্তে যমুনার মন বিষাইয়া উঠে। গানের সুন্দর সুরগুলি কোথায় মিলাইয়া যায়। একটা অসহ্য গ্লানিকর তিক্ততা। গুম হইয়া বসিয়া বাসন মাজে যমুনা জোরে জোরে।

সারাটা দিনই মুখভার করিয়া থাকে যমুনা। উনানের উপর ডালের হাঁড়ি বসাইয়া পাতা দিয়া জ্বাল ঠেলে। শুকনা পাতা গুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। জ্বলন্ত আগুনের শিখায় যমুনার মলিন মুখখানিতে প্রতিচ্ছায়া পড়ে মনের তলার বিতৃষ্ণার। হইলই বা পুরুষমানুষ। তার জন্য সাতখুন মাফ। একেবারে দিন দুপুরে সূর্যের তলায় বসিয়া একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে ঢলাঢলি। রাগে রাগে আধাসিদ্ধ ডালে সম্বরা দিয়া দেয়। ধরণীবুড়ি শাক বাছিতে বাছিতে তাকাইয়া দেখে, "ও কি লো, এ কেমন ছিড়ি রাঁধন। এমন রান্না পুরুষ মানুষের পাতে দেওয়া যায়?"

যমুনা রাগিয়া উঠে, "দিনরাত শুধু ঐ এক কথা। পুরুষ মানুষ! ক্যান মাইয়া মানুষ কি আর মানুষ না।"

ঠাকুরমা বোঝে সব। নাতনীর পছন্দ হয় নাই জামাইকে। কিন্তু কি করিবে সে। সবই কপাল। তা' না হইলে বাপই বা কেন এক কুড়ি টাকার জন্য কাঞ্চনপুরের অমন সুন্দর কুঞ্জ ছোঁড়াকে হাতছাড়া করিবে।

তাই সৌদামিনী এখন অন্য পন্থা ধরিয়াছে। নাতনীকে বুঝায়। অভিজ্ঞতায় ঠাসা জীবনের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সে। যমুনার

ঠাকুরদার নিষ্ঠুর প্রহারগুলি ভাবিলে আজও চক্ষু স্থির হইয়া যায়। তবু ত ছয়টি ছেলেমেয়ে লইয়া এ দীর্ঘ জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে জীবনের শেষপ্রান্তে। রোগতাপ, শোকদুঃখে, সংসারের কাজকর্ম অভাব অনটন আর পূজাপার্বণ সব মিলিয়াই একসুরের ঐক্যতান। স্বামীর অত্যাচারে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিত আবার সে দুঃখ ভুলিয়াও যাইত অতি সহজে সংসারের একটানা কাজের স্রোতে। যমুনাকেও বুঝায় সে, "মেয়ে মানুষ যদি রাস আলগা করিয়া দেয়, তবে ঘোড়ার লাগাম ছুটিয়া যাইতে কতক্ষণ!"

যমুনা বড় হইয়াছে—যৌবনের সাড়া সর্বাঙ্গে। দেহের সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন আসে, আসে পূর্ণতা। সাজগোজ ভালবাসে সে। আরেক ঘরের খুড়ির নিকট চুলের ফিতাকাটা মাথার ফুল লইয়া যায়। মদন একশিশি সুগন্ধ তৈল আনিয়া দিয়াছিল। সুগন্ধ তেলের মিঠাগন্ধে মনটায় একটু খুশির হালকা মোচর দেয়। বড় একখিলি পান মুখে ঠাসিয়া পাড়ায় একটু ঘুরিয়া আসে বিকালবেলা। দূর সম্পর্কের কাকা প্রতাপ নূতন সংসার পাতিয়াছে বৌকে বাপের বাড়ী হইতে আনাইয়া। সুন্দরবৌরও মনে পরিপূর্ণ জোয়ার। যমুনাকে দেখিয়া একটু রসিকতা করে, "কি লো, যমুনা, সুগন্ধি তৈলের ঘেরানে যে ভুর ভুর করে! জামাই বুঝি আইন্যা দিছে? তারপর, এখন রাত্রে জামাইর ঘরে যাসত? তোর ঠাকুর মা সেদিন কইতাছিল—'মাইয়াটারে লইয়া কি বিপদেই পড়ছি—রাত্রে মোটে জামাইর ঘরে যাইতে চায় না।' ক্যান, লো—বিয়া হইছে বয়স হইছে এখন আবার ঠাকুমার কাঁথার তলে কি?"

যমুনার মুখ কাল হইয়া উঠে সুন্দরখুড়ির কথা শুনিয়া। চুপ করিয়া থাকে। সুন্দরবৌ ভাতের জাল ঠেলিতে ঠেলিতে বলে, "জামাই কি বাঘ না ভাল্লুক? এত ডর কিসের?"

সূর্যের মনের খবর আজ আর অজানা নয় যমুনার। "দেওর বুঝি কামের থেইকা ফেরে নাই।" জিজ্ঞাসা করে সে।

"না দেওরত কাঞ্চনপুরে গেছে বুড়ামায়ের ইস্কুলের কি কামে।"

যমুনা জানে তাহা। তবু যমুনার ভাল লাগে সূর্যের কথা বলিতে ও শুনিতে। মনে মনে "ভাবে কালো হইলে কি হইবে। চোখেমুখে ছিড়ি আছে মালির পোর। আর তার অদৃষ্টে কি জুটিল—ধর্মের ষাঁডটার মত ঘুইরা বেড়ায় ব্যাটা।" জ্বলিয়া যায় যেন যমুনার ভিতরটা।...

সূর্য আর প্রতাপ দুই ভাই। প্রতাপের জন্য ছোট্ট একটি বৌ লইয়া আসে যেদিন তাহার মা, ঘরে ঘরে তাহার রূপের প্রশংসা ছড়াইয়া পড়ে। ভদ্রলোক বৌ ঝিরা পর্যন্ত বলাবলি করিত, "এযে গো গোবরে পদ্মফুল।"

প্রতাপ এই নয় বৎসর যাবৎ কর্তাবাড়ীর জমিতে কাজ করিতেছে। বার মাসে তের পর্ব, ক্রিয়াকর্ম লাগিয়াই থাকে। শীত পড়িয়া গিযাছে—ছোট কর্তার বাংলো বাড়ীর প্রাঙ্গণে রং বেরঙের মরসুমী ফুলের ভিড়। ভিতরে নূতন কেনা রেডিওতে দেশবিদেশের খবরাখবর, গানবাজনা চলে নিত্য সকাল সন্ধ্যায়। বিস্ময়াভিভূত কামলারা সব অর্থহীন দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে—তাজ্জব ব্যাপার! বারে বারে উঁচু বাঁশটার দিকে তাকায়—যদি কোনও রহস্যের সন্ধান মেলে ঐ বাঁশের ডগায়!

হারাধন খুশির স্বরে বলে, "সেখের পো শুনলানি। কালে, দিনে কতই যে দেখুম। মুখ্যু মানুষ আমরা কিছুই জানলাম না।"

মফিমিঞা প্রসন্ন হাসি হাসে।

বাড়ী গিয়া মাটির সানকিতে ভাত মাখিতে মাখিতে মেয়ে, বৌর কাছে গল্প করে, "বিলাতের কথাও শোনা যায় নাকি।"

ছোটমেয়ে আমিনা আবদার জানায়, "বাজান আমাগোও একদিন লইয়া যাইয়েন।"

রাত শেষ হয় হয়। প্রতাপের ঘুম ভাঙিয়া যায় সিংজির চিৎকারে। কর্তাবাড়ীর হিন্দুস্থানী দরওয়ান লাঠি ও লণ্ঠন হাতে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ডাক দেয়, "ও ধরণী বুড়ি। হারাধনের মা শীগ্রীর চলো কর্তাবাড়ী।"

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া শীতে ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে ছোটে মাষ্টার বাবুর উঠানের উপর দিয়া।

ভিতর হইতে পদ্মার জ্যেঠীমা ডাকিয়া বলে "কে যায় গো"—

"আমি গো আমি। ছোট কর্ত্রীর ব্যথা উঠছে। আশীর্বাদ করবেন পোলা যেন ধরতে পারি।" ছোট কর্তার প্রথম সন্তান আসিতেছে। ধাত্রী মনে মনে হিসাব করে, পুত্র সন্তান হইলে একখানা গায়ের চাদর চাহিয়া লইবে। বুড়া হাড় হইতে শীত যেন আর ছাড়িতে চায় না মাঘের সন্ধ্যায়।

ধরণীবুড়ি আঁতুরে ঢোকে চিন্তাকুল মনে।—আকাশ ফর্সা হইয়া আসে। বুড়ির শক্ত কর্কশ হাতের উপর নরম তুলতুলে ক্ষুদ্র একটি শিশু আসিয়া পড়ে। বৃদ্ধার চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, উৎফুল্ল হইয়া চেঁচায়—"জোকার দাও, জোকার দাও—পোলা হইছে।"

উলুধ্বনী শুনিয়া পাড়ার সকলেই কান সজাগ করিয়া গোণে—এক দুই তিন…

"পাঁচ ঝাক পড়লো লো, ছেলে হইছে।" পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই খুশি হয়—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে পৃথিবীর কোলে—মানুষের বলিষ্ঠ বংশধর। "কার ছেলে হইল। রাইর বৌর নাকি ?"

"আ মরণ বুড়ির, ছোট কর্তীর যে কাল রাত থেইকা ব্যথা উঠছে, তাও জান না ? ছোট—এইবার, রসগোল্লা চাওত।"

ক্ষ্যান্ত খেজুরতলা দিয়া ছোটে কর্তাবাড়ীর অন্দর পথে। রাধা কানাইর হাত ধরিয়া দৌড়ায়, "কর্তাবাড়ীতে রসগোল্লা বিলাইতেছে—ছেলে হইছে।"

সুন্দর বৌ চেঁচাইয়া বলে, "রাধা আমার ভাগেরটাও আনিসলো।"

ধরণীবুড়ি সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ী ফেরে। মন খুশিতে আনচান। দন্তবিহীন একগাল হাসিয়া বলে, "এই টানা টানা চোখ—আর ভুরু কি রাজপুত্তুরই হ'বেন কালে।"

নবাগত শিশুর বাপকেও সেই ধরিয়াছে প্রথম পৃথিবীর কোলে। এখন তাহাকে দেখিয়া সমীহ করে সে—তাহাদেরই মনিব।

"যমুনা গেলি কইল—দেত একটু তামাকের কল্কিটা। সারারাত একঠায় বসা, কোমরটা ধইরা গেছে।"

সুন্দর বৌ ঠান্‌দিকে একটু উস্কাইয়া দেয়, "কোমরই ধরুক আর যাই ধরুক—ছে'ল যখন ধইরা আইছেন—তখন পোষাইয়া যাইব।"

ধরণীবুড়ি হাসিয়া বলে, "ও, তোর পেটের পোলা ধরতে পারলাম না, তাই বুঝি হিংসা হইতেছে।"

সুন্দরবৌর চোখ দুইটি নত হইয়া যায় ব্যথাহত লজ্জায়।

কি এক নূতন বিস্ময় যেন দেখা দিয়াছে পদ্মার মনে। কুহেলী মাখা বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে সে। সন্ধ্যার কাতর ছায়া নামে উঠানের বুকে। বাহিরের বাগান হইতে একটা পরিচিত মিঠা ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে। দূর হইতে দেখে পদ্মা, মাঠ হইতে ঘরে ফিরিতেছে শোভন। দীঘির পাশ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে

সে। আবছা আঁধারে অস্পষ্ট হইয়া যায় এক আবেশ মাখান সুন্দর দেহভঙ্গি।

সুকল্যাণ কলেজে পড়িতেছে। তাহার পড়ার টেবিলটা শূন্য পড়িয়া আছে। বড় খালি লাগে পদ্মার। সুকল্যাণের অভাবটা বড় তীব্র হইয়া উঠে। সে দিন গোণে, কবে পূজার ছুটি হইবে, কবে আবার বাড়ী ফিরিবে সুকল্যাণ।

শশাঙ্কশেখর জেলে আছে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাহার জেল হয় এক মদের দোকানে পিকেটিং করাতে। তারপর মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজবন্দী করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে হিজলী ক্যাম্পে। মনে মনে হিসাব করে নগেন্দ্রশেখর, 'শশাঙ্ক আজ দুই বৎসর জেলে।' বিচারবিহীন এ বন্দীজীবনের পরিধি কত দীর্ঘ কে জানে। ছাড়াছাড়া লাগে সব কিছু। তার উপর সুকল্যাণ বিদেশে। তাহার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নাই স্নেহাতুর পিতার মনে। যা' দিন কাল পড়িয়াছে—উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের হিতাহিত জ্ঞানের অভাব বড় বেশী। ভাল ভাল ছেলেগুলিও এক মোহের বশে ছুটিয়া চলিয়াছে, অন্ধ দেশসেবার নামে। তাহার সুকল্যাণও যদি ভ্রান্ত পথই ধরে! অহেতুক হয় না শংকা। সংবাদ আসে—সুকল্যাণ ধরা পড়িয়াছে এক রিভলভার কেসে। হতশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া বিনিদ্র রজনীর আঁধার ভেদ করিয়া দেখা দেয় প্রথম আলোর আভাস। বহুদূরে আজানের সুর শোনা যায়। নগেন্দ্রশেখর শয্যাত্যাগ করিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া বসে ধ্যানমগ্ন হইয়া। তারাসুন্দরী ব্রহ্ম সঙ্গীতের সুর দিয়া বুকের ভিতরের চাপা কান্নাগুলিকে গুঁড়াইয়া দিতে চায়। নগেন্দ্রশেখর চুপ হইয়া শোনে। তাহাদের প্রথম

বিবাহিত জীবনের প্রতিচ্ছায়া আঁকা স্বরধ্বনি। শিশু সুকল্যাণের আধফোটা কথা আর কৌতুকভরা চাউনির কোমল মাধুরী, এ কোন রাহু গ্রাসে মিলাইয়া গেল! পিতার আদর্শকে বিদ্রূপ করিয়াছে সুকল্যাণ। তাহার প্রতিহিংসাপরায়ণ অন্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়িল না পিতার স্নেহকাতর গোপন ব্যথা! এ যে কত বড় দুঃসহ আঘাত, তাহা কি একবারও ভাবিল না সে।

পদ্মাদের বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া যায়। খালপারের ছেলে মেয়েরা অবাক হইয়া দূর হইতে দেখে ভীতিবিহ্বল চোখে, লালপাগড়ীতে ছাইয়া গিয়াছে মাষ্টার বাবুর বাড়ীর উঠান। ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে একটা অজানা আতংকে চুপ হইয়া যায় কামলারা। আশ্চর্য ব্যাপার। ভদ্রলোক বাবুরাও ডাকাতি আরম্ভ করিয়াছে—স্বদেশী ডাকাতি! পোষ্টাফিসের মাষ্টারকে বন্দুক দেখাইয়া টাকার ব্যাগ ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে মুখোশধারী স্বদেশী ডাকাতেরা।

মাস না ঘুরিতেই বিলাসপুরের রায়ের বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া যায়। ডাকাতেরা রায় গিন্নীকে বলিয়া গিয়াছে, "কালুদা, যে বাড়ী নেই তা' আমরা জেনেই এসেছি।"

অবাক কাণ্ড।

ঘরে ঘরে খানাতল্লাশ শুরু হয়। আশ্রমের চরকা তাঁত সব ছত্রখান করিয়া দিয়া যায়, দারোগা পুলিশে।

সৌদামিনী তামাকের টিকা দিতে দিতে বির বির করে, তাহার তিনপুরুষেও এমন দিন কেউ দেখে নাই। কপালে কি আছে কে জানে।

যেন তাহার অদৃষ্টকেই অভিসম্পাৎ দিবার জন্য কারসাজি আরম্ভ হইয়াছে চতুর্দিকে। তাহার আশংকা মিথ্যা হয় না। দারোগা আসিয়া মদনকে সাক্ষী মানিয়া যায়।

মদন ভয়ের চোটে সেই যে গ্রাম ছাড়িয়া পালায়, আর ফেরে না। সৌদামিনীর ঘরও পুলিশের কৃপাদৃষ্টি হইতে বাদ যায় না। মুড়ি মুড়কি হাঁড়ি পাতিল সব টানিয়া বাহির করে উঠানে। নারিকেল গাছে উঠিয়া কচি ডাবগুলিই নিশ্চিহ্ন করিয়া যায়। মনে মনে তাহাদের শাপান্ত করে সৌদামিনী।

নগেন্দ্রশেখরের স্কুলেও ঘন ঘন আসে দারোগাবাবু। রথীন্দ্র মাষ্টারকে গ্রেপ্তার করে। মাষ্টার মহাশয়দের সঙ্গে ফিসফিস কি কথা-বার্তা হয়।

পরে গুজবটা ছড়াইয়া পড়ে। অনন্ত মাষ্টার মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে বিলাসপুরের 'কেসে'।

ছাত্ররা আক্রোশে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাহারা ঠিক করে, ইহার উত্তর দিতে হইবে অনন্ত মাষ্টারের মাথা ফাটাইয়া।

ছাত্ররা বিদ্রূপ করে, "মাষ্টার জাতটাই ভীরুর জাত।"

আরেকজন একটু সমবেদনা জানায়, "হবে নাই বা কেন। ঐ সামান্ত কুড়ি বাইশ টাকায় কত বড় সংসার সব টানতে হয়। তা'তে যদি সে চাকুরিটুকুও যায় দারোগা বাবুর কৃপায়।"

শোভন প্রতিবাদ জানায়, "তাই বলে অন্যায় পথে যাওয়াও ত ঠিক নয়। ঐত রামভদ্রপুর স্কুলের নবীন মাষ্টারের চাকরি গিয়েছে। তবু স্কুলের সেক্রেটারী রায় সাহেব তাঁকে দিয়ে কিছুতেই মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে পারেনি। মনের জোরই বড় জোর, টাকার জোর নয়।"

আরও চাঞ্চল্যকর সংবাদ আসে পত্রিকায়। একটি মেয়ে নাকি গুলি করিয়াছে গভর্ণরকে। মাষ্টার মহাশয়দের টিফিন পিরিয়ড সরগরম হইয়া উঠে নূতন বিস্ময়ে। ক্ষীণ ব্যাথার চাপ অনুভব করে নগেন্দ্রশেখর।

মেয়েরাও যোগ দিল এ হিংসাত্মক কার্যে। পদ্মা শোনে, জ্যেঠামণি আর পিসীমার গম্ভীর আলাপ—"আমাদের দেশের মেয়েদের জন্য এ পথ নয়।"

পদ্মা কলেজে ভর্তি হইয়াছে। কলেজের প্রথম দিনটি তাহার জীবনে অবিস্মরণীয়। কে একটি মেয়ে পিছন হইতে জড়াইয়া ধরিয়া চোখ টিপিয়া ধরে, "বলত কে?" পদ্মা খুশিতে বিহ্বল হইয়া পড়ে বিপাশাকে দেখিয়া। সেও ভর্তি হইয়াছে ঐ কলেজেই। একই বোর্ডিং-এ থাকিবে তাহারা। পদ্মার যেন স্বপ্নেরও অননুভূত এ আনন্দ।

ভোরবেলা বোর্ডিং-এর ঘুমভাঙার ঘণ্টা পড়ে। তারপর চায়ের ঘণ্টা। আর শুইয়া থাকা চলে না; বিপাশা অনিচ্ছাসত্ত্বে শয্যা ত্যাগ করে। সারি সারি লোহার খাট পাতা মেয়েদের বেডরুম। তার পাশেই ষ্টাডি।

নীচের তলায় ড্রেসিংরুম, ডাইনিংরুম, ভিজিটিং রুম। আরেক-দিকে ঝি রাঁধুনি মেট্রনের এলাকা। চায়ের টেবিলে চেঁচামেচি কথা-বার্তা তর্কবিতর্ক শুরু হইয়া গিয়াছে। ঝিরা সব চায়ের কেটলী লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। মারথা বিপাশাকে দেখিয়া উনানের ধার হইতে গরম চায়ের কেটলীটা লইয়া আসে। এই দিদিমণিটিকে সে ভালবাসে একটু আলাদা করিয়া। বোর্ডিং-এর সব কিছু নিয়মানুবর্তিতার প্রতিই শৈথিল্য বিপাশার, তাই নজর পড়ে সকলেরই তাহার প্রতি। সময়মত নাওয়া, খাওয়া, পড়িতে বসা, এমন কি লক্ষ্মীমেয়ের মত সময়মত ঘুমাইয়া পড়া, এসব নাকি এই বয়সে আর পোষায় না বিপাশার। তাই সে রাত দুইটা পর্যন্ত জাগিয়া গল্প করে পদ্মার সঙ্গে, কিংবা দেশ-বিদেশের উপন্যাস পড়ে।

পদ্মা অবাক হইয়া যায় বিপাশার জীবনের অতীত কাহিনী শুনিয়া। কেমন নিসংকোচে বলিয়া যায় বিপাশা, সে ভালবাসে

জেলের এক রাজবন্দীকে। পদ্মা অবাক হইয়া শোনে, এতটুকু দ্বিধা আসে না বিপাশার, তাহার প্রেমাস্পদের কথা বলিতে।

বিশ্বরূপ ছোড়া খেলা শিখাইত বিপাশাকে। একদিন অসাবধানে সে তীক্ষ্ণ ছোড়ার আঘাত লাগিয়া যায় বিপাশার বুকে। বিশ্বরূপ চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি লাগলোত ?"

বিপাশা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "ছাত্রীর বুকে আঘাত লাগান, জীবনে সম্ভব হ'বে না মাষ্টার মহাশয়ের।" অহংকার করাটা অযৌক্তিক নয় বিপাশার। সত্যি মুগ্ধ হইয়াছিল বিশ্বরূপ বিপাশার দক্ষতা দেখিয়া। তবু কেন জানি কথাটা শুনিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছিল সে, বিপাশার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ওদিকে বুকের রক্ত চুয়াইয়া ব্লাউজ ভিজিয়া উঠে। অনুপায় বিপাশা ছুটি লইয়া যায়, তাহার এক বন্ধুর নিমন্ত্রন রক্ষার অজুহাতে। তারপর বোর্ডিং এ গিয়া গোপনে গোপনে ওষুধ লাগাইয়া সে ক্ষত শুকায়। কিন্তু ক্ষতের দাগটা আজও আছে। বিপাশা বিষণ্ণ মিষ্টি হাসিয়া বলে "জন্মান্তরেও যেন আমার এ দাগ মিলিয়ে না যায়।"

পদ্মা ঠাট্টা করে, "একলব্যের গুরুদক্ষিণায় একটি মাত্র অঙ্গুলি চেয়েছিল পাণ্ডব গুরু ; আর আধুনিক গুরু যে সব শুদ্ধই চেয়ে নিল বিপাশা ; এ যে অন্যায় দাবীতে দ্রোণকেও হার মানাল।"

গুরুদক্ষিণার মূল্য বুঝিতেছে আজ বিপাশা তিল তিল করিয়া। বাহিরের কেহই তাহা জানে না একমাত্র পদ্মা ছাড়া।

পদ্মা চুপ হইয়া ভাবে, অন্ধকার কারাগৃহের এক নির্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া অনির্দিষ্ট কালের বন্দী বিশ্বরূপও কি এমন করিয়াই অনুভব করিতেছে বিপাশাকে !

ইতিহাস লজিকের তর্ক বিতর্ক, ইলিয়াড ও ওডিসর মহাকাব্য আর রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যরসে ডুবিয়া যায় পদ্মা।

কিন্তু মাঝে মাঝে একলা হইয়া পড়ে সে। তাহার মন চলিয়া যায় বহুদূরে—খালপারের ভিজামাটির বুকে। আকাশে সিন্দুরবর্ণ সূর্যাস্তের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে ফালি ফালি মেঘের গায়ে। পদ্মা চুপ হইয়া ভাবে, তাহাদের দীঘির বুকেও হয়তো এতক্ষণে ছায়া নামিয়া আসিয়াছে—জ্যেঠীমা ঘরে ঘরে ধূনা ঘুরাইয়া দিতেছেন। ছোড়দা জেলে, পদ্মাও চলিযা আসিয়াছে। জ্যেঠীমা জ্যেঠামণি পিসীমার সকাল-সন্ধ্যাগুলি কেমন কাটিতেছে কে জানে। মেয়েরা জটলা করিতে করিতে বোর্ডিং বাড়ীতে ফেরে মাঠ হইতে। বোর্ডিং-এ তালা পড়িবে এখুনি। পদ্মাও চলে মন্থর পায়ে 'স্টাডিরুমে'র দিকে।

বহুদিন মদনের সংবাদ পায় না কেহ, দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া আছে সৌদামিনীর মন। ধরণীবুড়ি কাঁদিয়া ভাসায় মা-মরা মেয়েটার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া। কিন্তু যমুনা আগের মতই ঘোরে ফেরে, পাড়া বেড়ায়, সুন্দরখুড়ির বাড়িতে দশপঁচিশ খেলে—তাহার কাজকর্মেও একটু সাহায্য করে। যমুনা যেন আরও বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে—শাড়ির আঁচলে দেহের পূর্ণতা বাধা মানিতে চায় না। প্রতাপের চোখ পড়ে। যমুনার এই আশ্রয়হীন নিঃস্বতা কি যেন কি কামনা জাগায় তাহার পুরুষ মনে। সূর্যের চোখ এড়ায় না। বিরক্ত কণ্ঠে সে যমুনাকে ডাকিয়া বলে, "সারা দিন এই বাড়িতে পইরা থাকস যে বাড়ীতে কাজকর্ম নাই।" যমুনার মুখ ভার হইয়া উঠে অভিমানে। তাহার আজ কেউ নাই, তাই সূর্যেরও মন হয় তো ঘুরিয়া গিয়াছে। অথচ সেই না একদিন বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহাকে।

সূর্য যমুনার মুখভার দেখিয়া মোলায়েম স্বরে বলে, "রাগ করলি তুই আমার কথায়। কিন্তু মানুষের মনের বিশ্বাস নাই, বুঝলি, এইটাই সংসারের বড় কথা।"

যমুনা বোঝে না সূর্যের কথার অর্থ। সংসারে কি বড় কি ছোট কথা তাহার হিসাব কষার প্রয়োজন নাই যমুনার। সে শুধু চায় জীবন-টাকে ভোগ করিতে নারীত্বের পূর্ণ আস্বাদনে। সে চায় নিজের এক খানি আলাদা লেপামোছা সুন্দর ঝক্‌ঝকে ঘর। ঐ সুন্দরবৌর মত সেও সাজাইবে গুছাইবে নিজের খুশিতে নিজের খেয়ালে।

সাতদিন একটানা বৃষ্টির পর একটু রৌদ্রের ঝিলিক দেখা দিয়াছে। সুন্দরবৌ পুকুরপাড়ে ঘাসের উপর চাটাই পাতিয়া ধান রোদে দেয়। মাথার উপরে ধূসরবর্ণ মেঘ হালকা বাতাসে ভর করিয়া আসে যায়! ভালই লাগে এই মরা রোদটুকু—সুন্দরবৌ পা ছড়াইয়া বসে ঘাসের উপর। আর চড়ুই তাড়ায়। ছোট ছোট খুদে পাখীগুলি ধান ছড়াইয়া জালাতন করে।

চুলগুলি পিঠের উপর মেলিয়া দিয়া ভাসুর ঝি রাধাকে ডাকে, "লক্ষ্মীসোনা, একটু উকুন বাইছা দেনা।"

দীঘির পাড় দিয়া ক্ষ্যান্ত, মহারাণী ও যমুনা শাক তুলিতে চলিয়াছে করিমদ্দির ক্ষেতে।

সুন্দরবৌ ক্ষ্যান্তকে ডাকিয়া বলে, "ও ক্ষ্যান্ত ঠাকুর ঝি, দেখ দেখি ধানগুলি একেবারেই গেছে নাকি।"

ক্ষ্যান্ত ধান হইতে খুঁটিয়া খুটিয়া গোটা দুই চাউল বাহির করিয়া দাঁতে দিয়া বলে, "আর দুই এক 'আল্‌ঠা' ( পশলা ), রোদ দে। ধানে একটু গন্ধ ধরছে দেখি। এই অদিনে আবার ধান সিদ্ধ করতে গেছিলি ক্যান? সরকার বাড়ীর নাকি?"

"হ, সরকার বাড়ীর থেইকা তাগিদের পর তাগিদ চলছে। তা' এই দুপুরে দলবল লইয়া কই চলছো ?"

"পাট শাক তুল্যা আনি চাউর গা। ভাত খাই কি দিয়া। আত্মরক্ষণ ঐ বেলা" বলিয়া ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া ধরে সঙ্গিনীদের।

সুন্দরবৌ ত'কাইয়া দেখে যমুনাকে, বয়সের জোয়ার সর্বাঙ্গে।

তাহার চমক ভাঙে। কাল মেঘের টুকরাটা দেখিতে না দেখিতে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এলোমেলো বাতাসে পিঠভরা চুলগুলি চোখেমুখে আসিয়া পড়ে। সুন্দরবৌ তাড়াতাড়ি ধানগুলি ধামায় ফেলিয়া কাঁধে তুলিয়া লয়। "রাধা, চাটাইটা আমাগো ঢেকি ঘরে থুইয়া আয়তো।"

ব্যস্ততাই সার—বৃষ্টি তেমন আসে না। কয়েক ফোটা জল পড়িয়াই আবার রৌদ্র উঠে—বৌ-নাচানী বৃষ্টি। সুন্দরবৌ বাড়ি আসিয়া দেখে, কানাই উঠানে বসিয়া একটা পাটকাঠির মাথায় সুতা বাধিয়া বঁড়শি বানাইতেছে গভীর মনযোগের সঙ্গে। "কই যাবিরে কানাই ? মাছ-ধরতে ?"

কানাই ঘাড় না তুলিয়াই উত্তর দেয়, "সূর্যকাকার সঙ্গে খালপারে মাছ ধরতে যামু।"

খালের ধারে বসিয়া সূর্য মাছ ধরে। মনটা ভাল নাই তাহার—কাজে যায় নাই তাই। কেঁচো দিয়া মাছদের প্রলুব্ধ করিবার সযত্ন প্রয়াস। খোঁটে খোঁটে পুঁটিমাছ উঠে। খালের উপরে সাঁকোতে কার গলা শোনা যায়—যমুনার না ? সূর্য উপরে তাকায়। আঁচলভর্তি শাক তুলিয়া সাঁকোর উপর দিয়া ফেরে যমুনা। চোখে যৌবনোদ্ধত চঞ্চল দৃষ্টি। সূর্যের দৃষ্টি স্থির হইয়া যায় সাঁকোর উপরে। অনমিত পরুষ-কামনা সজাগ হইয়া উঠে যেন মুহূর্তের ইশারায়। ওদিকে

কানাই চেঁচাইয়া বলে, "কাকা, আধার যে খাইয়া গেল মাছে—" ফাৎনা তলাইয়া যায়—সূর্যের হুঁশ থাকে না।

মাছধরার নেশা আর নাই—নূতন নেশা লাগিয়াছে চোখে চোখে। যমুনা হাসে। পেছনে ক্ষ্যান্তর গলা শুনা যায়—"কি লো সাঁকোর উপরেই থাকবি নাকি আজ।"

"তোমাগো লেইগাইত দাঁড়াইয়া আছি। হাটনের কি নমুনা। সামুকেও ত এর থেইকা তরস্তে হাটে।"

"তোর না হয় বয়সের জোয়ার এখন, পায়ে তাই রেলগাড়ীর চাকা। আমাগোত আর তা নাই।" বলিয়া আড়চোখে তাকাইয়া দেখে সূর্যকে। মনে মনে ভাবে, "সরমেরও বালাই নাই মাইয়াটার।"

সুকল্যাণ মুক্তি পাইয়াছে, পত্র আসিয়াছে। পদ্মা আনন্দে জানায় সংবাদটা বিপাশাকে। বিপাশা বোঝে, পদ্মার জীবনে এ সংবাদটি কত দুমূ্ল্য। তাহারও দাদা আছেন কারাগারের অবরুদ্ধ শিবিরে। দুবিসহ এ দিনের বোঝাকে সহজ করিয়া লইতে জানে বিপাশা। কিন্তু পদ্মার স্পর্শাতুর মন সহজে ভুলিতে পারে না এ দুঃখ।

পূজার ছুটিতে বাড়ী আসে পদ্মা। পূজার বাজনা বাজিতেছে জমিদার বাটীতে। সুকল্যাণের থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে জেলের বন্ধুদের। গল্প করে পদ্মার কাছে জেলখানার অজস্র খুঁটিনাটি কথা। ড্রাম বাজাইয়াই জমকালো করিয়া তুলিত তাহারা পূজার উৎসব; না দেখিলেও জেলখানার বন্ধুরা পরিচিত হইয়া উঠে পদ্মার মনে। সেও বোঝে, সুকল্যাণ ভুলিতে পারিতেছে না তাহাদের। জীবনের একটা

বিশিষ্ট অধ্যায় যাহাদের সঙ্গে কাটাইয়া আসিল তাহারা কে কোথায় হারাইয়া যাইবে, ভাবিতেও দুঃখ হয় পদ্মার।

কোমল সাহচর্য দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে চায় সে ছোড়দাকে। সারাদিন গল্প করে। প্রত্যেকদিনই একটা করিয়া নূতন খাবার বানায় ছোড়দার বাড়ীফেরা উপলক্ষ্যে। সুকল্যাণ প্রশংসা করে, "খুবত কাজের মেয়ে হয়েছে পদ্মা।"

কর্মরতা পদ্মার চুলের বেণীতে মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলে সে, "মনে আছে ছোটবেলায় একবার তোর চুলের একদিকের বিনুনী কেটে দেওয়ায়, বাড়ী শুদ্ধ লোকের কাছে বকুনি খেয়েছিলাম আমি। এক দুপুর পা ছড়িয়ে বসে কি কান্না মেয়ের। আমি যত বলি, রক্ত পড়েনি এক ফোঁটাও, তাও এত কান্না কেন। কে কার কথা শোনে।"

পদ্মা হাসিয়া বলে, "দ্রৌপদীর বেণী স্পর্শ করায় এতবড় এক মহা কাব্য হল, আর আমার অমন সুন্দর গোটা বিনুনীটাই কেটে দিলে তুমি, তাও একটু পা ছড়িয়ে বসে কাঁদবো না?"

নগেন্দ্রশেখরও একবার আসিয়া ঘুরিয়া যায় রান্নার এলাকায়। "আজ নূতন কি রান্না হচ্ছে অন্নপূর্ণার ঘরে।" উহাদের আসরে একটু কথা বলিতে চায় যেন আজ নগেন্দ্রশেখর। সুকল্যাণের দীপ্ত মুখখানার দিকে তাকায় নিবিষ্ট চোখে। বহুকাল পর একটা মধুর পারিবারিক বন্ধনের স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া থাকিতে চায় সবাই।

আবার উঠিয়া যায় নগেন্দ্রশেখর, স্কুলের দিকে। বাগানের কাজের তদারক করে একটু, "না, সূর্যকে নিয়ে আর চলে না। কেবল ফাঁকি। শ্যামসোহাগী ফুলের গাছগুলি দিয়েছে শেষ করে।" মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু মনের তলায় স্থির প্রসন্নতাই উঁকি মারে।

লক্ষ্মীপূজার দিন সুকল্যাণের এক বন্ধু আসে বেড়াইতে। অনুপম। পদ্মা তাহার ছোড়দার নিকট বহু সুখ্যাতি শুনিয়াছে এই অনুপমের সাহিত্যিক প্রতিভার। পশ্চিমে প্রফেসারী করে সে।

সকালের মিঠা রোদে বসিয়া চা খায় উহারা। পদ্মা খাবার সাজাইয়া দেয়। তাহাকেও ডাকে অনুপম চায়ের আসরে। লাজুক মেয়ে পদ্মা অপরিচিতের নিকট একটু সংকুচিত হইয়া উঠে।

পদ্মার জ্যেঠামশাই উত্তর দেয় তাহার হইয়া "পদ্মা আজ উপোস করেছে, লক্ষ্মী পূর্ণিমার উপোস।"

অনুপম হাসিয়া বলে, "বাঙ্গালী মেয়েত—কলেজে পড়া মেয়ে হ'লে কি হ'বে? পূজো অর্চনাটা তাদের মজ্জায় মেশান।"

জ্যেঠামহাশয় উত্তর দেন "যে দেশের যা বৈশিষ্ট্য। ঐত আমাদের সম্পদ। এ দেশ কোনদিন তার নিজ সম্পদ ভুলতে পারে? এ হ'চ্ছে বেদবেদান্তের পূণ্যভূমি।" তাহার মন অতীত গর্বে ভরিয়া উঠে। নগেন্দ্রশেখর দুঃখ করে, "আমাদের দেশের ছেলেরা আজ প্রতীচ্যমুখী; তারা খাঁটি সোনা চেনে না।"

পদ্মা তাহার দক্ষিণের ঘরের কাকিমার সঙ্গে আলপনা দেয় ঘর ভরিয়া। লক্ষ্মীর পা দিয়া 'ধানছড়া' ঘুরাইয়া নেয় সে নিপুণ হাতে। অনুপম মুগ্ধ হইয়া দেখে চিত্রনরতা পদ্মাকে। পূজার আয়োজন সম্মুখে। আঙিনার শুভ্র আলপনার বুকে একফালি জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। সবে মিলিয়া এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সমাবেশ। এই ত বাঙ্গলার আসল রূপ—ভাবে অনুপম। অনুপম দেখে পদ্মার জ্যেঠীমাকে। শাঁখা সিন্দূর আর লালপাড় শাড়িতে জড়ান ঐ শান্ত সমাহিত ভাবটুকু বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। ত্যাগ সেবা সহনশীলতার প্রতীক দুই গাছা শুভ্র শাঁখা। সাজসজ্জার আধিক্য নাই, নাই

অলংকারের চাকচিক্য। তবু ঐ দুই গাছা শাঁখার মাঝে লুকান আছে এক অফুরন্ত স্বর্ণ ভাণ্ডার।

পূজা শেষ হইয়া যায়—ঢাক লইয়া অন্য বাড়ী যায় ঢাকী। ঘরে ঘরে আজ এই একই বাদ্য বাজিবে। অনুপম উঠানে বসিয়া তন্দ্রাজড়িত চোখে দেখিতে পায় সমস্ত বাংলার একখানি সম্পূর্ণ চিত্র, ঐ লাজুক মেয়ে পদ্মা, তাহার কাকিমা, স্নেহশীলা জ্যেঠীমা, আর ধর্মনিষ্ঠাবতী পিসীমার মাঝে।

পিসীমা প্রসাদ লইয়া আসে। সুকল্যাণ পূজা পার্বণ পছন্দ করে শুধু এই প্রসাদের অংশটুকুর জন্যই। সে প্রসাদের জন্য দুই হাত অঞ্জলি পাতিয়া ধরে, "চিরজীবী হউন ভারতের লক্ষ কোটি দেবদেবীরা!"

কিন্তু অনুপমের দৃষ্টি অন্যত্র। সে অনুভব করে বাঙ্গালী নারী-জাতির অন্তর্নিহিত মাতৃরূপটি। অভিভূত হইয়া পিসীমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করে। মনে মনে বলিয়া উঠে "শাশ্বত মাতৃজাতি এঁরা।" পিসীমা আশীর্বাদ করে "চির কল্যাণ হউক।"

গোবর দিয়া লেপা উঠানের বুকে জ্যোৎস্নার বন্যা নামিয়াছে। চাঁদের আলোতে—পাটি পাতিয়া বসিয়া গল্প করে দুই বন্ধু। পদ্মার মনে শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। এই লক্ষ্মী পূজার দিনটি তাহার বড় প্রিয়। ঐ শুভ্র আলপনা আর স্বচ্ছ চাঁদের কিরণ মিলিয়া এক অপূর্ব অনুভূতির সমাবেশ হয় মনে। পরিপূর্ণ মন তাহার আজ।

অনুপম ডাকে পদ্মাকে, "কথা শোন, বাঙালী মেয়ে।" খুশি হয় পদ্মা। বাঙালী মেয়েইত সে। এইত তাহার গর্ব, এইত তাহার পরিচয়। তাহার এই একান্ত পরিচয়খানি অনুপমেরও

*চোখে ধরা পড়িয়াছে! সেও দেখে অনুপমকে, তাহার* আঙ্গিনার এ বিশেষ রাত্রির অতিথিকে। জ্যোৎস্নাস্নাত এক সুপুরুষ মূর্তি।

পরের দিনটা থাকিয়াই চলিয়া যায় অনুপম। পিসীমা অনেক করিয়া বলিয়া দেন, "কলিকাতায় যাওয়ার পথে এখান হ'য়েই যেও—এই পথেইত যেতে হ'বে।" অনুপম কথা দেয়।

মাত্র দুইদিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে সে; কিন্তু দুইটি দিনই অনুক্ষণ কথা বলিয়াছে। সুবক্তা সে ঘরোয়া আসরে। পদ্মা লক্ষ্য করিয়াছে তাহার বুদ্ধির দীপ্তি। মোহিত হইয়াছে সে তাহার কথার বুনানিতে।

পদ্মা ভোলে নাই, অনুপম যাওয়ার আগে কথা দিয়া গিয়াছে, সে আসিবে। মৃদু প্রতীক্ষাকাতর মন লইয়া কাজ করিয়া যায় সে। স্বল্পভাষিণী পদ্মা যেন সব কথাই হারাইয়া ফেলিয়াছে এই স্নিগ্ধ অনুভূতির মাধুরীতে।

কোজাগরের পর অতিথি অভ্যাগতদের মিষ্টিমুখ করাইতে হয়। এই দেশপ্রথা।

নারিকেলের গঙ্গাজল লস্করা সাজে তোলে পদ্মা। পিসীমা ও জ্যেঠীমারা মুড়ির মোয়া, চিড়ার মোয়া, বানাইয়া টিন ভরিয়া রাখে।

গ্রামের সবাই কোলাকুলি করিতে আসে ঘরে ঘরে। কুসুমলতা আশ্রমের ছেলেদের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই মা। মায়ের আশীর্বাদ লইতে আসে সবাই দূর দূর গ্রাম হইতে। প্রাক্তন ছেলেরা আসিয়া দেখা করিয়া যায় তাহাদের হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে। পদ্মা পিসীমার সঙ্গে সঙ্গে কাঁসার রেকাব সাজায়।

হেডমাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কলেজে পড়া প্রাক্তন ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া আলোচনা হয়। সন্ত্রাসবাদের বিফলতা আজ তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে।

পূজার ছুটি ফুরাইয়া আসে, ছাত্ররা একজন দুইজন করিয়া চলিয়া যাইতেছে বিদেশে। এরই মধ্যে একদিন টেলিগ্রাম আসে, শশাংকশেখর মুক্তি পাইয়া বাড়ী আসিতেছে। খুশিতে আত্মহারা হইয়া উঠে বাড়ীর সবাই। পিয়নকে ডাকিয়া বকশিস দেয় পদ্মার জ্যেঠীমা।

সংবাদটা ছড়াইয়া পড়ে গ্রামে গ্রামে। স্কুলের ছেলেরা, প্রাক্তন ছাত্ররা সবাই আসিয়া ভিড় করে উঠানে। ফুলের মালায় স্তূপীকৃত হইয়া উঠে আঙিনা। তাহারা ষ্টীমার ঘাটে যাইবে অভিনন্দনমাল্য লইয়া।

কলাগাছ, পূর্ণ কলসী আম্র পল্লব দিয়া সাজায় দুয়ার। পদ্মা চন্দনের ফোঁটা পরাইয়া প্রণাম করে কাকার পাদস্পর্শ করিয়া।

শশাংক স্মিত হাস্যে ছাত্রদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করে। কিন্তু এ উচ্ছ্বাসে কোনও উন্মাদনা অনুভব করে না সে আজ। এ চন্দন তিলক শঙ্খ পুষ্পমাল্যের আড়ালে প্রচ্ছন্ন যে ভাবপ্রবণতা, যে হিন্দু-ধর্মানুরাগ তাহার প্রতি আর কোনও মমত্ববোধ নাই তাহার মনে আজ।

কিন্তু নগেন্দ্রশেখর লক্ষ্য করে সহোদরের মনের এ সংশয়। তাহার মনে হয়, কি যেন এক বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে সহোদরের জীবনাদর্শে এই পাঁচ বৎসরের কারাবাসে।

শশাংকশেখর কলিকাতায়ই থাকিবে এখন স্থির করে। কুসুমলতা অবাক হয় শুনিয়া কিন্তু নগেন্দ্রশেখর বিস্মিত হয় না। শুধু একটা ক্ষীণ বেদনা উপলব্ধি করে ভিতরে ভিতরে। একান্নবর্তী পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইয়া যাওয়ার মত বড় অসহায় বোধ করে

সে নিজেকে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিভ্রান্ত আজ ছেলেমেয়েরা। তাহার নিজের সন্তানও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই ভারতের ঐতিহ্যকে। একমাত্র আশার স্থান ছিল এই শশাংক। কিন্তু সেও কি এ ঐতিহ্যকে ভুলিয়া গিয়াছে?

নগেন্দ্রশেখর বেদনাভরাক্রান্ত মন লইয়া পূজার ঘরে ঢোকে। পদ্মা যে কদিন বাড়ী আছে, সে-ই জ্যেঠামণিকে ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া শুনায়। এই মেয়েটীকে কন্যার অধিক স্নেহ করে নগেন্দ্রশেখর। সুকল্যাণ জেলে-জেলেইত প্রায় কাটাইল এতকাল। সন্ত্রাসবাদী সুকল্যাণ তাহার মনের আরেকটা ব্যথার স্থান। উহা স্বদেশপ্রেম নয়। বিশেষ বয়সের একটা উগ্র নেশা মাত্র এসব সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলী। সত্যনিষ্ঠ দেশসেবক একমাত্র গান্ধীপন্থীরাই। তাহারাই এদেশের মর্মবাণী উপলব্ধি করিয়াছে। তাই শশাংকের প্রতি তাহার আস্থা ও আশা এত প্রবল। ব্যথিত কণ্ঠে পদ্মাকে ডাকিয়া বলে, "পদ্মা মা আজ গীতা পড়ে শুনাও চতুর্থ অধ্যায় থেকে।"

পদ্মা সুললিত কণ্ঠে গীতা পাঠ করে। নগেন্দ্রশেখর গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করে পার্থসারথীর অমর বাণী।

পদ্মা বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়িতেছে—বিদেশে অনাত্মীয়দের মাঝে। বেশভূষায় অনাড়ম্বর নম্র বিনীত ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে দেখিয়া আশ্বস্ত হয় নগেন্দ্রশেখর। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নয় সেও। কিন্তু বিদেশে, কলেজে-পড়া আজকালকার মেয়েরা কি ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, জানে না। পদ্মার পিতামাতা মেয়েকে কলেজে পড়াইয়া আধুনিকা করিতে চায়। নগেন্দ্রশেখর বাধা দেয় না। কুসুমলতাও বাধা দেয় না। কালের যা গতি। তার সপক্ষে চলাই

শ্রেয়। এ পরিবারে রক্ষণশীলতার গোঁড়ামী নাই কাহারও, আবার প্রগতির স্রোতে তরী ছাড়িয়া দিতেও কেমন একটা আতংক আসে মনে।

পদ্মার মত বয়সে তাহার জ্যেঠীমা পিসীমা পাঁচজনের মন জোগাইয়া সংসার করিয়াছে শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ভাসুর লইয়া। শ্বশুর স্বামীর সংসারে তাহাদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। বধূ জীবনের সে এক মধুর স্মৃতি। আর এরা এখনও গৃহ কি জিনিস তাই বুঝিল না।

পদ্মা অবাক হইয়া দেখে, তাহার সেজ কাকাকে। সেই সনাতনী আদর্শবান পুরুষ—যাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ জ্যেঠীমা, পিসীমা জ্যেঠামণি—, কিশোরী পদ্মার সেই প্রথম অর্জুন, তাহার মুখেও আজ শোনে সে নবজাগ্রত রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের অতুলনীয় কাহিনী। শুধু এ রূপকথার গল্প বলা নয়, হৃদয় দিয়াই যেন আজ শশাংকশেখর উপলব্ধি করিয়াছে সেই সুদূরবর্তী হিমশীতল দেশের অন্তর্নিহিত কি এক গভীর তত্ত্বকথা। কথা বলিতে বলিতে দীপ্ত হইয়া উঠে তাহার চোখমুখ। পদ্মা লক্ষ্য করে। নগেন্দ্রশেখরও লক্ষ্য করে। পদ্মা বিস্মিত হয়—চমকিত হয়। কিন্তু নগেন্দ্রশেখর হয় শংকিত। কেমন এক পরাভবের ব্যাথায় ব্যথিত হইয়া উঠিতে চায় হৃদয়। শশাংক কলিকাতায় যাইতে চায় কেন। সবাই যদি শহরমুখী হয় তবে এ দীনদরিদ্র পল্লীবাসীকে বাঁচাইয়া রাখিবে কে। বাংলার মেরুদণ্ড এই সমস্ত গ্রামগুলিকে রক্ষা করিবে কে।

মনের অবসন্নতাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায় নগেন্দ্রশেখর। আশ্রমে ঘুরিয়া আসে একটু। নূতন লাগান তুলাগাছগুলির কি দশা হইল দেখিতে যায় সে।

শশাংকশেখর কলিকাতা যাওয়ার দিন স্থির করিয়া ফেলে। পদ্মাও যাইবে সাথে। কিন্তু সুকল্যাণ গ্রামেই থাকিবে। রামভদ্রপুর স্কুলে একটা মাষ্টারী লয় সে। নগেন্দ্রশেখর খুশি হয়। কিন্তু শশাংক বোঝে, স্কুলের কাজ লওয়াটা সুকল্যাণের একটা অজুহাত মাত্র, আসলে রাজনীতি করার জন্যই দেশ ছাড়িতেছে না সে এখন।

শশাংক ও পদ্মা রওয়ানা হইয়া যায়। ভোরে ষ্টীমার ছাড়ে। শীতের প্রতীক্ষায় স্তিমিত হইয়া আসিতেছে খরস্রোতা পদ্মা নদী। পূজার যাত্রীবাহী ষ্টীমারের চাকা ঘুরিয়া চলে দক্ষিণমুখে। পদ্মা প্রাণ ভরিয়া দেখে—নদীর জলে সদ্যস্নাতা কৃষককুমারীর অবাক চাউনি, কলসী কাঁখে ঘোমটাটানা গৃহস্থবধু, কাঠের গুদামঘর, বনবনানী—ধীরে ধীরে দূরে মিলাইয়া যায় দৃষ্টির আড়ালে।

ঐ দূরে তালগাছের সারির আড়ালে তাহার জ্যেঠীমা, পিসীমা, জ্যেঠামণির বিদায় ব্যথাটুকুইত বাঙ্গালী মেয়ের গোপন সঞ্চয়।

অনুপমও চলিয়াছে সঙ্গে এই ষ্টীমারে। কিন্তু এই যাত্রাশেষের সঙ্গেই হয়তো তাহার শেষাংক। জনকোলাহলে চিরদিনের জন্য হারাইয়া যাইবে অনুপম—তবু এ ব্যথাটুকু অমর হইয়া থাকুক তাহার মনের শাশ্বত বিরহ গাথায়।

ষ্টীমারের রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া দেখে পদ্মা—দূরে বিলীয়মান তাহার প্রিয় গ্রামখানি, এই অনন্তে বিলীন রবিশস্য-বোনা ভূমি, ধীরে ধীরে শহরের ইটের গাঁথনি, দালান কোঠায় মিশিয়া যাইবে যাত্রীদের অজান্তে অলক্ষ্যে।

শশাংক ও অনুপম আসিয়া দাঁড়ায় পাশে। আবার দ্রুত স্পন্দন আরম্ভ হয় পদ্মার বুকে কি এক মধুর উত্তেজনায়।

অনুপমও লক্ষ্য করে পদ্মাকে। উপভোগ করে তাহার সুন্দর লাজুকতাটুকু। বড় বেশী লাজুক মেয়েটি তবু চোখদুইটিতে যেন কিসের ঔজ্জ্বল্য ধরা দেয়, ভাবে অনুপম। অদ্ভূত কমনীয় এই বাঙালী মেয়েরা। তাই এত অপরূপ লাগে উহাদের।

ষ্টীমারের অপর প্রান্তে কে যেন গান করিতেছে গলা ছাড়িয়া। জলকণা ভরা বাতাসে বাতাসে সে সুর দূরে তরঙ্গায়িত পদ্মার বুকে মিলাইয়া যায়।

সন্ধ্যা হইয়া আসে। অন্ধকারের ছায়া নামে ঘননীল জলে, কোমল অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিতে চায় মন।

অনুপম আবিষ্ট হইয়া ভাবে, এই জন্যইত বাঙ্গালী এত স্পর্শাতুর জাতি। এই বিশাল নদী আর অনন্ত জিজ্ঞাসাভরা ঐ নীলাকাশ আর ঘন বনের ইশারা—এই ত বাঙ্গালী মনের চির রহস্য।

ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়াছে পদ্মা। আবার পুরান আস্তানা। সেই একই ঝি চাকর রাঁধুনি দরওয়ান মেট্রন সুপারিটেণ্ডের একটানা কাজের স্রোত।

খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। মেয়েরা সব হুরাহুরি করিয়া নীচে নামে। "সিকরুমে" খাবার লইয়া আসিতেছে লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বোর্ডিং-এর সবচাইতে অল্পবয়স্কা ঝি। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে সে পদ্মাকে অনুরোধ জানায়—একখানা পত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহাকে। লক্ষ্মী নির্দিষ্ট সময়ে আসে পোষ্ট কার্ড লইয়া।

"কি পাঠ দেব—কার কাছে লিখবে?" পদ্মা জিজ্ঞাসা ক'রে। লক্ষ্মী আরক্তিম হইয়া উঠে। বিপাশা উহা লক্ষ্য করিয়া মৃদু ঠাট্টার সুরে বলে "কি স্বামীর কাছে লিখবেত।" সলজ্জ লক্ষ্মী মাথা নাড়ে।

পদ্মা আবার জিজ্ঞাসা করে, "কি সংবাদ লিখবে" লক্ষ্মী গুছাইয়া বলিতে পারে না, একা কথাই বারে বারে বলে আর লাল হইয়া উঠে। বিপাশা আবার চটুল হইয়া উঠে। পোষ্টকার্ড খানা ফিরাইয়া দিয়া বলে, "তুমি এখন কাজে যাও—আমি লিখে রাখবো।"

বিপাশা লক্ষ্মীর হইয়া সুদীর্ঘ পত্র লিখে। লক্ষ্মী অবাক হয়—তাহারই মনের কথাগুলি ঐ কালির আঁচরের মধ্যে এমন গুছাইয়া বলিয়াছে দিদিমনি। এই অবিবাহিত দিদিমনিই বা জানেন কি করিয়া তাহার মনের গোপন সংবাদ! খুশি হইয়া চলিয়া যায় সে।

শোবার ঘণ্টা পড়িতেছে—এখনই সুইচ অফ্ হইয়া যাইবে। পদ্মা ও বিপাশা তাহাদের পড়ার ডেস্ক বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়ে। বিপাশা হাসিয়া বলে, "লক্ষ্মীর স্বামী আবার এ পত্রের মর্মার্থ বুঝবার জন্য কার দুয়ারে ঘুরবে কে জানে। এ খাঁটি সোনার দেশের মেয়ে ঐ নিরক্ষরা লক্ষ্মীরও মনের স্বর্ণভাণ্ডারে জমা আছে তার স্বামীর প্রতি অনুরাগ। কিন্তু মনের সে আবেগটুকুও জানাবার শক্তি নেই বেচারার!" বিদ্রূপের হাসি হাসে বিপাশা। পদ্মা চুপ হইয়া যায়, মনের কোন এক তারে টান পড়ে বিপাশার কথার ইঙ্গিতে।

শশাংকশেখর রবিবার বিকালবেলা পদ্মাকে লইয়া বেড়াইতে যায় বেলুড় মঠে। পদ্মারই আবদার উহা। বিপাশাকেও লইয়া যায় সঙ্গে।

বোর্ডিং হইতে একা বাহির হওয়ার নিয়ম নাই—একমাত্র এসকর্ট লিষ্টে যে নাম আছে যাহাদের তাহাদের সাথে বাহির হইতে পারে মেয়েরা। লোহার দুয়ারের ফাঁক দিয়া চলমান ট্রাম বাস ভরা রাজপথ, পথিকের হাঁটা চলার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকে মেয়েরা। বন্দীর মত জীবন।

বিপাশা বলে "দেখোত পদ্মা, কতলোক চলছে রাস্তা দিয়ে। আর আমরা মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে কি হাঁটা চলার স্বাধীনতাটুকুও পাব না। বন্দীদের মত এসকর্ট লাগবে।"

পদ্মারও ব্যথার স্থান ঐ খানেই। কিন্তু তাহার অভিযোগ শুধুমাত্র অভিভাবক ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই নয়। একা রাস্তায় চলিয়া আনন্দও পায় না সে। দুষ্টু মানুষের কুৎসিত মন্তব্যে ও ইঙ্গিতে কদর্য হইয়া উঠে একলা পথ চলা।

দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। বেগবতী নদী ছুটিয়া চলিয়াছে দক্ষিণে।

পদ্মার মন চলিয়া গিযাছে বহু উর্ধে। দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিব মন্দির, রাণী রাসমনির কালী-মন্দির, শিষ্য পরিবেষ্টিত পরমহংসদেবের বাসগৃহ। কত স্মৃতি মাখা এই মন্দিরবেদীর গায়ে।

এই আরতি কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া আসিতেছে এ মন্দির আঙিনায়—কত দূর অতীত কাল হইতে। মন্দিরে মন্দিরে প্রাত্যহিক বৈকালীর আয়োজন, আর সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা, গীর্জায় গীর্জায় প্রতি রবিবারের প্রার্থনা শোনা, মসজিদের নমাজ পড়া এ যেন জীবনের সঙ্গেই জড়িত। প্রাণের সঙ্গেই মেশান যে এ ধর্মানুষ্ঠান। উহা কেন বোঝে না বিপাশা? পদ্মা বলে, "আমাদের এ দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, মুসলমানদের ঈদের চাঁদ, খৃষ্টানদের বড়দিনের উৎসব—এ কি শুধু দেবতার অর্চনাই মাত্র? উহার সঙ্গে জড়িত নাই শিশুমনের কত বিস্ময়, কত রহস্যময় কল্পনা!"

বিপাশা উত্তর দেয়, "শিশু মনের কল্পনাকে সজীব করিতে চাও, স্বর্গের দেবদেবী কেন। ইতিহাসের অবিস্মরণীয় দিনগুলির কাহিনী দিয়েইত তাদের উৎসব সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে ঘরে ঘরে। এই

অনড় দেবদেবীর পূজোয় বিপদ এই, এতে মানুষের মনকেও অনড় ক'রে তোলে। এতে একটা পিছু টানার আকর্ষণ আছে।"

বেলা পড়িয়া আসে—সুন্দর বৌ ঘাটে বসিয়া বাসন মাজে, ক্ষ্যান্ত পাড়ে বসিয়া ফিস ফিস করিয়া কথা বলে, "মনসাবাড়ী চল এক-দিন; ব্যর্থ ওষুধ পাবি। পাঁচটা পান আর পাঁচটা সুপারি আর একটা তামার পয়সা।" ক্ষ্যান্ত উঠিয়া পড়ে, বেলা আর নাই। সুন্দর বৌ—কড়াইর কালী ঘষিয়া তোলে ঝামা দিয়া। চোখের সামনে মদির সুখস্বপ্ন। মা-মনসা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন কি। এক বিস্ময়কর মাতৃত্বের অবুঝ বাসনা, বহু-কামনা ভরা বুকের ভিতরে।

সন্ধ্যা হয় হয়। উত্তরের ঘরে শাশুড়ি-বৌ আউশ ধান পাড় দেয় নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া ঢেঁকির শব্দ শুধু শোনা যায়, তালে তালে উঠে নামে ঢেঁকির মুষল।'

মঙ্গলবার সারাদিন উপাস থাকিয়া সুন্দরবৌ ক্ষ্যান্তের সঙ্গে যায় মনসাবাড়ী।

মনসাবাড়ীর উঠানে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, প্রৌঢ়ের ভীড়। গোবর দিয়া লেপা মাটির রোয়াকে বসিয়া আছে মনসা ঠাকুরের বিধবা দিদি। গলায় তুলসীর মালা, কপালে চন্দনতিলক। ঘরের দুয়ার ভেজান। ভিতরে ঠাকুর 'বায়ালে' পড়িয়াছেন।

বটেশ্বরীর ডাক হয়। ফোঁস ফোঁস শব্দে মনসাদেবী সেবকের উপর ভর করেন। বাহিরে বরপ্রার্থীরা সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাবে—কান সজাগ করিয়া। ঠাকুরের দিদি চেঁচাইয়া বলে, "বটেশ্বরীর

ডাক হইছে।" আলুথালু বসন সংযত করিতে করিতে এক ক্ষীণ-দৃষ্টি বৃদ্ধা করজোড়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলে। ভিতর হইতে অস্পষ্ট স্বরে অলক্ষ্য দেবতা কথা বলেন "তোর মনে বড় অশান্তি। বড় দুঃখ পাইতাছস তুই"। বৃদ্ধা চোখ মুছিয়া নম্র বিনীত স্বরে উত্তর দেয়, "মা তোমারতো অজানা কিছুই নাই। এর বিহিত কর মা। আমার ঐ একমাত্র সম্বল ছেলে, কই যে আছে—কেমন আছে"—ভিতর হইতে বাধা দিয়া বলেন দেবী—"কোনও ভয় নাই—শীগ্‌গীরই খবর পাবি। মাটি-পরা নিয়া যা।" আবার ডাক হয় কাদম্বিনীর। আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া কাদম্বিনী দাঁড়ায়, পেছন হইতে ধরিয়া শাশুড়ি বলিয়া দেয়, "প্রণাম কর।" সুন্দরবৌ ঘোমটা দিয়া এক কোণা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়। চাপা উত্তেজনায় চোখ দুটি বড় হইয়া উঠে—বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। এতগুলি লোকের মধ্যে কি করিয়া বলিবে সে তাহার অশান্তির কথা। মনে মনে মনসাদেবীকে ডাকে "মাগো, তুমিত সবই জান।"

"সিন্ধুবালা কে, তার ডাক হইছে।" চেঁচাইয়া বলে ঠাকুরের দিদি।

ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবৌকে লইয়া যায় দুয়ারে—

ভিতর হইতে আশ্বাসবাণী শোনা যায়, "তোর মনে বড় অশান্তি। শনির গ্রহ লাগছে তোর পেছনে। সামনের মঙ্গলবার পূজা দিয়া যাইস—সব ঠিক হইয়া যাইব।"

যাওয়ার আগে ক্ষ্যান্তর সঙ্গে ঠাকুরের দিদির কি কথা হয় ফিস ফিস কারয়া, কি যেন একটা ওষুধ দিয়া দেয়—ক্ষ্যান্তকে।

ফেরার পথে খামার বাড়ীর পাশ দিয়া ক্ষ্যান্তর পিছন পিছন হাঁটিয়া চলে সুন্দরবৌ—মস্ত ঘোমটা টানিয়া। খামার বাড়ীতে

কামলারা সব ধান মাপিতেছে—“বাড়কীর” ধান।—লাভেরে এক, লাভেরে দুই, লাভেরে তিন।

সূর্য ও প্রতাপ দুই ভাই-ই আসিয়াছে ধান মাপিতে মফিমিঞার সঙ্গে।

গোমস্তা বৈরম খাঁ হিসাব ঠিক রাখে—নায়েবের খাতায় লিখাইতে হইবে।

“নয়নতারা—দশ দাঁড়ি সিদ্ধ, শ্রীদামের বৌ—পাঁচ দাঁড়ি সিদ্ধ, নিস্তারিনী—দশ দাঁড়ি—আতপ।” “যমুনাও আসিয়াছে বাড়কীর ধান লইতে। না লইলে খাইবে কি—স্বোয়ামী যখন নিখোঁজ”, মনে মনে ভাবে বৈরম খাঁ আর আড়-চোখে তাকাইয়া দেখে একটু তাহাকে।

গোলমাল হইয়া যায় হিসাবটা, আবার মনে মনে গুণিয়া ঠিক করে। “যমুনা, কিসের ধান নিবা।”

“সিদ্ধ চাউলের।”

মফিমিঞা ততক্ষণে মাপিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে আড়-চোখে নজর রাখে বৈরমখাঁর চোখের উপর, আর দেখ না দেখ পাঁচ সের ধান বেশী ঢালিয়া দেয় নয়নতারার ধামায়। যমুনার নজর এড়ায় না—সূর্যেরও চোখ এড়ায় না।

যমুনার চোখ দুটি নাচিয়া উঠে, “বাহাদুরী আছে সেখের পোর। কি তরস্তে হাত চলে—লাভেরে এক, লাভেরে দুই।”

কিন্তু সূর্য গম্ভীর হইয়া যায়।

সুন্দরবৌ—ঘোমটার ফাঁক হইতে তাকাইয়া দেখে ধানমাপা-রত স্বামীর মাংসপেশীবহুল অনাবৃত বক্ষ, ঘর্মাক্ত ললাট, টেরি-কাটা কাল কুচকুচে চুলের জুলপি! তাহার ডাগর চোখে ভালবাসা ঝরিয়া পড়ে ঘোমটার আড়ালে।

দূরের বাংলো-বাড়ীর বাগান হইতে জমিদারের ছোট মামা সিদ্ধেশ্বরের চোখ পড়ে, সুন্দরবৌয়ের উপর।

"ছোট লোকের ঘরেও এত রূপ।" অবাক হয় সে।

সূর্য বাড়ী গিয়া যমুনাকে ডাকিয়া বলে, "তোর বাড়কীর ধান এর পর থেইকা আমিই আইনা দিমু—আর পরনের কাপড় কিনাইস বলাইরে দিয়া সামনের হাটে—আমি টাকা দিমু।" সূর্যের এ গম্ভীর আদেশ যেন অমান্য করিবার কোনও অধিকার নাই যমুনার।

সন্ধ্যার আগেই ঘরে ফেরে প্রতাপ। তাহার মন বড় খুশি আজ। নূতন সংবাদ লইয়া আসিয়াছে সে। বৌকে ডাকিয়া সংবাদ দেয়—ছোট কর্তার ছোট ছেলের অন্নপ্রাশন সামনের মাসেই। প্রতাপের খুশির কি আছে উহাতে—তবু খুশি হয়। প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করে তাহাদের মনিবের ছেলেকে। আশু উৎসবের ছবি ফুটিয়া উঠে চোখের সামনে। কবি-খেমটার বায়না দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

কি একটা কাজে সিদ্ধেশ্বর আসে প্রতাপের খোঁজে। প্রতাপ জলচৌকিটা আগাইয়া দেয় বসিতে। বৌকে পান সাজিয়া দিতে বলে। কিন্তু সিন্ধুবালার কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে—কেমন ধারা চাউনি যেন মানুষটির। ভাল করিয়া কাপড়টা টানিয়া দেয় সে শরীরে। একটা অকল্যাণের ইঙ্গিত বহিয়া আনিয়াছে লোকটি। সিন্ধুবালা আর ঘর হইতে বাহির হয় না।

মাস কাটিয়া যায়। দেখিতে দেখিতে অন্নপ্রাশনের দিন আসিয়া পড়ে। সুন্দর জরির পোশাক পরানো হইয়াছে ছেলেকে। গৃহদেবতার

দুয়ার হইতে ছেলেকে স্নান করাইয়া নেওয়া হইবে—পালকি সাজান দুয়ারে। এরই মধ্যে হল্লা পড়িয়া যায়—ছেলের গলার হার কি হইল? নারীকণ্ঠের গুঞ্জন আরম্ভ হয় অন্দর মহলে, "কি সর্বনাশ, কার এমন সাহস।"

বাহির-বাড়ীতে নায়েব গোমস্তার হাঁক ডাক পড়িয়া যায়। কামলাদের ও চাকর-বাকরকে ডাকাইয়া ধমকায় "ভাল চাসত এখনও শীগ্‌গীর বল—না হ'লে "বাটি-পড়া" দেব।" ভয়ে মুখ শুকাইয়া যায় কামলাদের।

সিদ্ধেশ্বরের হঠাৎ মনে পড়ে, সে নাকি প্রতাপকেই আজ সকালে বারে বারে ছেলের গলার দিকে তাকাইতে দেখিয়াছে। প্রতাপকে ডাকাইয়া বেত হাতে শাসায় নায়েব, "ভাল চাসত বল এখনও।"

প্রতাপের চোখ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠে, ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকায় কঠিন স্ফীত মুষ্টিবদ্ধ বেতের চিক্কণ আগাটার দিকে। "না হুজুর ধর্মের দোহাই—এ কাজ আমি করি নাই।"

সিদ্ধেশ্বর গোঁফের আড়ালে ক্রূরহাসি হাসে আর মনে মনে হিসাব করে—হারছড়া ভাঙিয়া এক জোড়া মাকড়ি গড়াইবে সে হাল ফ্যাশনের।

প্রতাপের বৌর পছন্দ হইবে না কি নয়া সেকরার গড়ান সোনার মাকড়ি!

এদিকে হুকুম আসে—গোলাবাড়ীর ছোট একটা ঘরে পিঠ-মোড়া দিয়া বেত মারা হইবে প্রতাপকে। প্রতাপের মুখ শুকাইয়া যায়। বৃথাই করুণ কাকুতি। কঠিন আদেশ নড়-বড় হয় না। এক মুহূর্তে পাড়ায় ছড়াইয়া পড়ে খবরটা! ধরণীবুড়ি নিজ

কানে শুনিয়া আসে প্রতাপের আর্ত-ক্রন্দন। সে সুন্দরবৌকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলে, "আর দেরি করিস না বৌ—যা, মনিবের হাতে পায়ে ধর গিয়া—ওরে ত মাইরা শেষ করল।" ভীত ত্রস্ত পায়ে ধরণী-বুড়ির পেছনে পেছনে ছুটিয়া চলে সুন্দরবৌ—লজ্জা করার সময় এখন নয়। দূর হইতে স্বামীর আর্ত চিৎকার কানে আসে। গোলাবাড়ীতে একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া সিদ্ধেশ্বর সিগারেট টানিতে টানিতে নায়েবের সঙ্গে কথা কহিতেছে। ধরণী-বুড়ি কানে কানে ফিস ফিস করিয়া বলিয়া দেয়, "পায়ে ধর—পায়ে ধর।" সুন্দরবৌ নায়েবের পা জড়াইয়া ধরে "ধর্মের বাপ আপনি, ছাইড়া দেন—দোহাই আপনার।" নায়েব ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া ধরণী-বুড়িকে বলে, "একে আবার এখানে আনলি কেন। বাড়ী যাও তোমরা।"

সিদ্ধেশ্বর কামনাতুর দৃষ্টিতে গিলে সজল-নয়না সুন্দরবৌর রূপের মদিরা। মনে মনে ভাবে, "এখনত সরমের বালাই নাই। আর সেদিন বুঝি লজ্জাবতীর ঘর থেকে বার হওয়াও গেল না। ছোট লোকের বৌ—তার আবার অত সতীপনা।"

কুটিল হাসির রেখা মিলাইয়া যায় গোঁফের তলায়, "এ সতীপনা ছুটাবার ওষুধ বড়লোকের হাতেই। মাকড়ি জোড়া তাড়াতাড়িই গড়াইয়া আনিতে হইবে।" ভাবে সে।

ঘরে ফিরিয়া সুন্দরবৌ লক্ষীর কাছে মাথা ঠোকে। বিধাতার বিরুদ্ধে বুকের মধ্যে হু হু করিতে থাকে দুঃখ আর দারিদ্র্যের অভিমান। দূর হইতে চলন বাদ্য শোনা যায়—উৎসবের জন-কোলাহল। সুন্দরবৌর বুকের ভিতর আছড়াইয়া উঠে প্রতাপের করুণক্রন্দন।

জমিদার বাড়ীর অন্দরে গিয়াও পৌছায় প্রতাপের চিৎকার। বড় কর্ত্রী নায়েবকে ডাকাইয়া হুকুম দিয়া দেন, "ছেড়ে দিন ওকে।" বিরক্ত হইয়া নায়েব ছাড়িয়া দেয় তাহাকে। "এত মার খেয়েও ব্যাটা স্বীকার করলি না—দেখা যাবে পরে।"

সমস্ত শরীরে কালশিটে পড়িয়া গিয়াছে। চোখমুখ লাল। ঘরে গিয়া মাটির উপর শুইয়া পড়ে প্রতাপ। বৌকে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া এ চোর অপবাদ লইয়া। চোখ ভরিয়া জল বাধা মানে না। স্বামীর চোখের জল দেখিয়া বৌও হু হু করিয়া কাঁদে। ঘরে বসিয়া দুইজনে অঝোরে চোখের জল ফেলে। নহবতের উপর সানাইয়ে মালকোষ রাগিনী বাজিয়া উঠে; সানাইয়ের সুরে বুকের পাঁজরের মধ্যে চুয়াইয়া উঠিতে চায় প্রতিহিংসার ক্ষীণ বাসনা। মুক দম্পতি আকুল হইয়া বিধাতার নিকট ভাষাহীন অভিযোগ জানায়:

"ছোটলোক, গরীব বইল্যাইত আমাগো আজ এই বিচার। তুমিও কি এর বিচার করঘা না হরিঠাকুর।"

কাঠের পুলের উপর হইতে সূর্য দেখে জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রিতের ভিড়। প্রতাপের প্রতি এ অবিচারে ক্ষুব্ধ হইয়া আছে তাহার সমস্ত মন। কর্তাদের ভিটায় বাস করিতেছে বলিয়াই কি এত অন্যায় অত্যাচার সহিতে হইবে তাহাদের জীবন ভরিয়া? বংশানুক্রমে, যুগ যুগ ধরিয়া চলিবে এ অন্যায় অবিচার। এ অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলেই পূর্বপুরুষের ভিটাটুকুও থাকিবে না তাহাদের মাথা গুঁজিবার। নিজের হাতে গাছ-গাছালি লাগায় তাহারা, ঘরের চালে লতাইয়া উঠে লাউ কুমড়ার ডগা। কিন্তু তবু ঐ ভিটার মাটিতে নাই তাহাদের কোনও অধিকার। কিন্তু কেন? বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায় উষ্ণ রক্ত।

সূর্য স্তব্ধ হইয়া ভাবে, বিধাতার রাজ্যে এত অবিচার আর কতকাল জমা থাকিবে?

ছুটির দিন। মেয়েরা সব মাঠে নামিয়া পড়িয়াছে দুপুর বেলা-ই। বাস্কেট বল খেলার চর্চা করিতেছে ফার্ষ্ট ইয়ারের মেয়েরা। তাহাদের চোখে-মুখে উৎসাহের অজস্রতা।

পদ্মার কলেজ-জীবন শেষ হইতে চলিল। দেখিতে দেখিতে তিন বছর কাটিয়া গেল, মনে হয় এই সেদিনের কথা।

পদ্মা মাঠের এক কোণে গিয়া বসে একখানা বই লইয়া। বইয়ের ভাঁজ হইতে একটা পুরান চিঠি চোখে পড়ে। অনুপমের পত্র। বিজয়ার পর একখানা পত্র লিখিয়াছিল তাহাকে, "লাজুক মেয়ে, এ বছর আমি যেতে পারলাম না, তাই এখানে বসে মনে পড়ছে গেল বছরের কোজাগরের রাত্রিটি।"

বিশেষ কিছুই লেখে নাই অনুপম, তবু মনে হয় যেন, বিশেষ কত কিছুই লেখা আছে ঐ ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে। প্রতিটি কথা যেন এক মধুর অর্থ লইয়া ধরা দিতে চায় চোখে।

অনুপমের সাথে আর কোনদিন দেখা হইবে কি তার? কি একটা মৃদু-ব্যথার উত্তাপ ভিতরে।

বিপাশাও আর থাকে না এ বোর্ডিং-এ। এত কড়াকড়ি নিয়মের বোর্ডিং-এ থাকিলে তাহার কাজের অসুবিধা হয়। মিটিং, বস্তি আর পাঠচক্র, এই লইয়াই ঠাসা জীবন তাহার।

দরওয়ান আসিয়া স্লিপ দেয়—শশাংকশেখর লইতে আসিয়াছে তাহাকে। এই অসময়ে ‘স্লিপ’ দেখিয়া চমকিয়া উঠে পদ্মা। সে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায় ভয়ে ভয়ে কাকার মুখের দিকে।

“বাড়ী চল্ আগে—তারপর শুনবি সব।” মৃদু হাসিয়া বলে শশাংক।

পদ্মার বাবার পত্র আসিয়াছে, পদ্মার জন্য পাত্র স্থির করিয়াছেন। পাত্র পক্ষ মেয়ে দেখিতে চায়। পদ্মা ভীত হইয়া উঠে মনে মনে। তাহাকে দেখিতে আসিবে—তাহার সৌন্দর্য, তাহার রূপ, চোখ, কান, নাক, মুখ দেখিয়াই বিচার হইবে, কোন ভাগ্যবানের পত্নী হইবার যোগ্যা কি না সে। আর তাহার মন, তাহার আদর্শ, তাহার সংস্কৃতি, রুচি, এ সবই বৃথা। কোনই মুল্য নাই এ সবের এ ভাগ্য নির্বাচনে!

ছেলের পিতা আসিবে ভাবী পুত্রবধূর রূপ বিচার করিতে ভাবিতেও মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠে পদ্মা। কিন্তু প্রতিবাদ করে না সে। অভিযোগ থাকে শুধু তাহার অন্তরে।

যথাসময়ে কন্যা দেখা হইয়া যায়। কন্যা পছন্দ হয়। কিন্তু পণের টাকার সীমা দুই হাজার অতিক্রম করিয়া যায়। মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে পদ্মা, শেষ পর্যন্ত একটা পণ্য-সামগ্রীর দরে বিকাইবে তাহাকে।

পদ্মা শুনিয়া বিস্মিত হয় তাহার মাতা নাকি তাহাকে এই “অবস্থাপন্ন সৎপাত্রে” দিতে রাজী ছিলেন। রাজী হয় নাই শশাংক। তর্ক করিয়াছে সে অগ্রজের সাথে, “টাকায়-সব কিছু মার্জনা পায়। পদ্মা সে জাতের মেয়ে নয়। এ পরিবার পদ্মার উপযুক্ত নয়।”

আবার নূতন সম্বন্ধ আসে। খুব অ্যারিষ্ট্রক্র্যাটিক পরিবার।

পদ্মা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ-ভরা চোখে দেখে ভাবী ননদকে। মূল্যবান শাড়ি ও অলঙ্কারের আড়ালে লিপষ্টিক বুলানো ঠোঁট ও কৃত্রিম পক্ষ্মপুট

লাগানো চোখ দুইটি একটা অপছন্দকর পরিবেশেরই বার্তা বহিয়া আনিয়াছে যেন। পদ্মা মনে মনে শিহরিয়া উঠে, তাহার আশৈশবের "প্লেন লিভিং এ্যাণ্ড হাই থিঙ্কিং"এর সমাপ্তি হইবে এই পরিবারে! সপ্তাহ না যাইতে নিশ্চিন্ত হয় সে। মেয়ে পছন্দ হয় নাই।

বড় বেশী আনস্মার্ট নাকি সে তাহার স্নেহ সম্ভাবিত ননদের চোখে। কথাটা পদ্মার কানেও আসে। মনে মনেই হাসে পদ্মা। কে কাহার বিচার করে?

কিন্তু তাহার কোমল মনে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। আজ যেন বড় স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইতেছে নিজের মূল্যকে। বিপাশা শুনিয়া চটিয়া যায়, "দোকানে সাজানো গয়নার মত নেড়ে চেড়ে দেখে যাবে মেয়েদের; এতটুকু মানুষের মর্যাদা পাবে না তারা! ছেলেদের একটা বিলাসী শখমাত্র বিদুষী বৌ পাওয়া? আর কিছু মূল্যই নেই এ শিক্ষার তাদের কাছে?"

পদ্মা এখন শশাংকশেখরের কাছেই থাকে। তাহাকে আর পড়াইবে না তাহার মা বাবা। আর পড়াইলে নাকি কন্যার উপযুক্ত পাত্র খুঁজিতে ফতুর হইতে হইবে ইন্দ্রশেখরকে। সুকল্যাণ ঠাট্টা করে, "পাশ্চাত্য সভ্যতা শুধু পোশাকে আর খাওয়ার টেবিলেই গ্রহণযোগ্য।"

চারতলার উপর দুইখানা ঘর লইয়া ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট বাড়ী শশাংকশেখরের।

শশাংকের ঘরে লোক আসে ঘন ঘন—পাণ্ডিত্যপূর্ণ তর্ক বিতর্ক সমালোচনা আর আলোচনা চলে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। পদ্মা বারান্দায় বসিয়া বসিয়া পুরান মাসিক পত্রিকা উল্টায়, কিন্তু পড়া

আর হয় না—ঘরের মধ্যে তুমুল তর্ক উঠিয়াছে। দুই পক্ষের বাদ-প্রতিবাদ। অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

সোভিয়েট, সাম্রাজ্যবাদী কি নয়—এই লইয়াই তর্ক উঠিয়াছে। কে একজন মন্তব্য করেন,—"পোল্যাণ্ড দখলের পর আর এ নিয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।"

শশাংকশেখর আবার বলিতে আরম্ভ করে "কোন দেশ সাম্রাজ্য-বাদী, কি সাম্রাজ্যবাদী নয়—তা' নির্ভর করে সে দেশ কি জাতীয় সমাজ গঠনে সাহায্য করে তার উপর। এক কথায় সোভিয়েটের সাহায্যে আজ সেখানে ধনতন্ত্রের না সমাজতন্ত্রের, শোষণ না মুক্তির পথ উন্মুক্ত হ'লো তার উপরই নির্ভর করে সোভিয়েটের ভূমিকা, নয় কি?" প্রশ্নের পর প্রশ্ন। উহাদের তুলনায় নিজেকে বড় অজ্ঞ মনে করে পদ্মা। সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কংগ্রেস পলিটিক্স, এ. আই. সি. সি রেজলিউশন, সর্বহারা বিপ্লবের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, সূক্ষ্ম কুট তর্ক চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ!

পদ্মা অভিভূত হইয়া শোনে। রাজনীতির জটিলতা বোঝে না সে। শ্রদ্ধা করে স্বদেশী ছেলেদের। শ্রদ্ধা করে সে, দেশবন্ধু, মতিলাল, লালা লাজপতের স্মৃতিকে। দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত চিত্ত জ্যেঠামণির সেই বিষণ্ণমুখ পদ্মার শিশুমনকেও সেদিন নাড়া দিয়াছিল। শ্রদ্ধা করে সে মহাত্মা গান্ধীকে। তাহাদের গ্রামেও গিয়াছিলেন সেই মহাত্মা। পদ্মার শৈশব উত্তীর্ণ তখন। সূতা কাটা রত সারিবদ্ধ স্বেচ্ছা-সেবিকার ভিতর দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায় পদ্মার পিসীমা এক ফালি খদ্দর পরিহিত এক অতি-মানুষকে। ছোট্ট পদ্মা বিস্মিত চোখে দেখিয়াছিল—দেশের মহাত্মাকে। বিপুল শক্তিমান, অলৌকিক

কিছু যেন আবির্ভাব হইয়াছিল সেদিন তাহার চোখের সামনে। মানুষ নয়—মহাত্মা!

অবাক হইয়া ভাবে পদ্মা, এতকাল সে শুধু নিজেকে এক কাব্যময় স্বপ্ন-ঘেরা পর্দার আড়ালে রাখিয়াছে। এ ক্ষুধার্ত পৃথিবীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখে নাই সে। একদিকে গীতা, উপনিষদ হিন্দুদর্শন আরেক দিকে জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীতের রোমাঞ্চ। এইত ছিল তার জীবন।

শশাংকশেখর বুঝায়, "তোর চোখের সামনে ভারতের ঐতিহ্যের নিশান তুলে ধরে আছে যারা—এই তেত্রিশকোটি নরনারীর মধ্যে তারা কয়জন। লক্ষ মানুষে একজনও হবে কিনা সন্দেহ। শুধু তারাই ধ্রুব সত্যরূপে চির অমর হ'য়ে থাকবে—আর বাকি লক্ষ লক্ষ নরনারীর এ মর্মব্যথা মিথ্যা হ'য়ে যাবে? যে অতীত ঐতিহ্যকে তোরা গালভরা স্তুতিবাক্য দিয়ে বন্দনা করছিস—তার মর্ম কথা জানে ঐ মাটির বুকের বঞ্চিত মানুষেরা। আগে বাঁচুক ওরা। তারপর এক সুরে, এক ঐক্যতানে বন্দনা গান রচিস সেই ঐতিহ্যের রথধ্বজার। তা' না হ'লে মুষ্টিমেয় মানুষের এ ক্ষীণ কণ্ঠের গান কালের স্রোতে ক্ষীণতর হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যাবে না?

বিপাশা একদিন পদ্মাকে ডাকিয়া লইয়া যায় তাহাদের এক বস্তির মিটিং-এ। কতকগুলি জীর্ণ খোলার ঘরের সামনে ছোট্ট একটু খোলা জায়গা—সামনেই একটা গরু মহিষের বাথান।

মাঠটুকুর উপর সারি সারি কয়টা দড়ির খাটিয়া। মরা-ঘাসের উপর বসা কমবয়সের একটি ভদ্রলোক—চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখে অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণতা। উনিই আজকে বক্তা। অনতিদূরে আরও কমবয়সের কয়টি ছেলে। অনুচ্চ স্বরে কি আলোচনা করে। অনুমানে বোঝা যায়, কলেজের ছাত্র তাহারা—মনের উত্তেজনাকে অপ্রকাশিত রাখায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই এখনও।

ক্রমে ছোট্ট মাঠটুকু ভরিয়া যায়। হিন্দুস্থানী শ্রমিক সব। মনে হয়, সবেমাত্র কোনও কর্মস্থল হইতে ফিরিয়াছে। ঘর্মাক্ত দেহ—কারখানার কালির চিহ্ন শরীরের স্থানে স্থানে।

সভা আরম্ভ হয়। শ্রমিকদেরই একজনকে সভাপতি করা হয়। একটা খাটিয়া খালি করিয়া দেওয়া হয় সভাপতির জন্য।

বক্তৃতা আরম্ভ হয় হিন্দিতে। পদ্মা বিস্মিত হয়, এত সহজে এত অনাড়ম্বর যে আবার জনসভা হইতে পারে সে জানিতও না ইহার আগে। পদ্মা অবাক হইয়া তাকায় শ্রোতাদের মুখের দিকে। গভীর মন দিয়াই শুনিতেছে তাহারা। চোখেমুখে ফুটিয়া উঠে যেন কোন দুরন্ত আশার মৃদু আলো। আবার কি শুনিয়া কালোছায়া পড়ে চোখেমুখে।

উহাদের সুখদুঃখের কথা। শুধু ভাষার ঝংকার নয়, প্রাণস্পর্শী সুচিন্তিত কথা সব। যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; সে যুদ্ধের ঢেউ তাহাদের বুকের উপর দিয়াও যাইবে। তাই আগে হইতে এ হুঁশিয়ারি —সতর্ক হইতে হইবে আগে হইতেই। না হইলে না খাইয়া ছেলে বৌ লইয়া পচিয়া মরিতে হইবে ফুটপাতে অলিতে গলিতে। শেয়াল কুকুরের ভিড় জমিয়া যাইবে এ সোনার বাংলা ভূমিতে।

পদ্মা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় বক্তার মুখের দিকে। চোখেমুখে ঐকান্তিকতার গভীরতা, দৃষ্টিতে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বিশেষত্ব নাই

চেহারায়, তবু বিশেষ কি যেন ধরা পড়িতে চায় দেহের বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে। প্রতিটি কথার মাঝে ঝরিয়া পড়িতে চায় কত গভীর মমতা।

বিপাশা ফিসফিস করিয়া বলে পদ্মার কানে "আমার দাদা অরুণাভ।"

পদ্মা বিস্মিত হয়, খুশিও হয়। এই বিপাশার দাদা! দেখা না হইলেও—বহুকালেরই পরিচিত সে পদ্মার শ্রদ্ধানত মনের অনুভূতিতে। কত অগণিত নিশ্চঞ্চল মুহূর্ত কাটিয়াছে তাহার এই বীর বন্দীদের ধ্যানে!

সভা শেষ হইয়া যায়। শ্রোতারা সব উঠিয়া যায় যে যার ঘরমুখে। বিপাশা বলে, "চল পদ্মা আমাদের নূতন আস্তানা দেখে যাও।' অরুণাভের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয় সে, "আমার বন্ধু—শ্রীমতী পদ্মা।"

মৃদুল মেয়ে পদ্মা খুশিতে মধুর হইয়া উঠে। তাহার দৃষ্টিতে ঝরে শ্রদ্ধা, ঝরে মমতা। অরুণাভ লক্ষ্য করে।

অরুণাভ ও বিপাশা ছোট একখানা বাসা ভাড়া করিয়াছে খালের ওপারে কলিকাতার শেষ সীমান্তে। দোতালার উপর একটা ছোট ছাদের সংলগ্ন দুইখানা মাত্র ঘর। বাড়ীর সামনেই এক জোড়া নারিকেল গাছ—নীচে একফালি খোলা মাঠ। অনতিদূরে খালের গা ঘেঁষিয়া খোলার ঘর সারি সারি—রংকল আর পাটকলের মজুরদের বাড়ী।

বিপাশার মা আত্মহত্যা করিয়া মারা যায়, বিপাশা তখন কথা বলিতেও শেখে নাই। বড় হইয়া সে বাড়ীর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখে নাই। যে সংসারে তাহার মা বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই সেই সংসারে থাকিয়া তাহার মৃতা মায়ের অপমান করিতে রাজী নয় সে।

তাহার পিতা থাকে যুক্তপ্রদেশের এক ছোট্ট শহরে। লোকমুখে শুনিয়াছে বিপাশাও তাহার পিতার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের কথা।

অরুণাভের পাঠ্যাবস্থা কাটিয়াছে তাহার ঠাকুরমার কাছে ধনেখালি গ্রামে। তারপর কলেজে পড়িতে আসিয়া স্বদেশী স্রোতের টানে সেও হারাইয়া যায় বহুদূরে। তাই দাদার সঙ্গেও সম্পর্কটা নূতন করিয়াই শুরু হইয়াছে বিপাশার।

দীর্ঘকাল পর এই প্রথম দুই জনেই দুইজনের আপন পরিচয়টি খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এই কয়মাসেই অরুণাভ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে তাহার পাড়ার মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে। মুদি, দোকানী, পান-বিড়িওয়ালা, কর্পোরেশনের স্কুলের প্রাইমারী শিক্ষক, স্কুল-ফেরতা শিশু ছাত্ররা, ঘুঁটে দেওয়া-রত পাগলী বুড়ীটা—সকলের সঙ্গেই যেন কত আপনা-আপনি ভাব তাহার!

পাগলী বুড়ীটা তাহাকে "ছেলে" বলিয়া ডাকে।

"ছেলে যাস কোথায় এই রৌদ্র মাথায় করে।" ডাকিয়া বলে সে। দিন ভরিয়া শুধু ঘুঁটেই দেয় পাগলীটা। হাসে অরুণাভ, "নিজেত এই রৌদ্র মাথায় করেই ঘুঁটে দিচ্ছ।"

"আমরা দীনদুঃখী মানুষ, আমাদের মাথার উপর রৌদ্র বৃষ্টি যাবে—এইত ঈশ্বরের বিধান।"

"চমৎকার বিধান কিন্তু ঈশ্বরের।" বলে বিপাশা পদ্মার দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিয়া। পদ্মা আপত্তি জানায় "এসব বিধানত আর ঈশ্বর করতে আসেননি। এ বিধান মানুষেরই দান।"

"অথচ বেচারা ভালমানুষ ঈশ্বরের নাম ভাঙিয়ে মানুষ তার কাজ হাসিল করে নিচ্ছে যুগ যুগ ধরে।" মৃদু হাসিয়া উত্তর দেয়

অরুণাভ। পদ্মাওত জানে তাহা। ইতিহাসে পড়িয়াছে সেও, ধর্মের নাম করিয়া কত অধর্ম, কত অন্যায় রক্তপাত হইয়া গিয়াছে পৃথিবীতে সব যুগে সব দেশেই।

চুপ হইয়া যায় পদ্মা।

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া দেখে, অরুণাভ, তাহার মায়ের মৃত্যুতিথি আজ। যেখানেই থাকে সে, এই দিনটিকে ভুলিতে পারে না। পরিষ্কার মনে আছে আজও তাহার মায়ের শেষ-দেখা মুখখানা। বিপাশার মুখে খুব বেশী সাদৃশ্য আছে মায়ের। এরকমই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্থন্দর চেহারা। বিপাশা অনেক চেষ্টা করিয়াও মায়ের মুখ মনে করিতে পারে না। অরুণাভ শুইয়া শুইয়া ভাবে, একটা দুঃখে-পোড়া জীবনের করুণ অবসান হইয়াছিল আজকের দিনে।

বিপাশা চা খাইয়া বাহির হইয়া যায়। অরুণাভ ডাকিয়া বলে, "পাশা, ফেরার পথে একটু ফুল নিয়ে আসিস।" বিপাশা একটু জিজ্ঞাস্থ নেত্রে তাকায়।

"আজ মায়ের মৃত্যু দিবস না।" অরুণাভ বলে ম্লানকণ্ঠে। বিপাশার মনটা ভিজিয়া উঠে দাদার জন্য।

মায়ের কথা উঠিলেই একটা বেদনার্ত ছায়া ঘনাইয়া আসে তাহার চোখে, বিপাশা লক্ষ্য করে।

"এত দুঃখময় জীবন গেছে তার, তাইত ভুলতে পারি নারে, বিপাশা, তার কথা। অমন স্থন্দর মুখখানাও মলিন হ'য়ে থাকতো

সব সময়। বাস্তবিকই মার মত সুন্দর মুখ আজ পর্যন্ত কারও দেখিনি।” বলে অরুণাভ। শেষ দিনটি আজও এত স্পষ্ট মনে পড়ে তাহার। তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া কি আকুল কান্না মায়ের। মায়ের কান্না দেখিয়া তাহারও চোখ ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। ঐটুকু বয়সেই কি করিয়া সে টের পাইয়াছিল, অবাক হয় আজ অরুণাভ, হয় তো মনের সহজাত অনুভূতি দিয়াই বুঝিয়াছিল সে বাবার প্রতি মায়ের প্রগাঢ় ভালবাসার কথাটা। বাবার জন্যই কাঁদে যে তার মা সর্বক্ষণ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিয়াছিল সেও। তাই সেদিন মায়ের চোখের বাঁধ-না-মানা বন্যা দেখিয়া বিভ্রান্ত বোধ করে নাই তাহার শিশুমন। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে মাকে, “বাবার জন্য কাঁদছো মা?”

মা যেন আরও ভাঙিয়া পড়িল তাহার কথায়। “নারে অরুণ, তোদের জন্যই বড় কষ্ট হ’চ্ছে। খুব ভাল ছে’লে হোস কেমন?” আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলাইয়াছিল মা তাহার মাথাটা বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া।

অরুণ যেন মায়ের কথা শুনিয়া একটা পথ খুঁজিয়া পাইল মায়ের কান্নার কারণ জানিয়া।

সে সান্ত্বনা দিয়া কচি কণ্ঠে জানাইয়াছিল, “তুমি কেঁদো না, মা, আমি খুব ভাল ছেলে হ’বো। বোনটিও খুব ভাল মেয়ে হ’বে।” এই তার শেষ কথা মায়ের সঙ্গে।

অরুণাভ আর বলিতে পারে নাই। বিপাশার হাতখানা কাছে টানিয়া লয়। বিপাশারও চোখ ভিজিয়া উঠে, মায়ের জন্য নয়, দাদার এ দুর্বল শিশুর মূর্তি দেখিয়া। যেন সেই দশ বছরের অসহায় অরুণ। জন্মের মত মাতৃহারা ছোট্ট অরুণ।

সন্ধ্যার পর ঘরে ফেরে বিপাশা দুইটি শ্বেতপদ্ম হাতে লইয়া। পদ্মাও আসিয়াছে তাহার সাঙ্গে।

সন্ধ্যা হইতেই অরুণাভ ছাদে বসিয়া আছে চুপ করিয়া। দূরের আকাশে গাঢ় অন্ধকার—যেন অজানা অন্ধকার মৃত্যুকেই ইঙ্গিত করিতেছে। মৃত্যুর পরপারের জিজ্ঞাসা দিয়াইতো আরম্ভ মানুষের জীবনদর্শন। তারপর কি—এ প্রশ্নের সমাধান মিলিয়াছে মানুষের মনে; কিন্তু অনুভূতির রহস্য কাটে নাই আজও।

পদ্মাকে গান করিতে অনুরোধ জানায় বিপাশা। স্বভাবতই লাজুক মেয়ে পদ্মা। কিন্তু আজ এ স্মৃতিদিবসের মৌন গম্ভীর পরিবেশে তাহার নিজেরও মনের ব্যথার স্থানকে নাড়া দিয়া যায়। গভীর ভাবাবেগে গান করে পদ্মা—"হে মহা জীবন, হে মহা মরণ।"

দ্বিতীয়ার চাঁদের প্রথম জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে আবেশস্নিগ্ধ মুখে। একটা ভাবাচ্ছন্ন অনুভূতির সৃষ্টি ক্ষণিকের জন্য। পদ্মা যেন আজ নূতন করিয়া পরিচয় পাইল অরুণাভের। অভিভূত হইয়া ভাবে এত কাজের আড়ালে লুকান মানুষটির অন্তর্দেশেও জমিয়া আছে এত কোমলতা, এত স্মৃতির পীড়ন!

অন্ধকার ভোরে উঠিয়া বাহির হইয়া যায় অরুণাভ। খালের ধার দিয়া হাঁটে শহরের দিকে। চাদরের তলায় লিফলেটের ভারি বাণ্ডিলটা একটু শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরে। মনে মনে একবার

চোখ বুলাইয়া লয় ইস্তেহারের জ্বলজ্বলে অক্ষরগুলিতে।—বিপ্লবের সংকেত ধ্বনি, লিথোকরা কাগজের মোড়কে।

রাস্তার কলের ধারে বস্তির মানুষদের ভিড় জমিয়া গিয়াছে—পিতলের ঘটি, কলসী হাতে মেয়ে পুরুষের ভিড়।

ফরসা হইয়া আসিতেছে পূবাকাশ।

তাড়াতাড়ি পা চালায় অরুণাভ। ইরার বোন হয় তো এতক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহার অপেক্ষায়।

বড় ছেলেমানুষ এখনও মেয়েটি। শক্ত কাজের ভার লইয়াছে। পারিবে ত সারিয়া আসিতে। নিশ্চয়ই পারিবে, না হইলে আর এ কাজে পাঠাইবে কেন তাহাকে। বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি। দিদির মতো অত কথা বলে না।

হেদোর পূব দিকেই ত দাঁড়াইবার কথা ছিল। কিন্তু শিপ্রা ত আসে নাই। হেদোর চারি প্রান্তে চোখ ঘুরাইয়া আনে। না; কোথাও নাই। হাত-ঘড়িটায় চোখ নামায় একবার।

শিপ্রা না আসিলে সব পণ্ড। সকালের ভিতরে পৌঁছাইয়া আসিতে হইবে লিফলেট গুলি, শ্রমিকরা কাজে হাজিরা দেওয়ার আগে।

"অরুণদা।" অপরাধীর স্বরে ডাকে মেয়েলী কণ্ঠে পিছন হইতে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। হাঁপাইতেছে সে। "এই যে, আসতে পেরেছো। আমি ভাবলাম—বাড়ীতেই আটক পড়লে বুঝি।"

অরুণাভ তাকাইয়া দেখে, এখনও ঘুম জড়ান রহিয়াছে চোখের পাতায়।

একটু করুণামাখা স্নেহ উকি মারিয়া যায় অরুণাভের চোখে শিপ্রা লজ্জিত স্বরে বলে, "জীবনে এত ভোরে উঠিনি কোনদিন।"

অরুণাভ ভাবে মনে মনে "জীবনে যা' করনি এমন অনেক কাজই করা বাকি এখনও তোমাদের।" শিপ্রা চলিয়া যায় বাণ্ডিলটা লইয়া।

অরুণাভ তাহার সপ্রতিভ চলার ভঙ্গির দিকে তাকাইয়া মনে মনে প্রশংসা করে, "ঠিক আছে।"

আবার হাঁটিতে শুরু করে সে, চাঁদা আদায় করিতে হইবে পুরান বন্ধুদের কাছ হইতে। চায়ের আসরেই ধরা চাই তাদের। পথের মোড়ে মোড়ে পত্রিকার পাঁজা খুলিয়া বসিয়াছে হকারেরা। পত্রিকার বড় হরফের প্রথম অক্ষরগুলি মোচড় দিয়া যায় হৃৎপিণ্ডে। পৃথিবীর দুই প্রান্তে ফ্যাসিজমের কাল চক্রান্তের খেলা শুরু হইয়াছে।

তবু মনে প্রাণেই বিশ্বাস করে সে, "ধনতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যই ফ্যাসিজমের উৎপত্তি—তবু এ ফ্যাসিজম থেকেই ধনতন্ত্রের মারণাস্ত্রের স্বষ্টি হ'বে।"

অরুণাভ চলিতে চলিতে লক্ষ্য করে, প্রতিটি বাড়ীর রোয়াকেই রাজনীতির আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে ভোরের কাগজ খুলিয়া।

যুদ্ধের আলোচনা।

অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধ গৃহস্বামী, প্রৌঢ় ভদ্রলোক—যুবক গৃহশিক্ষক—সবাই গোল হইয়া বসিয়া যোগ দেয় এ আলোচনায়।

"কি খবর যুদ্ধের। ইয়োরোপের আর বাকি রইল কতটুকু।"

"ইংরাজের ব্যালান্স অব পাওয়ারের নীতিত ফসকে গেল হিটলারের চালে।"

"সোভিয়েটের অনাক্রমণ চুক্তিতে সব উল্‌টে দিল।"

"বলা যায় না। এসব ইনটারন্যাশনাল পলিটিক্স বোঝা তোমার আমার কাজ নয়। চুক্তি ভাঙতে কতক্ষণ।"

দিকে, এ গুঁড়ি বৃষ্টি থামিবার লক্ষণ আছে কিনা। একটা অলস ভাব আসিয়া জমিয়াছে যেন আজ দেহে ও মনে। বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছে না। কিন্তু বাহির না হইয়া উপায় নাই। মেয়েদের একটা পাঠ চক্রে ক্লাস লইতে হইবে তাহাকে।

পাশের ঘর হইতে মেয়েলী গলার টুকরা টুকরা আলাপ, বিপাশার উচ্ছল হাসির ফোয়ারা ভাসিয়া আসিতেছে জানালা ঘুরিয়া। অনুমানেই বোঝে, পদ্মা আসিয়াছে।

অরুণাভ ভাবে বিপাশার কথা। দুঃখ যত গভীরই হোক, ওর মনে স্পর্শ করে না স্থায়ীভাবে। শুধু চলার আনন্দেই প্রাণবতী করিয়া তোলে পথচলার শ্রান্তিকে।

আর শোওয়া চলে না। জোর করিয়াই দেহ মনের এ অলসতাকে ঝাড়িয়া ফেলে।

পদ্মাকে ডাকিয়া বলে, "পদ্মা, কষ্ট করে এলেই যখন সময়মত, তখন আর একটু কষ্ট করে দুকাপ চা খাইয়ে যাও।" একটু আবৃত্তির সুরে বলে, সে, "প্রথম পিয়ালা কণ্ঠ ভিজায়, দ্বিতীয় আমার তৃষ্ণা নাশে।"

বিপাশা ঠাট্টা করিয়া বলে, "বিপাশার করা চায়ে বুঝি তৃষ্ণা নাশে না?"

অরুণাভ উত্তর দেয়, "আমরা বাংলাদেশের ছেলে, পদ্মার পরিবেশনেই মন তৃপ্ত হয়। বিপাশা এসেছে বড় রুক্ষ দেশের ভিতর দিয়ে। তার অনুর্বর দানে আমাদের মন ভেজে না।"

বিপাশা কপট অভিমানের সুরে বলে, "আচ্ছা, দেখাই যাবে কাল ভোরে ঘুম থেকে উঠে। তখন স্রোতস্বিনী পদ্মার পাত্তাও পাবে না।"

তারপর একটু দুষ্টুমির হাসি ভরা চোখে বলে, "আর যদি চোরা বালির তলায় লুকিয়েও থাকে সে স্রোতস্বিনী তাকে দিয়েত আর চায়ের পিপাসা মিটবে না—তখন এ বিপাশারই স্মরণ নিতে হ'বে।" পদ্মা আরক্তিম হইয়া উঠে একটু। সে উঠিয়া গিয়া চায়ের সরঞ্জাম গুছায়, অরুণাভ ষ্টোভ ধরায়। কেটলিতে জল ফুটিয়া ধুঁয়া বাহির হয়। অরুণাভ বলে, "দেখ, পদ্মা, কেমন কোয়ালিটেটিভ চেইঞ্জ হ'চ্ছে।"

বিপাশা ঠাট্টার সুরে বলে, "মার্ক্সীয় দর্শনের একটা গোড়ার কথা। একেবারে ডিরেক্ট মেথডে ট্রেণিং পাচ্ছ পদ্মা।"

অরুণাভ হাসিয়া বলে, "তার চেয়েও ডাইরেক্ট এ্যাপ্লিকেশন হ'চ্ছে আমার মনে।"

পদ্মা নিজের অলক্ষ্যে আবারও একটু আরক্তিম হইয়া উঠে, লক্ষ্য করে অরুণাভ।

সে বলিতে থাকে, "চোখের সামনে ধোঁয়া-উড়ান সুন্দর এক কাপ চা। সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হ'য়ে উঠে মন। এই দেখ্না, বৃষ্টির দিনের এ বুড়ো মনটা এক নিমেষে ইয়াং হ'য়ে উঠেছে। এই জন্যইত পত্রিকাগুলির অধিকাংশ জুড়ে চায়ের এত গুণগান।"

বিপাশা ঠাট্টা করে, "তার উপর সে চায়ের পেয়ালা যদি কোন সুন্দর কঙ্কন-পরা হাতে পরিবেশিত হয়।" "তা'ত হয়ই।" হাসে অরুণাভ পদ্মার মুখের এই রক্তিমাটুকু উপভোগ করিয়া। ভাল লাগে তাহার এ স্নিগ্ধভাবটি। এক চুমুক চা খাইয়া বলে "অবশ্য আমাদের টু-পাইস রেঁস্তোরার নিমাইর হাতের পরিবেশনও খারাপ নয়, প্রায় পদ্মার কাছাকাছিই আসে।"

বর্ষাতিটা গায়ে জড়াইয়া অরুণাভ বাহির হইয়া যায়, "চলি, পদ্মা, মাঝে মাঝে এসে এমন চা খাইয়ে যেও।"

শশাংকের ঘরে ছোট্ট একটি আসর জমিয়াছে শীতের সন্ধ্যায়। অনুপম আসিয়াছে। দেশে যাইতেছে সে বোনের বিবাহ উপলক্ষে। আলোচনা জমিয়া উঠে। পদ্মা কেটলিতে চায়ের জল বসাইয়া আসে।

সাহিত্য লইয়া আলোচনা। বক্তা অনুপম একাই, যেন এক-নিঃশ্বাসে সব কিছু বলিয়া ফেলিতে চায়। অনুপম অভিযোগ জানায়, সাম্যবাদীরা সাহিত্যের মর্যাদা দিতেছে না। এইবার তর্ক উঠে।

পদ্মা এক কোণে বসিয়া শোনে তর্ক। মনে মনে ভাবে সত্যিই কি অনুপমের কথাই ঠিক। বুর্জোয়া মিষ্টিসিজম বলিয়া ব্যঙ্গ করে সাম্যবাদীরা রবীঠাকুরকে। গর্ভস্থিত সন্তানের মতই শিল্পীর মনের এ বিস্ময়, ব্যথা ও আনন্দ-ভরা এ চাঞ্চল্য—উহা কি স্বীকার করে না তাহারা? মানুষের অন্তরাত্মার সৌন্দর্য পিপাসাকে কটাক্ষ করে বিলাস বলিয়া। অফুরন্ত চিন্তায় জটিল হইয়া উঠে পদ্মার নূতন-সংশয়-লাগা মনে।

ওদিকে তর্ক জমিয়া উঠিয়াছে। বিপাশা চুপ করিয়া থাকার মেয়ে নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলে।

অনুপমের গাড়ীর সময় হইয়া যায়। সে উঠিয়া পড়ে "আজ চলি। ফিরে এসে একদিন এ আলোচনা শেষ করা যাবে।" বলিয়া যায় সে। আবার আলোচনা আরম্ভ হয় অনুপমকে লইয়াই।

বিপাশা বলে, "শুধু কথার বুনোনি আর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দিয়ে বক্তৃতার আসর জমান যেতে পারে, কিন্তু তার প্রভাব দিয়ে মানুষকে

কাছে টানতে হ'লে, চাই দরদ, চাই জীবনাদর্শ। এরা সব কিছুই বিচার করেন পাণ্ডিত্যের মাপ কাঠি দিয়ে, অন্তর দিয়ে নয়।"

পদ্মার মনের কোন এক সূক্ষ্ম তারে যেন টান পড়ে বিপাশার কথা শুনিয়া। অনুপম তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাহার বাগ্ময় স্বভাব, তীক্ষ্ণ সাহিত্য-সমালোচনা, সৌন্দর্যানুভূতি এই সব দিয়াই তাহার মন আচ্ছন্ন করিয়াছে সে। কিন্তু এই বিরাট ব্যক্তিটিও নিষ্প্রভ বিপাশার চোখে। একটা অস্বস্তিকর আহত চেতনায় পীড়িত বোধ করে মনে। অনুপমকে জানার পর এই প্রথম জানিল সে—অনুপমও সম্পূর্ণ নয় সব দিক দিয়া। জীবনের একটা বিরাট অংশেই তাহারও আছে ফাঁক, আছে ফাঁকি।

অরুণাভ ঠাট্টা করে বিপাশাকে, "আসলে পালিটিক্স না করলে তোরা আর কাউকে আমলই দিতে চাস না।"

বিপাশা উত্তর দেয়, "তা' ত না। দোষ দেই এই জন্য, এঁরা কথা বলেন অনেক, কাজ করেন না কিছুই। রাজনীতির ক্ষেত্র বাদ দিয়েওত জীবনের পরিধি আছে। যে ক্ষেত্রেই হউক। জীবন রস খুঁজতে হ'লে দরদও লাগে, তা' নেই বলেই সোভিয়েট সাহিত্য এঁদের কাছে শুধু প্রোপাগাণ্ডার মাইক্রোফোন। তাছাড়া, শুধু কথার মালা দিয়ে মানুষকে কাছে টানা যায় না, মানুষের জীবনাদর্শটাই মানুষকে কাছে টানার বড় সত্য—একথাটাত একজন বড় মানুষেরই বলা।"

পদ্মার মনে নূতন সংশয় দেখা দেয়। শুধু এক বুদ্ধির ধার ছাড়া আর কোনও পরিচয়ই ত সে জানে না অনুপমের। কোনদিন ভাবেও নাই, এ মানুষটি হৃদয়বান কি নয়, উদার কি অনুদার, বলিষ্ঠ কি দুর্বল। শুধু দেখিয়াছে তাহার সমালোচনার সূক্ষ্মতা, পাঁচমিশালী

আলোচনার অনবদ্য ভঙ্গিটি। আজ চিন্তা করে অনুপমের প্রতিটি কথা। উপমা আর যুক্তির বর্ণালি। যাহা কিছু বলে—সবই যেন স্বতঃসিদ্ধান্তমূলক; প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন নিসংশয় বক্তব্য তাহার। নিজের সম্বন্ধে পূর্ণ আস্থারই প্রতিধ্বনি যেন প্রতিটি কথা। তবু সমগ্রভাবে তাহার জীবন-আদর্শ সম্বন্ধে কিছুই স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কি এক অভাব থাকিয়া যায় অনুপমের এই অফুরন্ত কথার বুনানিতে। অনুপম চঞ্চল করে, অশান্ত করে মনকে, কিন্তু কাছে টানে না।

অথচ অরুণাভের সঙ্গে পরিচয় ত কত পরে, তবু এত নিকট করিয়া ফেলিয়াছে তাহাকে সে এই কয়দিনেই। তাহার ভিতরে লুকান আছে কিসের এক আকর্ষণীয় গভীর আন্তরিকতা।

পদ্মা শ্রদ্ধা করে তাহার জ্যেঠিমা, জ্যেঠামণি পিসীমাকে, ভালবাসে বিপাশা ও সুকল্যাণকে। তবু মনে হয়, আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কেহ নাই তাহার এ পৃথিবীতে। পদ্মা টের পায় অরুণাভের চোখে ধরা পড়িয়াছে তাহার এই নিঃসঙ্গ রূপটি।

অরুণাভ কথা বলে কম। অরুণাভের উপস্থিতিটা অনুপমের মত অত চমকপ্রদ নয়; তবু সে যখন চলিয়া যায়, মনের ভিতরে কি একটা ব্যথার ইঙ্গিত অনুভব করে সে অনুক্ষণ।

পদ্মা জানালার ধারে বসিয়া "মহুয়া"র কবিতা পড়িতেছে। ষ্টোভের উপর চায়ের জল চাপান। মেঝের উপর শেষবেলার ম্লান রৌদ্র একফালি।

অরুণাভ ঘরে ঢোকে এক বাণ্ডিল কাগজ লইয়া। পদ্মার কোলের উপর বইটাতে নিমেষের জন্য চোখ বুলাইয়া ঠাট্টার স্বরে বলে, "কাব্য কত।"

পদ্মা ঠাট্টার স্বরে উত্তর দেয়, "তা' একটু ত আছেই। মহুয়ার পাতা পু'ড়িয়ে পু'ড়িয়ে যারা চায়ের জল গরম করে, তাদের দলে ভিড়তে পারার যোগ্যতা অর্জন করিনি আজও।"

"কিন্তু মহুয়ার পাতা প'ড়ে প'ড়েও চায়ের জল গরম করে যারা, তাদেরও দলে ভিড়ানোর মত যোগ্যতা অর্জন করেছি আমরা। দুষ্টমি-ঝরা চোখে বলে অরুণাভ, "কাজেই একটা রাতে, একটু কষ্ট করতে হ'বে আমাদের জন্য। একরাশ পোষ্টার লেখা বাকি এখনও। আজ রাতের মধ্যেই শেষ করা চাই। একা সারারাত জাগলেও শেষ হ'বে না। অগত্যা তোমারই শরণাপন্ন হ'লাম। বেকার মানুষের জন্য একটা কাজ নিয়ে এলাম ; খুশি কি না বল।"

"কাজটা চিরস্থায়ী ত ?" পদ্মা একটা মাদুর বিছাইয়া দিয়া বলে।

"সেটা বিচার হ'বে কাজের যোগ্যতা দিয়ে।" উত্তর দেয় অরুণাভ।

পদ্মা উঠিয়া গিয়া চা তৈয়ার করে। অরুণাভ বসিয়া পড়ে তুলি, কালি, কাগজ বিছাইয়া।

পদ্মাও আসিয়া বসে একটা তুলি লইয়া। তুলির টানে টানা টানা বড় বড় লাল অক্ষরগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠে। মিনিটের পর মিনিট কাটে নিঃশব্দে। মন দিয়া লিখিয়া যায় সে। তাহার সমস্ত সত্তায় কি একটা তৃপ্তির আমেজ চুয়াইয়া উঠে, বোঝে না—কেন।

বাহিরে রাত্রির নিস্তব্ধতা জমিয়া উঠে ধীরে ধীরে। ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার রাত্রি।

পাশের ঘরে পড়ায় মগ্ন শশাংকশেখর। অরুণাভই কথা বলে আবার নীচু গলায়, "আমাদের বাড়ীতে ওয়াচ বসেছে। মনে হ'চ্ছে বিপাশার উপরই নজর। তাই এখানে এলাম। এ বাড়ীটা নিরাপদ আছে এখনও।

একটু থামিয়া আবার প্রশ্ন করে সে, "নীচের ফ্লাটের মানুষরা কেমন সব।"

পদ্মা উত্তর দেয় না। একটু লজ্জিত হয়। মিশুক মেয়ে নয় সে। নিজে হইতে যাচিয়া কাহারও সঙ্গে মিশিতে জানে না সে। তাই এতদিন যাবৎ আসিয়াও কোনও ফ্ল্যাটেরই মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয় নাই তাহার। অরুণাভ কি একটু ভাবিয়া লইয়া বলে, "মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকাটা কিন্তু গুণ নয়।"

শশাংকশেখর একবার ঘুরিয়া যায়, "কি তোমাদের কতদূর হ'ল। আমি কিন্তু শুয়ে পড়লাম।"

লজ্জিত সুরে উত্তর দেয় অরুণাভ, "শশাংকদা, আমারও কিন্তু আজ আর বাড়ী ফেরা হবে না। এখানেই কাটাতে হবে রাত। ভেবেছিলাম পদ্মা বুঝি সত্যি কাজের মেয়ে। কিন্তু যে গতিতে হাত ঘুরছে, আল্পনাই দেওয়া চলে এ হাতে।"

পদ্মা প্রতিবাদ জানায়, "আচ্ছা শুনেই দেখা যাক্ আলপনা দেওয়া হাতে পোষ্টারও লেখা চলছে কি না।" অরুণাভ খুশি হয় তাহার উৎসাহ দেখিয়া। একটু তাকাইয়া দেখে গভীর মন দিয়াই লিখিতেছে পদ্মা—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

মোমাধারের ম্লান আভা আসিয়া পড়িয়াছে তাহার ঘন-পক্ষ্মাবৃত আনত চোখ দুইটিতে। একটা নূতন আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে চোখের পল্লবে। গভীর উপলব্ধির সাথেই তুলি ঘুরাইতেছে যেন সে।

টানা টানা হস্তাক্ষর। মেয়েলী কি পুরুষের লেখা বোঝার সাধ্য নাই। ঘন ঘন কালিতে তুলি ডুবায় সেও। দ্রুত হাত ঘুরায়। পদ্মা একটু তাকাইয়া বলে, "অমন লেখা কি আর লোকে পড়তে পারবে?"

"খুব পারবে। রাত জেগে এত কষ্ট করে যদি লিখতে পারি আমরা, তারা একটু কষ্ট করে পড়তেও পারবে না?"

দূরে কোনও বড় লোকের বাড়ীতে ঘণ্টা বাজে, এক দুই। অরুণাভ হাত ঘড়িটায় একটু চোখ বুলাইয়া বলে "দু'টো বাজলো। আর আধ ঘণ্টা বাদে তোমার ছুটি।"

"আর আপনার।"

"দেশে যেদিন মজদুর-রাজ গঠন হ'বে, সেদিন।"

পদ্মা চুপ হইয়া যায় শ্রদ্ধায়। মনে মনে ভাবে, কি কঠিন দায়িত্ববদ্ধ জীবন উহাদের। কাজ, কাজ শুধু কাজ। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই।

অরুণাভ ঠাট্টা করিয়া বলে, "আজ ত পদ্মা আমাদের সাথে বসে ধনীর রাজত্ব উচ্ছেদ করার জন্য রাত জেগে মরছো। আর দু'মাস পরেই যখন কোন ভাগ্যবান বিজনেসম্যানের ঘর আলো করতে যাবে, তখন আবার এই পদ্মাকেই হয়তো দেখবো আমরা, ষ্ট্রাইক-বিরোধী কোনও সভার সভানেত্রীরূপে। তাই না?"

অরুণাভ শুনিয়াছে, পদ্মার বিবাহ স্থির করিয়াছে তাহার দাদা, তাহার এক বন্ধু বিজনেসম্যানের সঙ্গে। অরুণাভ পোষ্টারের উপর তুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলে মুখ না তুলিয়াই, "সেদিন আমাদের বিরুদ্ধে যত রণরঙ্গিণী মূর্তি ধর না কেন, বৌ ভাতের নিমন্ত্রণে যেন আমরা বাদ না পড়ি।"

দুষ্টুমি ভরা চোখে তাহার মুখের দিকে তাকায় সে। পদ্মার ম্লান পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকাইয়া এক মুহূর্তে চুপ হইয়া যায় অরুণাভ।

পদ্মা হাসে, বিষণ্ণ করুণ হাসি। স্থির দৃষ্টিতে তাকায় সেও অরুণাভের দিকে। অরুণাভ যেন জীবনে দেখে নাই এত করুণ, এত অন্তস্পর্শী দৃষ্টি। কি যেন কি ধরা দেয় সে দৃষ্টির আড়ালে।

অরুণাভ ভয়ানক ভাবে হোঁচট খায় মনে মনে। কি একটু ভাবিয়া সে আবার প্রশ্ন করে, "পদ্মা, তোমার মত নেই কি এ বিয়েতে।"

পদ্মা ম্লান হাসিয়া বলে, "আপনার কি মনে হয় আমাকে দেখে।"

অরুণাভ উত্তর দেয় না। একমনে তুলি ঘুরায় দুইজনেই। অরুণাভ ভাবে পদ্মার মত নাই, তবু হয়তো বিবাহ হইয়া যাইবে তাহার ঐ ধনীর গৃহেই। চুপ হইয়া যায় সে।

ঘড়িতে আবার তিনটা বাজে পাশের কোনও বাড়ীতে। অরুণাভ পদ্মার দিকে তাকাইয়া বলে, "আর লিখতে হবে না, এবার শুয়ে পড়।"

"তা' হ'লে আপনিও থামুন। এক সাথে আরম্ভ করে, আপনাকে মাঝখানে রেখে চ'লে যাওয়াটাত ভাল দেখায় না।"

"ভাল দেখাতে চাইলেত, পদ্মা, সারাজীবনই চলতে হয় একসাথে। তা'ত সম্ভব নয়। কাজেই উঠে পড় এবার।"

তাহার কথায় পদ্মার চোখ দুইটিতে একটু আরক্তিম আভা খেলিয়া যায় নিমেষের জন্য। অরুণাভ লক্ষ্য করে। কেন জানি মনটা ম্লান হইয়া যায় তাহারও। পোষ্টারগুলি গুছাইয়া রাখে সে—কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে হইবে।

আকাশের অনেক উঁচুতে একটা উড়োজাহাজ চলিয়াছে দক্ষিণ-মুখী। জানালা দিয়া দেখা যায়, ঊর্দ্ধ আকাশে তারার মত ছুটিয়া চলিয়াছে এরোপ্লেনের নীলাভ বাতি দুইটি।

অরুণাভ বাহির হইয়া যায়।

পদ্মার চোখে আর ঘুম আসে না।—উদ্বেগে ভারী হইয়া থাকে মন। শুইয়া শুইয়া ভাবে, উহাদের এ যাত্রা জয়যুক্ত হইবে কবে।

পশ্চিম আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ। নীচে ফুটপাতের উপর ঘুমাইয়া আছে গৃহহীন মানুষেরা। ফেকাশে জ্যোৎস্নায় দেখা যাইতেছে, প্রেতলোকের অচেতন মূর্তির মত। অন্ধ ভিখারীটিও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ছোট ছেলেটিকে নিবিড় ভাবে বুকের কাছে লইয়া। তাহারই পাশে ঘুমাইয়া আছে লোম-ওঠা কুকুরটা। দূরে নারিকেল গাছ জোড়াও তন্দ্রাচ্ছন্ন। শুধু ঘুম নাই পদ্মার চোখে—মমতায় আচ্ছন্ন দুটি ভীরু চোখ।

বিপাশা একরাশ টুকরা কাপড় লইয়া বসিয়াছে সূচসূতা লইয়া, গভীর মনোযোগ সহকারে জোড়া দিতেছে। পদ্মা ঘরে ঢুকিয়া হাসি চাপিয়া বলে "কি ব্যাপার? হঠাৎ এত সুগৃহিণী হওয়ার চেষ্টা?" ম্লান স্বরে বিপাশা উত্তর দেয় "কি করবো বল। যা শীত পড়েছে এবছর। স্কুলের ছেলেমেয়েরা শীতে কুঁক্‌ড়ে থাকে; দেখলে এত মায়া লাগে।"

বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কাপড়ের টুকরাগুলি যোগাড় করিয়াছে বিপাশা। বস্তি স্কুলে পড়ায় সে খালের ওপারে। উন্মাদ আনন্দ বিপাশার এই সর্ব-বঞ্চিত শিশুদের পূর্ণ মানুষ করিয়া তোলার কল্পনায়।

পদ্মাও দেখিয়াছে তাহার গ্রামের দরিদ্র সন্তানদের। সেই মহারাণী, যমুনা, গোলাপী। "বুড়িগঙ্গা" খেলিত সে ছোট বেলায়

তাহাদের সঙ্গে; খেলনার হাঁড়ি-পাতিল লইয়া শিশু ঘরকন্নার কত রোমাঞ্চময় খেলা। তারপর সে খেলার সাথীরা সত্যিকারের ঘরকন্যার খেলা খেলিতে চলিয়া গিয়াছে কোথায়! হয়তো কত অথৈ দারিদ্র্যের বন্ধনে নিষ্পেষিত তাহার বাল্যের খালপারের সহচরীরা।

কিন্তু পদ্মা জানিত না এতকাল, সেই নগ্ন দরিদ্র শিশুদের আড়ালে আছে এক বিরাট বৃহৎ পৃথিবী জোড়া আর্তধ্বনির ঐক্যতান। জগৎ জুড়িয়া আছে উহাদের সগোত্র; সমস্বার্থের বেদনা-বোধে বাঁধা বিপুল একটি সর্বহারার দল।

পদ্মা একটু লক্ষ্য করিয়া বলে, "এ শেলাইত বেশীদিন টিকবে না। তার চাইতে আমি নিয়ে যাই। আমাদের পাশের বাড়ীতে একটা শেলাইর কল আছে। সেখান থেকে শেলাই করে এনে দেব।"

বিপাশা খুশি হয়।

"কিন্তু কটা জামাই বা হ'বে এতে, তাই ভাবছি।" বলে বিপাশা একটু চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে, "আর শুধু ঐ একটা বস্তি স্কুলইত নয়। সমস্ত কোলকাতার ফুটপাতের উপর দিয়েইত বয়ে যাবে এ চাবুক বসান শীতের হাওয়া।" সমস্ত কলিকাতার ফুটপাতে, সহর-তলিতে পল্লীতে পল্লীতে আরম্ভ হইবে মৌশুমী হাওয়ার অসহনীয়তা। পত্রিকায় পড়িয়াছে সে, একটি ভিখারী মরিয়া গিয়াছে মুশৌরীতে শীতে জমিয়া। শীতের রাত্রির এই অসহ্য প্রহরগুলি যে কি ভীষণ নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছে ফুটপাতের বুকে শোওয়া উলঙ্গ শিশুদের ক্ষুদ্র দেহে, জানে বিপাশা। চুপ করিয়া ভাবে পদ্মা, বিপাশার মনেত নাই কোনও আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণ। ভগবানেও বিশ্বাস নাই তাহার অবিশ্বাসী মনের। তবু তাহার এ মমতাময়ী দৃষ্টি প্রসারিত পৃথিবীর এ প্রান্তে ও প্রান্তে। ভিন্নভাষাভাষী ইয়োরোপের শ্রমিক

শিশুর শীতে জড়োসড়ো করুণ ছবি আর সুদূর প্রাচ্যের মঙ্গোলীয়ান শিশুর অসহায় গোল-গোল মুখগুলিও হৃদয়ে নাড়া দিয়া যায় তাহার।

কিন্তু বিপাশার এ ব্যথাভরা মনে নাই এতটুকু নিরাশায় ছায়া। এ গাঢ় তমসা-ঘেরা পথযাত্রায় ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ দূরের কোন এক ধ্রুব-লোকের উজ্জ্বল ইশারার প্রতি। তাই দৃষ্টিতে ওর নাই হতাশা, নাই পথভ্রান্তির ভীতিবিহ্বলতা, সুনিশ্চিত যেন বিপাশা, সে তাহার রথধ্বজা-তলে পৌঁছিবেই একদিন। তাই এত অফুরন্ত ও কথায়, এত উজ্জ্বল ও ঘন-আশায়। উহারা ধর্ম মানে না, কিন্তু এ পরার্থপরতা, এ আত্মবিশ্বাস, এ ত্যাগ; ইহাইত ধর্মের মর্মকথা। সুকল্যাণ দোষ দেয় উহাদের জাতীয়তা-বিরোধী বলিয়া। তাহা হইলে উহারা দেশের মানুষকে এমন করিয়া ভালবাসে কি করিয়া!

প্রকাশ কয়দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছে—তাহার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে। পদ্মার বিবাহ ঠিক করিয়াছে সে তাহারই এক বড় লোক কণ্ট্রাক্টর বন্ধুর সঙ্গে। পদ্মাকে জানায় সংবাদটা। একটা ফরম্যাল্ মতও নেওয়া দরকার। শিক্ষিতা, সাবালিকা যখন।

পদ্মা তাহার প্রতি তাহার মা ও দাদার ব্যবহার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। পারিবারিক জীবনের সবকিছুর প্রতিই একটা বিদ্বেষ-ভাব জন্মিয়া গিয়াছে তাহার। আগের সে ভীরুস্বভাবের স্থানে দেখা দিয়াছে এক বিদ্রোহী মন। খুশিমত ঘুরিয়া বেড়ায় আজকাল পদ্মা; রাত হইয়া যায় তবু বাড়ী ফেরে না। শশাংকশেখর লক্ষ্য করে পদ্মার

এ পরিবর্তন ;–কিন্তু বিস্মিত হয় না। এ প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক নয়— এরকম কৃত্রিমভাবে গড়া মনের পক্ষে। তাহা বোঝে সে।

কিন্তু প্রকাশ অবাক হয়, ভীত হয়, ক্রুদ্ধও হয় মনে মনে বোনের চালচলন দেখিয়া।

পদ্মা স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে, প্রকাশের উত্থাপিত বিবাহের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অমত তাঁহার। পদ্মার মত শান্ত, নম্র মেয়ের পক্ষে এ ঔদ্ধত্য স্পর্দ্ধাতীত। সমস্ত দোষ পড়ে শশাংকশেখরের উপর। এতটা স্বেচ্ছা-চারিতার প্রশ্রয় দেওয়া খুব অন্যায় হইয়াছে। চাপা বিরক্তি ফুটিয়া উঠে প্রকাশের চোখে মুখে। কম্যুনিষ্টদের মিটিং-এ এত যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন পদ্মার! তাহাদের পরিবারের আদর্শের সঙ্গে মিল হইতে পারে না কোনোদিন সাম্যবাদীদের আদর্শের। তাছাড়া দেশাচারও মানিতে চায় না উহারা। অবিবাহিত ছেলেমেয়েতে যেখানে সেখানে যখন তখন একসঙ্গে এত ঘোরাঘুরি বরদাস্ত করিতে পারে না প্রকাশ।

তাহারই বোন—তাহাদের পরিবারের মেয়ে, সেও দেশপ্রথা মানিবে না? অসহনীয় হইয়া উঠে পদ্মার আচরণ!

পদ্মা লক্ষ্য করে দাদার মনোভাব। অথচ এই দাদার মুখেই এক দিন কত প্রগতির কথা শুনিয়াছে সে। জেল খাটিয়াছে—স্বদেশী করিয়াছে, আর আজ তাহার এ পরিবর্তন! মানুষের মতামতের স্বাধীনতায়ও আস্থা রাখিতে চায় না। অবাক হয় পদ্মা। কিন্তু আরও বে-পরোয়া হইয়া উঠে সে।

পদ্মা বিকাল বেলা একটা মিটিং-এ যাইবে। যাওয়ার আগে প্রকাশকে জিজ্ঞাসা করে, "চা চাই কি?"

প্রকাশ গম্ভীর হইয়া উত্তর দেয়—"দরকার নেই।"

তাকাইয়া দেখে সে একটু বোনের দিকে, "কেন, তুই আবার বের হচ্ছিস নাকি ?"

"একটা মিটিং আছে। চটকলে ষ্ট্রাইক চলছে—তার সমর্থনে।"

একেবারে স্পষ্ট মন্তব্য—এতটুকু লুকোচুরি নাই। মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে প্রকাশ।

"তা' সেখানে তোর যাওয়ার প্রয়োজন কি ?"

"অন্যায়কেত কোনোদিন মেনে নিতে শিখিনি—তাই যাওয়া প্রয়োজন।" বিরক্তিভরা কণ্ঠে উত্তর দেয় পদ্মা। সে বাহির হইয়া যায়।

সভা শেষ হইলে রাত্রিতে বাড়ী ফেরে পদ্মা। অরুণাভও সঙ্গে আসে। শুরুতেই যেরকম বে-পরোয়া হইয়া উঠিয়াছে পদ্মা—একটু ভয়-ভয়ও করে অরুণাভের; কোথায় কি করিয়া বসে। পথটাও ভাল না। সভা শেষ হইলে পদ্মাকে ডাকিয়া বলে, "দাঁড়াও পদ্মা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। শশাংকদার সঙ্গে একটু কাজ আছে।"

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ দিয়া হাঁটিয়া চলে দুই জনে নিঃশব্দে। স্বভাবতই মৌনভাষী পদ্মা। যাচিয়া কথা বলিতে ভালবাসে না সে।

ম্লান জ্যোৎস্না। পিচঢালা রাস্তার গায়ে পাশাপাশি দুইটি স্ত্রী-পুরুষের কাল ছায়া পড়ে। দুই জনেরই মনে একই প্রশ্ন উঁকি মারিয়া যায়। পদ্মা মনে মনে ভাবে, তাহারই সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে চলিয়াছে সে—অথচ সে হয়তো তাহার মনের কোন খবরই জানে না।

অরুণাভ ভাবে, আজ এত কাছে পদ্মা, আর দুদিন বাদেই চিরদিনের জন্য পর হইয়া যাইবে সে।

পদ্মাদের বাড়ী আসিয়া পড়ে। অরুণাভের সঙ্গে পদ্মাকে রাত করিয়া ফিরিতে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠে প্রকাশ মনে মনে। উদ্ধত উগ্র ভঙ্গিতে

জিজ্ঞাসা করে সে অরুণাভকে, "অরুণ, তোমার সঙ্গে পদ্মার কি সম্পর্ক, জানতে চাই।" একটু থামিয়া আরও ক্রূর ভঙ্গিতে বলে সে "মনে রেখো, এটা ভারতবর্ষ—রাশিয়া নয়।"

স্তম্ভিত হইয়া যায় অরুণাভ। এ অভিযোগ তাহার নিকট এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত! মুহূর্তের জন্য তাহার ভিতরটা ক্রোধে ও অপমানে কাঁপিয়া উঠে। এত রূঢ় অভিযোগ আজ পর্য্যন্ত জীবনে কেহ দিতে পারে নাই তাহার নামে। কিন্তু মুহূর্তের মাঝে সংযত করে সে নিজেকে পদ্মার সম্মানের জন্য।

পদ্মা যেন লজ্জায় মিশিয়া যায়। অরুণাভের মত মানুষের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ! সহ্য করিতে পারে না পদ্মা কোনদিনই নির্দ্দোষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার। মুহূর্তে কি চিন্তা করিয়া সেই উত্তর দেয় ভ্রাতাকে, ধীর সংযত গর্বিত স্বরে, "আমার সঙ্গে অরুণাভবাবুর কি সম্পর্ক জানতে হলে, সে প্রশ্ন একা তাঁকে করলে তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া মুস্কিল।"

তারপর একটু থামিয়া আরও স্পষ্ট, স্পর্ধার স্বরে বলে সে, "তাছাড়া, আজ থেকে জেনে রেখো, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি অন্তর দিয়েই।"

প্রকাশ ও অরুণাভ দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া যায় আকস্মিক বিহ্বলতায়। কি স্পষ্ট জবাব!

এতটুকু দ্বিধা নাই, জড়তা নাই—পরিষ্কার নাটকীয় উত্তর। অরুণাভ তাকাইয়া দেখে—পদ্মার চোখে অগ্নিকণা ঝরিয়া পড়িতেছে। এই কোমল নরম মেয়ের ভিতরেও যে এ মূর্তি লুকাইয়া থাকিতে পারে, এ যেন কল্পনাতীত তাহার কাছে।

প্রকাশ চুপ হইয়া যায়। হয়তো আরও কিছু অপ্রিয় স্পষ্ট ইঙ্গিত জানাইয়া বসিবে ঐ উদ্ধত মেয়ে এই মুহূর্তে। একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে।

অরুণাভ স্থির দৃষ্টিতে তাকায় আবার পদ্মার দিকে। চোখে চোখ মিলিয়া যায়। স্থির, অচঞ্চল আয়ত দৃষ্টি। অকথিত বহু কথার ভিড় সে দৃষ্টিতে।

প্রকাশ আর একটাও কথা বলে না পদ্মার সঙ্গে। নিঃশব্দে বাহির হইয়া যায়। তাহার মাথাটা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, মনে হয়। তাহারই বোন শেষে অপমান করিল তাহাকে!

পদ্মাদের সংসারে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার বাবার হঠাৎ-মৃত্যুতে। অফিসে কাজ করিতে করিতে হার্ট ফেল করে। একদিকে শোকে মুহ্যমান সংসার, অন্যদিকে আর্থিক অসঙ্গতিতে অসহায় হইয়া পড়ে নগেন্দ্রশেখর। শিক্ষকতার এ সামান্য আয়ের উপর নির্ভরশীল সম্পূর্ণ একটি পরিবার। সবার উপরে বিবাহ-যোগ্যা পদ্মা। পদ্মাও বোঝে তাহা।

পিতার সঙ্গে অন্তরের স্নেহের সম্পর্ক অনুভব করে নাই কোনদিন তবু আজ তাহার অভাবে ভাঙিয়া পড়ে সে।

অরুণাভ ও বিপাশা আসে সংবাদ শুনিয়া। অরুণাভ স্নেহশীতল হাত রাখে পদ্মার মাথায়। গভীর বেদনায় পদ্মা তাহার হাতখানা ধরে শক্ত করিয়া। এই নিবিড় স্পর্শে অরুণাভ অনুভব করে পদ্মার মনের ঐকান্তিকতা। এ স্পর্শের অর্থ উপলব্ধি করে সে অন্তরে।

পদ্মা আর সহিতে পারিতেছে না নিজেকে লইয়া এ প্রতারণা। ঘরে বসিয়া মনের অসহনীয়তাকে রূপ দেয় এক সম্বোধনহীন লিপিকায়।

"তোমার সাথে আমার পরিচয় হ'য়েছিল যে মুহূর্তে, সে ব্রাহ্ম মুহূর্তকে আমার অন্তরের প্রণাম জানাই। তোমার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা' থাকবে আমার চিরদিনের ঝুলিতে তোলা।

"কিন্তু বন্ধু, তুমি তোমার পা দিয়েছো পশ্চিম-সাগরের ডিঙ্গিতে, আমি দিয়েছি পূবের, তোমার ডিঙ্গির পাল খাটান পশ্চিমের হাওয়ায়, আমার বুঝি পূবের; এমন সময় আমি যদি বলি—এসো বন্ধু, তুমি আমি পাশাপাশি কাব্য পড়ি'—ব্যঙ্গ করবে প্রতিধ্বনি। কিন্তু আমার মন যে চায় বিপুল ব্যবধানের মাঝেও কাছে-পাওয়ার মাধুরী। এমন অনেক কিছুই থাকে আমাদের মনের জমা-খাতায় যার হিসেব দিতে আমরা পারি না। চেষ্টা করলেও পারি না। মন জিনিষটা এমন এক রাসায়নিক সংমিশ্রণ—যার বিশ্লেষণ করা বড় শক্ত। প্রতি মুহূর্তেই তার রূপ ভাঙছে, গড়ছে। তাই তার হিসেব দিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

"আজ সকালে যা লিখে গেলাম, সাঁঝের তারা জ্বলতে না জ্বলতেই সে লেখাকে ব্যঙ্গ করবে লেখনী। সকালের খাতায় যা ছিল লেখা, রাত্রির লেখনী—তা'কেই করবে পরিহাস। তাইত আমি এত সংকুচিত, তাইত আমি বোঝাতে পারছি না আমার এ অন্তর্দ্বন্দ্ব।"

কিন্তু অরুণাভ বুঝিয়াছে, সে লক্ষ্য করিয়াছে, পদ্মার চোখের এ ম্লানিমা। পদ্মা, তাহাকে ভালবাসিতেছে, উহা আর অস্পষ্ট নয় আজ তাহার চোখে। বহু চিন্তা করিয়া বলে সে বিপাশাকে, "ভাবছি, শশাংকদার কাছেই বলি সব। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে গ্রেপ্তার হ'য়েওত যেতে পারি। তাই ভাবি—"

বিপাশা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলে, "পদ্মা কি জানে না তা'। সব দুঃখ বরণ করবার শক্তি নিয়েই ভালবাসছে সে তোমাকে। কাজেই সে উদারতাটুকু না দেখালেও চলবে তোমার।"

অরুণাভ একটু চিন্তার সুরে বলে "ওর বাড়ীর আত্মীয়েরা যদি মত না দেন ও পারবে কি সে দুঃখ সইতে?"

বিপাশা উত্তর দেয়, "দু' নৌকোয়ত আর পা দিয়ে চলতে পারবে না। একটা নৌকো ছাড়তেই হ'বে।"

অরুণাভ জানায় শশাংকশেখরকে, সে পদ্মাকে বিবাহ করিতে চায়। শশাংক খুশি হয় এ সংবাদে। পদ্মা তাহার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, তাহারই স্নেহাস্পদ অরুণাভের পত্নী হইবে। আনন্দে ভরিয়া উঠে তাহার মন। জেলখানায় সবচাইতে ছোট অরুণাভও আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে, অন্তরের গোপনস্তরে ভালবাসিতেছে তাহার ভাবী বধূকে। ভালই লাগে। জীবনে কোনও নারীর সামীপ্য উপলব্ধি করে নাই শশাংক অন্তরে। জানে না সে নারীর এ হৃদয়াবেগ কি জিনিস। তবু স্বীকার করে অন্তর হইতেই হৃদয়ের আকর্ষণকে। তাই আজ মুক্তপ্রাণেই গ্রহণ করে অরুণাভের এ প্রেমের সংবাদ।

ছোট ছিল যারা, আজ বড় হইয়া উঠিতেছে তাহারা। তাহারা আজ ভালবাসিবে, বিবাহ করিবে, সংসার করিবে, আবার নূতনের রথচক্র ঘুরিয়া' চলিবে সম্মুখে। এইত জীবন—সীমাবদ্ধ জীবনের রথচক্র ছুটিয়া চলিয়াছে অসীমের দিকে। চিরবৈচিত্র্যময় অমর-শিশুরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে সম্মুখে, সম্মুখে—আরও সম্মুখে।

প্রসন্নচিত্তেই আশীর্বাদ করে উহাদের। কিন্তু মনে মনে চিন্তিতও হয়—এ অসবর্ণ বিবাহে তাহার অগ্রজ মত দিবেন কিনা সন্দেহ। শশাংকশেখর ঠিক করে, সে নিজেই বাড়ী গিয়া জানাইবে এ সংবাদ।

এ সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায় বাড়ীর সকলে। পদ্মার মত মেয়েও আধুনিকতার উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না। ব্যথিত হয় সবাই। পদ্মার মা কাঁদিয়া আকুল হয়। শশাংক বুঝায় "অন্যায় ত কিছু করছে না। এত দুঃখ পাচ্ছ কেন।"

সুহাসিনী আপত্তি তোলে, "ছেলে উপার্জনক্ষম না। তাছাড়া বাড়ীর সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে না, এ স্থলে মেয়ে বিয়ে দিলেত মেয়েকেই চাকরি করে খেতে হ'বে।" শশাংক হাসিয়া বলে, "তা'তেই বা দোষ কি।"

সুহাসিনী গম্ভীর হইয়া বলে "আমরাত ওকে চাকরি করার জন্য লেখাপড়া শেখাইনি।"

শশাংক উত্তর দেয়, "স্বামীর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল না হ'য়ে থাকার ক্ষমতা থাকাটাত ভালই—বরং তা'তে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কতে জটিলতা আসার সম্ভাবনা কম থাকে। আর অরুণাভও ত অনুপযুক্ত ছেলে নয়। দরকার যখন হ'বে, সেও নিশ্চয়ই উপার্জন করবে।"

সুহাসিনী তবু অভিযোগ জানায় দেবরকে মেয়েকে কেন এতটা প্রশ্রয় দিয়াছে সে, যাহাতে তাহাদের মত সম্ভ্রান্ত পরিবারে এত বড় কলংক দিল সে।

শশাংকশেখর বুঝায়, "পদ্মা যে পরিবারে বড় হ'য়েছে—সে পরিবারের মেয়ের পক্ষে জাতিভেদকে অমান্য করাটাও আর অগৌরবের নয়। কাজেই এতে কলংকের কি হ'ল।"

নগেন্দ্রশেখর শুনিয়া আহত হয়—তাহার পদ্মার বিবাহও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেই হইবে!

শশাংক জানায় ভ্রাতাকে, "আমি আমার অন্তর দিয়েই বিশ্বাস করি, এর চাইতে যোগ্য ছেলে হ'তে পারে না—আমিত চিনি অরুণাভকে। একসাথে, একঘরে কাটিয়েছি জেলখানায় বছরের পর বছর। তার স্বভাব আর চরিত্রের দৃঢ়তায় সত্যি মুগ্ধ হ'য়েছি আমি।"

নগেন্দ্রশেখরের কাছে শশাংকর কথার মূল্য অনেক। রাজী হয় সে। তবু মনের ভিতরে কিসের এক কাঁটা বিঁধিতে থাকে অনুক্ষণ।

বোঝে সে, উপায় নাই—দেশের আবহাওয়া বদলাইয়া যাইতেছে। উহা আর স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

ছেলেটি সাম্যবাদী—সাম্যবাদই তাহার জীবনের একমাত্র আদর্শ। নগেন্দ্রশেখর বলে, "বড় কঠিন পথ বেছে নিল পদ্মা। সামনে দারুণ দিন আসছে—সব সহ্য করতে পারবেত।"

শশাংকশেখর সগর্ব-মৃদু হাসি দিয়া বলে, "এ পরিবারের মেয়ে হ'য়েও সে পারবে না এ কঠিন জীবনের গৌরব বহন করতে?"

কুসুমলতার জীবনের বড় আদর্শ একনিষ্ঠ প্রেম। একবার যখন উহারা উভয়কে ভালবাসিয়াছে—তখন আর অন্য পাত্রে কন্যাদানের প্রশ্নই উঠিতে পারে না তাহার মতে।

কিন্তু সব চাইতে অসুবিধা হয় প্রকাশকে লইয়া।—সে স্পষ্ট জানাইয়া দেয় বাড়ীতে, এ বিবাহে যোগ দিলে তাহার সঙ্গে তাহার পরিবারের চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে।

প্রকাশের উপরই সংসারের একমাত্র নির্ভর।

প্রকাশ সম্প্রতি একটা যুদ্ধের কন্‌ট্রাক্টরী পাইয়াছে আসামের এক ছোট্ট শহরে। ভবিষ্যতে আশা প্রচুর। আয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মতামতের একটা বিশিষ্ট স্থান দেখা দিয়াছে সংসারে। তাছাড়া পদ্মার অগ্রজ সেই। নগেন্দ্রশেখর বার্দ্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা উপনিষদ আর ধ্যানস্তুতি লইয়াই তাহার সমস্ত চিন্তাধারা ব্যাপৃত। আর আছে স্কুলের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা, গভর্ণিং বডির মিটিং, শিক্ষক নির্বাচন। সংসারের প্রতি একটা নিস্পৃহতার ভাব জমিয়া গিয়াছে তাহার।

সুকল্যাণ ও শশাংকশেখর পূর্ণমাত্রায় ব্যাপৃত এখন রাজনীতি লইয়া। তাই প্রকাশই এখন তাহার স্বর্গগত পিতার স্থানটি দখল

করিয়াছে বৈষয়িক ব্যাপারে। পদ্মার মাও তাই ছেলের অমতে এ বিবাহে যোগ দিতে সাহসী হয় না, তাছাড়া ভিন্নজাতিতে কন্যাদানে ঘোর আপত্তি তাহার।

শশাংকশেখর জানায় অরুণাভকে উহাদের বিবাহটা তাড়াতাড়িই হইয়া যাক। না হইলে অসুবিধায় পড়িবে পদ্মা। পদ্মার প্রতি প্রকাশের ব্যবহার পীড়াদায়ক।

অরুণাভও আর সহিতে পারে না পদ্মার এ বিষণ্ণ দৃষ্টি। পদ্মাকে পাইতে চায় সেও একান্ত করিয়া।

বাড়ীর কাহাকেও না জানাইয়া বিবাহ হইয়া যায় পদ্মার—রেজিষ্ট্রেশন বিবাহ। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে অঙ্গীকার পত্রে নাম সই করে—পদ্মা কম্পিত হস্তে। তাহার মনে যেন ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। প্রেম ও নীতির সংঘাত। প্রিয়-পরিজনদের মনে ব্যথা দিয়া গ্রহণ করিতেছে সে জীবনের প্রিয়তমকে। আজন্ম জ্যেঠামণির আদর্শে প্রতিপালিত হইয়া, সে-ই পরিহাস করিল তাঁহার আদর্শকে জীবনের মধু-লগ্নে। সলজ্জ কণ্ঠে উচ্চারণ করে বধূ—আই টেক দী এ্যাজ মাই লিগ্যাল হাজব্যাণ্ড।

বিবাহ-বাসর নাই—যজ্ঞাগ্নি নাই, উৎসব-মুখরিত প্রাঙ্গন নাই, উলুধ্বনি-নিনাদিত স্ত্রীআচার নাই—কাগজে কলমে স্বাক্ষরিত স্বামী-স্ত্রী তাহারা আজ হইতে।

এ মুহূর্ত হইতে নূতন পরিচয় শুরু হইল পদ্মার জীবনে। পরিণীতা বধূ সে তাহারই প্রিয়তমের। এতবড় মধুর পরিবর্তন আসিল জীবনে, অথচ বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ নাই এ মাঙ্গলিক উৎসবের!

নবপরিণীত-স্বামীর মধুর হাতে সিঁথিতে সিন্দুর পরাইয়া দিবার কথা ছিল আজ শুভলগ্নে পবিত্র অগ্নিসাক্ষীর সম্মুখে। ঐ অক্ষয় সিন্দুরটুকুইত বিবাহিত কন্যার বড় আশীর্বাদ—জীবনের বড় তপস্যা।

বিপাশার ভাল লাগে এ সহজ, সুন্দর অনাড়ম্বর বিবাহ-পদ্ধতি। হিন্দু বিবাহের বেশীর ভাগ অংশই বড় অভিনয়-অভিনয় মনে হয় তাহার চোখে। টোপর-পরা বর-কনেকে দেখিলে হাসিই পায় তাহার। বিপাশার চোখে, কুসংস্কার ছাড়া কোন সৌন্দর্যই ধরা পড়ে না সিঁথির সিন্দূরে।

অরুণাভ লক্ষ্য করে পদ্মার মুখের ম্লান ছায়া। সে তাহার মনের অবস্থাটা বোঝে সকল হৃদয় দিয়াই। কোমল-মনের পক্ষে এ আঘাত উপেক্ষণীয় নয়। আত্মীয়-পরিজন, প্রিয়জনদের মনে ব্যথা দিয়া জীবনের এ বিশেষ দিনটিকে মন হইতে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না পদ্মা, বোঝে সেও।

ভোরের গাড়ীতে সুকল্যাণ আসিয়া পৌছায়।

সে না আসিয়া পারে না তাহার আদরের বোনটির জীবনের এ বিশেষ তিথিতে।

অরুণাভের সঙ্গে তাহার মতের ও আদর্শের পার্থক্য বিরাট। হয়তো জীবনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে পদ্মা। একটা বেদনা-মিশ্রিত অনুভূতির মৃদু পীড়ন অনুভব করে সে মনের গভীরে। তবু উদার মনেই প্রসন্ন হাসি দিয়া উহাদের কল্যাণ কামনা করে সে। সুকল্যাণ পদ্মাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া বলে, "কি রে? মাথার সিন্দুর কই? আমি ভাবতে ভাবতে এসেছি—গিয়েত দেখবো সিন্দুর-লেপা, মাথায় মস্ত-ঘোমটা-টানা এক লাজুক বৌ।"

পদ্মা হাসে—বিষণ্ণ, ম্লান হাসি। প্রিয় ভ্রাতার আন্তরিক স্পর্শে পদ্মার চোখ ভিজিয়া উঠিতে চায় ক্ষণে ক্ষণে। সুকল্যাণের দৃষ্টি এড়ায় না। সে অরুণাভের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলে, "ভাবছো, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারকে মাত্র পাঁচটি সিকি দিয়েই আমাদের বোনকে ঘরে তুলে নেবে। সেটি হ'চ্ছে না। দস্তুরমত—পাল্‌কি চাই, সানাই চাই,—সামিয়ানা, ঝাড়লণ্ঠন চাই,—বৌ-ছত্র-দেওয়া আঙিনা চাই—তবেত আমাদের বোন তার শ্বশুর বাড়ীতে প্রবেশ করবে।"

অরুণাভ হাসে পদ্মার দিকে তাকাইয়া।

সুকল্যাণ তাহার সুটকেশ হইতে কি বাহির করিয়া পদ্মার হাতে দিয়া বলে, "মায়ের আশীর্বাদ।" একটি কাঠের সিন্দুরের কৌটা, দুইগাছা লাল শাঁখা ও একজোড়া সোনার বালা আর ধানদুর্বা।

পদ্মা আবেগভরা হাতে গ্রহণ করে তাহার জ্যেঠিমার স্নেহাশীর্বাদ। পদ্মার যেন চোখে জল আসিতে চায় কি এক অভিমানী অনুভূতির শিহরণে। পদ্মা জানে জ্যেঠিমার দরিদ্র সংসারে ঐ সোনার বালাজোড়াই একমাত্র সোনার জিনিষ অবশিষ্ট ছিল—সুকল্যাণের বৌকে আশীর্বাদ করার জন্য সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল সে এ শেষসম্বলটুকু। সেই শেষ সম্বলটুকুও পাঠাইয়া দিয়াছে তাহার প্রাণভরা আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ। নিরাভরণা পদ্মা শ্বশুরগৃহে যাইবে এ যেন পদ্মার জ্যেঠিমা ভাবিতেও পারে না।

সুকল্যাণ একখানি শতরঞ্চি খুঁজিয়া আনিয়া পাতে ঘরের মাঝে। তারপর অরুণাভকে ডাকিয়া বলে "বস, শান্ত ছেলেটির মত। যা বলবো, তাই করতে হ'বে। একটি রত্ন লাভ হ'চ্ছে—তার জন্য একটুও কষ্ট করবে না—তা ত হ'তে পারে না। বিপাশার

দিকে তাকাইয়া বলে, "কমরেডদের বাড়ী যখন, শাঁখত নিশ্চয়ই নেই। তবে বাঙ্গালী মেয়ে যখন—উলু দিতে নিশ্চয়ই জানেন।" তারপর নিজের অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরীয় খুলিয়া সিন্দুর ভরিয়া দেয় তাতে। অরুণাভ মৃদু হাসিয়া স্নেহমাখা হাতে সিন্দুর পরাইয়া দেয় পদ্মার সিঁথিতে।

পদ্মা প্রণাম করে শশাংকশেখর ও সুকল্যাণকে।

সুকল্যাণ অরুণাভকে দেখাইয়া হাসিয়া বলে, "আরও একজন গুরুজন বাকি রইল যে। আমাদের শাস্ত্র মতে স্বামী পূজনীয় ব্যক্তি। কমরেড নয়, কিন্তু।"

অরুণাভ হাসে। সুকল্যাণ তাহার হাতটা চাপিয়া ধরে প্রীতি-মাখা প্রগাঢ় স্পর্শে। পদ্মার মনের বিষণ্ণতা কাটিয়া যায় ছোড়দার প্রাণভরা আন্তরিকতায়।

তাহার চোখে ফুটিয়া উঠে মধুর দীপ্তি। বহুদিনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে—নির্মল প্রসন্ন রৌদ্রের আশীর্বাদ সুনীল আকাশে।

বিপাশা চা ও মিষ্টি লইয়া আসে।

সুকল্যাণ খুশি হইয়া বলে, "এতক্ষণে, কুটুমবাড়ীর পরিচয় মিললো। এই জন্যইত বোনদের শ্বশুর বাড়ীর এত মূল্য আমাদের কাছে।"

হাসে বিপাশা। সারাটা দিন একটা খুশির আমেজে কাটিয়া যায়।

রাত্রির গাড়ীতেই আবার চলিয়া যায় সুকল্যাণ—বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে।

অরুণাভের ঠাকুরমা সরকার মশাইকে দিয়া পত্র লিখাইয়া পাঠাইয়াছে—বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া—বৌ-কে লইয়া যেন একবার বাড়ী আসে সে।

অরুণাভ ঘরছাড়া দীর্ঘকাল। জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়াছে তাহার স্বদেশীর গোপন আস্তানায় আর জেলখানায়। তাই বাড়ীর সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে নাই। বাড়ীতে আছেই বা কে!

অরুণাভের পিতা বিদেশেই কাটাইয়াছে চিরজীবন; বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নাই তাহারও।

বাড়ীতে একমাত্র প্রাণী তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমা। পাঁচ শরিকের দীর্ঘ এলাকা। পর পর পাঁচটা বাড়ী। অরুণাভদের তিন আনির অংশ। তাহার পর দুই আনি দশগণ্ডা ও এক আনি ছয় গণ্ডার মালিকেরা বিদেশেই থাকে দুই পুরুষ যাবৎ। সেখানেই মস্ত ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে তাহারা। শেওলা আর বন্য গুল্মে ঢাকা একটা বহুজীর্ণ সাবেক ধরনের দালান, আর আধভাঙা কয়েকটা টিনের ঘর।

তারপর পাঁচ আনি ও চারি-আনির পর পর দুইটা এলাকা। পাঁচ আনির জাঁকজমক আজও স্মরণ করাইয়া দেয় গ্রামবাসীকে তাহাদের মনিবের অতীত সমৃদ্ধির কথা। রাধা গোবিন্দের পূজার আয়োজন, ভোগ রাঁধা, সন্ধ্যারতি, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব—মধুর বৎসর ঘুরিয়া চলিয়াছে মন্থর গতিতে।

চুনকাম করা মাটির ঘর, সারি সারি টিনের চৌচালা, সাবেক আমলের পুরু দেওয়ালের দালান, হালফ্যাসানের গাড়ী-বারান্দা-সংযুক্ত ইংলিস টালির বাংলোবাড়ী—সর্বত্রই একটা আয়েশী আরামের অলস ভাব। এ নিশ্চল জীবন-যাত্রার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারে না অরুণাভ নিজেকে। তাহার জীবনাদর্শের সঙ্গেও এ জমিদারী বনিয়াদের মিল হয় না। তাই তাহার আত্মীয় পরিজন, জ্ঞাতি ভ্রাতাদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই তাহার। বাড়ীতে যে

কদিন থাকেও বা কদাচিৎ, স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায় কৃষকদের বাড়ী-বাড়ী।

অরুণাভের পিতার সম্পত্তির অংশের প্রায় সবই নষ্ট হইয়াছে—যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক মিটাইতে। তাহার পিতা এখনও দেশের বাড়ীতে থাকে না—অরুণাভের ঠাকুরমা একলা একটি মানুষ আছে অন্দরমহল আগলাইয়া, আর বাহির বাড়ীতে আছে বৃদ্ধ সরকার মশাই। সংসারে নাই কেহই, তবু অন্যান্য শরিকের মত এ শরিকেও কামলারা আসে; ভোর হইতেই বাগানের কাজে ভেড়ে—মাটি কোপায়—বীজ বোনে, চারা লাগায়—গোয়াল হইতে গরু বাছুর বাহির করে আবার সন্ধ্যায় গোয়ালে ঢুকায়। নম-বুড়ি আসিয়া উঠানে গোবর ছড়া দেয়, উঠান ঝাড় দেয়।

বুড়াকর্ত্রী একটা পুরু চশমা চোখে দিয়া রোদে বসিয়া পূজার দুর্বা তোলে; স্বপ্রিয় আসিয়া সংবাদ দেয়, "ঠাকুরমা, তোমার নাতি যে বিয়ে করেছে সে খবর রাখ।"

বৃদ্ধা আনন্দে, বিস্ময়ে, অভিমানে বিহ্বল হইয়া পড়ে, "সত্যি নাকি। আমাগো অরুণ বিয়া করছে কস কি! কই থেইকা শুনলি এখবর?"

স্বপ্রিয় হাসিয়া বলে, "এবার মিষ্টি খাওয়াও—তাইত তাড়াতাড়ি আসলাম।"

"তাত খাওয়ানই লাগবো। এর থেইকা সুখের খবর আর আমার নাই। আমার অরুণ এতদিনে বিয়া করছে—এইবার আমার ঘরে বাতি দিবার লোক আসচে। আজ আমার এত বড় আনন্দের দিনে এই বাড়ী লোকে লোকারণ্য হওয়ার কথা।" বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, "সবই উল্টা-পাল্টা হইয়া গেল। অমন লক্ষ্মীমন্ত বৌ

আমার—"বৃদ্ধা আর বলিতে পারে না। লোল গণ্ডস্থল বাহিয়া উষ্ণ অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। বৃদ্ধা অশ্রু সংবরণ করিয়া বলে, "আর মাইয়াটারই বা কি মতি। এক দিনের জন্যও বাড়ী আসবো না। সেও নাকি বিয়ে পাশ দিছে?"

সুপ্রিয় সায় দেয়। "সেওত স্বদেশী করে।"

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, "কি জানে কি যুগ যে পড়ছে। এখন মরতে পারলে বাঁচতাম। তা' কি আর এ অদৃষ্টে আছে।"

সুপ্রিয় বলে, "এখনই মরবা কি? আরও কত কিছু শিখার বাকি এখনও। রাজায় প্রজায় সব এক হ'য়ে যাবে। নম, চামার, মুচি, ভূইমালী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ সকলে এক বৈঠকে বসে খাবে। আর ঐ যে তোমার নুড়ি পূজো ওসব—আর চলবে না।"

ঘরের দাই নিস্তারিণী আসিয়া যোগ দেয়, "শুনতাছি হিটলার যদি জেতে—তবে নাকি বিধবাগোও টেবিলে বইস্যা মাছ মাংস খাওন লাগবো।"

বৃদ্ধা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, "কি জানি কি আছে কপালে। এমন কপাল না হইলে আর এত আয়ু হইব কেন। এখন ভগবানের কাছে একমাত্র প্রার্থনা—এই ভিটাটুকুতে যেন প্রাণটা ছাড়তে পারি। সব কিছুর মায়াইত ছাড়ছি—শুধু এই ভিটার মায়াটুকু ছাড়তে পারি নাই।

বিপাশা শিশুশিক্ষার ট্রেনিং-এ আছে মাদ্রাজে।

বড় খালি-খালি লাগে বাড়ীতে পদ্মার। অরুণাভ বাড়ীতে থাকে খুবই কম। একটা প্রতীক্ষমাণ মন লইয়া ঘর গুছায় পদ্মা; অরুণাভের টেবিলের কাগজপত্র গুছাইয়া রাখে। মাঝে মাঝে একটু

পাতা উল্টাইয়া দেখে এলোমেলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি—সদ্য লিথোকরা ইস্তাহার—জনযুদ্ধ, পিপলস-ওয়ার। ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতির তীব্র সমালোচনা পাতায় পাতায়, পঙতিতে পঙতিতে। ফ্যাসিষ্ট জাপানকে ঘরের দুয়ারে ডাকিয়া আনিতেছে নাকি তাহারা, খাল কাটিয়া কুমীর আনার মত।

মনটা একটু বিষণ্ণ হইয়া যায় পদ্মার। এই ফরোয়ার্ড ব্লকেরইত ছেলে সুকল্যাণ। অনুপমও সমর্থন করে উহাদেরই। কাহাদের নির্দেশ যে নির্ভুল বুঝিয়া ওঠে না পদ্মা।

সুকল্যাণকে জানে সে শিশুবয়স হইতেই, দেশের জন্যই উৎসর্গ করা জীবন তাহার। আবার অরুণাভ—সেওত দেশের জন্যই, জনগণের কল্যাণের জন্য প্রাণতুচ্ছ করিয়া খাটিতেছে—দিবা-রাত্রি।

প্রসাদওত যোগ দিয়াছে কম্যুনিষ্টদের দলেই। সেই ছোট প্রসাদের ভিতরেও দেখা দিয়াছে আজ ঐ একই মাতাল-করা কর্ম্মনেশা। রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার কচি মুখখানি—একটা রুক্ষতার উদ্‌ভ্রান্ত ছায়া দেখা গিয়াছে দেহের কাঠিন্যে।

কি একটা আধ-বোঝা সংশয়ের রেখা পড়ে পদ্মার মনে।

যেটুকু সময় বাড়ী থাকে অরুণাভ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে পদ্মাকে।

পদ্মা অনুক্ষণ অনুভব করে এ স্নিগ্ধ মাধুরীর মাদকতা। কালো সেড দেওয়া বাতির বলয়াকার আলোতে বসিয়া সপ্তাহের কর্ম্মসূচী লেখে অরুণাভ। পুরুষদেহের বলিষ্ঠ যৌবনশ্রী—প্রশান্ত বক্ষে, অবিন্যস্ত ঘনচুলে আর প্রতিজ্ঞাসুদৃঢ় উন্নত ললাটে।

প্রেমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখে পদ্মা। নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় সে—এ সুতীব্র মধুর উপস্থিতির উষ্ণতা অনুভব করে হৃদয়ের

স্পন্দন মাঝে। অরুণাভ অনুভব করে পদ্মার মনের এ প্রগাঢ়তা—সস্নেহে নরম হাতটা ধরে সে নিজের কঠিন হাতের···নিবিড় আকর্ষণে। কিন্তু কথা বলিবার অবসর নাই তাহার, অগ্নিপরীক্ষার দিন আজ সম্মুখে। দ্রুত কলম ঘুরায় অরুণাভ—ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে।

সময় নাই—দ্রুতস্পন্দন অনুভূতির তীব্রতায় হারাইয়া গিয়াছে বুঝি জীবনের মধুমাস। বহুদূরে কৃষ্ণসাগরের পারে প্রাণনাশা মরণ-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নাৎসী জার্মানীর বর্বর অভিযানে শ্মশানে পরিণত হইতেছে কত সমৃদ্ধ সোনার গ্রাম—নিশ্চিহ্ন হইতেছে শহরের পর শহর। আগুন জ্বলিতেছে পাকা ফসলভারে নুইয়া পড়া শস্যক্ষেতে, গোলাবাড়ীতে, খামারে পঞ্চায়েতের আঙ্গিনায়—গীর্জার চুড়ায়। স্মলেনস্কের দুয়ারে রণগর্জন শোনা যায়। বালক বৃদ্ধ নারী পুরুষ শেষ রক্তবিন্দু দিয়া প্রতিরোধের সংগ্রাম করিতেছে—নূতন সম্ভাবনায় ভরা ফ্যাক্টরীগুলিতে—প্রাণসজীব শিক্ষাকেন্দ্রে, নবজাত শিশুসদনে সদনে। কিশোর গেরিলা বাহিনীর গোপন অভিযানের নরম পদচিহ্ন পড়ে স্রোতবাহী নদী তটে তটে,—বরফ-ঝরা পাইন বনের আড়ালে আর শেওলায় মসৃণ উপল খণ্ডে।

পত্রিকা পড়িতে পড়িতে নিঃশ্বাসগুলি জমিয়া ওঠে। সমস্ত পৃথিবী আজ ধরিত্রীর মহাশ্বাস শুনিতেছে যেন। পাথর চাপা নিস্পন্দ মুহূর্তগুলি। এ যুদ্ধের হারজিতের উপর নির্ভর করিতেছে সমস্ত পৃথিবীর ভাগ্য।

অরুণাভ পদ্মাকে লইয়া বাড়ী আসে কয়েকদিনের জন্য। রেলষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। গ্রীষ্মের কয়মাস খাল শুকাইয়া যায়, নৌকা চলে না।

ফসল-বোনা ক্ষেতের ধার দিয়া মাটির সড়ক। গরুর খুরে খুরে ধূলা উড়ে। ধূলা-মাটির বুকে দাগ কাটিয়া একটানা মন্থর গতিতে ঘুরিয়া চলে গরুর গাড়ীর শ্লথচাকা। ভিতরে ছইয়ের তলায় আধা-শোওয়া অরুণাভ রাস্তায়-কেনা পত্রিকাটা উল্টায়। সম্মুখে ধূ ধূ করে বৈশাখের রৌদ্র-ফাটা ধূসর নগ্ন ভূমি। জমি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে, এক পসলা বৃষ্টির প্রতীক্ষায়, বীজ-বোনা উর্বর জমিগুলি। বহুদূরে দেখা যায় গ্রামের সীমানা, তালগাছের সারি।

অরুণাভ লক্ষ্য করে, পদ্মার চোখ দুইটিতে এক ঐন্দ্রজালিক আবেশ নামিয়াছে। যাদুর স্পর্শ-বুলান এ মৌন মধ্যাহ্ন-ধরিত্রীর সাথে নাড়ীর সংযোগ পদ্মার—জানে তাহা অরুণাভ।

গরুর গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে অসমান মাটির রাস্তা দিয়া। গরুর গলার ঘণ্টিগুলি বাজিতে থাকে এলোমেলো ছন্দে। আরও দুইটি গ্রামের পর অরুণাভের গ্রাম। সে উস্‌খুস্ করিতে থাকে, "মিঞা-ভাই, এখনও সাতক্ষীরাই ছাড়াইলা না? ধানখালি যাইতে যে সন্ধ্যা লাইগা যাইব, দেখতাছি। এর থেইকা হাইটা গেলেই আগে যাইতাম।"

গো-চালক শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হয়, "এমন তেজীবলদ সদরেওনি দেখছেন?"

"বলদত তেজী ঠিকই, কিন্তু পিঠের শিরদাঁড়া যে বাইকা গেল।"

গাড়োয়ান চুপ করিয়া থাকে। তাহার পাশে-বসা বছর দশে-কের একটি ছেলে বা'জান এক ছিলিম তামাক খাইয়া লয়, ছোট্ট গাড়োয়ানটি তেজী বলদগুলিকে ঠিক পথে চালায়—বাপের মুখে-শোনা শব্দ নকল করে তাহার ছোট মুখ দিয়া।

সূর্যের তেজ কমিয়া আসে। এই অঞ্চলে বীজ বোনা শেষ হয় নাই এখনও। মাথাল মাথায় দিয়া ক্ষেতে বীজ ছড়াইতে ছড়াইতে ভাগ-চাষীরা তাকাইয়া দেখে একটু বিস্মিত চোখে গরুর গাড়ীর আরোহীদের—ঘোমটা-খসা নীলশাড়ি-পরা নূতন বৌকে।

গাড়োয়ানের ছেলে গান ধরিয়াছে।—ধূসর, কর্ষিত ভূমির বুকে কচি-কণ্ঠের সেঁ বেসুরা-বাউল সুরের ঢেউ নামিয়া আসে। অদূরে একটা জলার কিনারায় হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া মাছের ঘাই পাতে দুইটি অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলে। তাহারাও দেখে অবাক-বিস্ফারিত চোখে, গরুর গাড়ীর যাত্রীদের।

পদ্মা আজ দীর্ঘ-বছর পর নিজেকে ফিরিয়া পাইয়াছে যেন নিজের ভিতরে। অরুণাভও লক্ষ্য করে তাহার ঘুমোঘুমো আঁখির এ মদিরতা।

এ মৌন বিস্তৃত ভূমি মানুষের মনকে এক উদাস-করা অনুভূতির জগতে টানিয়া লইয়া যায়—কিছুক্ষণের জন্য আত্মবিস্তৃত হয় মানুষ।

গরুর গাড়ী চলিয়াছে তাহার নিজস্ব গতিতে। ক্রোশব্যাপি ধান-বোনা ক্ষেতের শেষ প্রান্ত আসিয়া মিশিয়াছে গৃহস্থ পল্লীর সাথে। আর একটা গ্রাম ছাড়াইলেই ধানখালি গ্রামের সীমানা আরম্ভ।

সিমুল-পলাশ, জাম-কাঠাল-তেতুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরিয়া চলে গরুর গাড়ী। গাড়ীটার পাশ কাটাইয়া একটি ছেলে চলিয়াছে সাইকেলে, সুন্দর একহারা চেহারা। উল্টা বাতাসে চুলগুলি উড়িতেছে কপালের উপরে। পদ্মা একটু তাকাইয়া দেখে—অপরিচিত ছেলেটির সঙ্গে চোখে চোখ মিলিয়ে যায়। হঠাৎ খুশি হইয়া সাইকেল থামায় ছেলেটি, "অরুণদা নাকি?"

অরুণাভ উঠিয়া বসে, "আরে সুপ্রিয়, তুই বাড়ী এলি কবে?" খুশিতে অধীর হইয়া উঠে চোখ মুখ। গাড়োয়ান এই অবসরে আরেক ছিলিম তামাক খাওয়ার যোগাড় আরম্ভ করে।

সুপ্রিয় পদ্মার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া চলে, "বৌ, না কমরেড।"

পদ্মা মৃদুহাসি দিয়া অভ্যর্থনা করে, কথা বলে না। মাথার ঘোমটাটা তুলিয়া দেয় একটু। অরুণাভ হাসিয়া বলে, "আসবি নাকি ভিতরে। তোর সাইকেলটা দে—আমি তিনমিনিটে চলে যাই। যা' পিঠ কনকন করছে—সেই দুপুর থেকে এক কাতে বসে।"

সুপ্রিয় হাসিয়া বলে, "উঁহু, তা' ত নিয়ম নেই। বৌ নিয়েই চলেছো যখন, দস্তুর মত বৌকে আঁচলে বেঁধে ঢুকতে হ'বে ঘরে। আমিই বরং খবরটা দিয়ে ঠাকুরমার কাছে বখসিসটাও আদায় করে ফেলি।" সুপ্রিয় পদ্মার দিকে তাকাইয়া সপ্রশংস হাসিভরা চোখে বলে, "চলি!" সাইকেলটা দ্রুত চলিয়া যায় নিমেষে। একটা সুগন্ধ হালকা বাতাসের মত একটু মিঠা রেখা ছড়াইয়া যায় ছেলেটি। পদ্মার মনে অকারণে খুশির আমেজ লাগিয়া থাকে। অরুণাভ পরিচয় করিয়া দেয়, "আমাদের জ্ঞাতি ভাই—তাছাড়া কমরেডও একজন। এর উপরেও একটা সম্পর্ক আছে সেটা ভাষা দিয়ে বলা যায় না।"

কিন্তু পদ্মা জানিয়া ফেলিয়াছে তাহা এই কটি মুহূর্তের ভিতরেই।

হিজল গাছ-তলায় আসিয়া থামে গরুর গাড়ী। অরুণাভের ঠাকুরমা নাত-বৌকে ঘরে লইয়া যায়। মৃদু অনুযোগ জানায় নাতিকে, "সংবাদ দিয়া আসলে পাল্কী পাঠাইয়া দিতাম ষ্টেশনে। কত কষ্ট হইছে মাইয়ার আমার।"

মেয়ে-বৌতে ভরিয়া যায় তিন আনির উঠান, ঠাকুরমার নাত-বৌকে দেখতে।

সন্ধ্যার পর আবার দেখা হয় সুপ্রিয়ের সঙ্গে। হাসি-ভরা চোখে দ্বিতীয়বার সম্বর্দ্ধনা জানায় পদ্মাকে। ঠাট্টার সুরে বলে সে বুড়া-কর্ত্রীকে, "ঠাকুরমা, তোমার বাড়ীতে ত চায়ের কারবার নেই। আজকালকার পৃথ্বী, চা ছাড়া কি একবেলা চলে? অগত্যা আমার ওখানেই চলুক।" পদ্মার দিকে মিষ্টি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে সুপ্রিয়। "ছোট কর্তা কই? কাছারি ঘরে নাকি?"

ঠাকুরমা জবাব দেয়, "ছোট কর্তার আর কাছারি ঘরে যাইয়া কাজ নাই। আরেকবার ও বাড়ী আসলে আমি কইলাম, একটু দেখাশুনা কর—লেখাপড়া শিখছস, এইবার বুইঝা টুইঝা নে পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তিটুকু। এত আর কম গৌরবের না। কিন্তু ছোড়া করলকি, সব প্রজাগো লইয়া মিটিং কইরা, খাজনা দিতে না কইরা গেল। তোরাত না হয় বিদ্বান মানুষ, খাইটা খাবি, বৌও বিদ্বান, মাষ্টারনী হইব। কিন্তু এই বুড়ী-টুরী গুলির কি উপায় হইব?"

সুপ্রিয় ঠাট্টা করে, "কি আর হইব, ভালই হইব। তাড়াতাড়ি এই সমস্ত তল্পিতল্পা গুটাইয়া যাত্রা করলে, বুড়াকর্তারে তবু ধরনের আশা থাকবো। তা' না হইলে, আর কদ্দিন সে স্বর্গের অপ্সরী টপ্সরীদের ফালাইয়া তোমার জন্য পথ চাইয়া রইবো।"

ঠাকুরমা হাসিয়া ফেলে, "তোগো কালের মত কিনা?" সুপ্রিয় ঠাকুরমার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, "কি রকম ছিল, ঠাকুরমা? তোমার এই গায়ের রং দেইখাই ভুইলা গেছিল, তাই না?" আরও একটু স্বর নামাইয়া বলে সুপ্রিয়, "খুব ভালবাসত না?"

ঠাকুরমার লোল চামড়ার আড়ালে একটু সলজ্জ আভা খেলিয়া যায় পুরানো স্মৃতির অবগুণ্ঠনে। সুপ্রিয় পদ্মার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলে, "দেখছো ঠাকুরমা কেমন 'ব্লাশ' করছে।"

বৃদ্ধা লজ্জিত হাসি দিয়া বলে, "যা, ফাজিল ছোড়া।" সুপ্রিয় ঠাকুরমার হাতের সঙ্গে নিজের হাতখানা মিলাইয়া বলে, "না হয় কয় পোচ কালা হইলামই বুড়াকর্তার চাইতে; তাই কইয়া এতই ফেল্‌না ?"

অরুণাভ আসে। সুপ্রিয় তাকাইয়া বলে, "কি, ছয় আনির বাংলো থেকে বুঝি চায়ের কাজটি সেরে আসা হ'ল। আর এ শ্রীমতীটিও যে আধুনিকা সে খেয়াল আছে ?"

"কেন, দেবর লক্ষ্মণ থাকতে আর ভাবনা কি।"

"লক্ষ্মণ থেকেই বা কি লাভ। রামছাড়া যে সীতা গণ্ডীই ছাড়েন না।"

"চল তবে, আরেকবার চা পেলে মন্দ হয় না।"

চার-আনির সংলগ্ন বাড়ীটাই—দুইআনি দশগণ্ডার শরিক। বাড়ীর গৃহিণী নিঃসন্তান। তাই সুপ্রিয়কে পোষ্য লইয়াছিল। অরুণাভের বাবাই সুপ্রিয়কে আনিয়া দিয়াছিল নিঃসন্তান ভ্রাতৃবধুর হাতে। সুপ্রিয়কে জন্ম দিতেই তাহার মায়ের মৃত্যু ঘটিয়াছিল কোন বিদেশে। তারপর কি ভাবে, কি করিয়া সে আসিয়া পড়ে অরুণের পিতার রক্ষণাধীনে! সুপ্রিয় সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা হয় নাই অন্দরে কি বাহিরে—উহাতে উৎসাহও নাই কাহারও। মাতাপিতৃহীন একটি অনাথ বালক ভীরু-মমতায় আঁকড়াইয়া ধরে অরুণাভকে নিবিড় বন্ধনে। অরুণাভের তখন সবে কলেজ জীবন আরম্ভ।

একবার ছুটিতে বাড়ী আসিয়া সে আবিষ্কার করিল নূতন করিয়া দুরন্ত অশান্ত সুপ্রিয়কে। লেখাপড়ায় মন নাই, গালাগালিতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আপন-খুশিতে ঘুরিয়া বেড়ায় রৌদ্র-পোড়া মধ্যাহ্নের তপ্ত বালুপথে, কখনও জাম-লীচুর ডালে, কখনও ডিমে ভারী হাঁসের পেছনে।

অরুণাভের জ্ঞাতি-জ্যেঠীমা আপসোস করেন, "কি ছেলেই জুটিয়ে দিয়েছেন দেওর আমার।"

কিন্তু যাহাকে লইয়া মন্তব্য-ভৎর্সনা, তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই কিছুতেই। সেই দুরন্ত ছেলেও, চার বাড়ীর সকলকে বিস্ময় মানাইয়া পরাজয় স্বীকার করিল অরুণদার কাছে, কি যাদুর মোহে কেউ জানে না। সকলের চোখে চোখে ক্ষণিক আশ্চর্য-চাউনি নামিয়া আসে—যেদিন প্রথম সুপ্রিয়কে দেখে সবাই—খোলা-বই হাতে, বাঁধান ঘাটলার সিঁড়িতে বসা। তন্ময়, কৌতুকে স্থির-নিবদ্ধ, চঞ্চল ডাগর চোখ দুইটি! সুপ্রিয়ের বইয়ের নেশা ধরিল। সে নেশা থামে নাই।

সুপ্রিয় যেবার বি-এ, পাশ করিল, তাহার পালিতা-মাতা হঠাৎ মারা যায়। কোন রকম আইনগত অধিকার না থাকায়, দুই আনি দশগণ্ডার সম্পত্তি 'ছয়-গণ্ডা'র হাতে চলিয়া যায়। সবাই তাহাদের ছি ছি করিতে থাকে। রেজিষ্টারী করিয়া দত্তক লওয়ায় কতকগুলি প্রতিবন্ধকতা উঠায় তাহা আর হয় নাই। তবু সুপ্রিয়কেও দশগণ্ডার কর্ত্রী ছেলের মত দেখিতেন। পুত্রের অধিকারই দিয়াছিলেন তিনি সববিষয়ে। কিন্তু পাড়াপড়শী ও তিন বাড়ীর সবাই মাথা ঘামাইলেও এ লইয়া মাথা ঘামায় না শুধু সুপ্রিয়। সে চিরকাল যে ঘরখানিতে বাস করিত—আজও ঐ নিরালা অগোছাল ঘরখানি তাহার একমাত্র আরামপূর্ণ আস্তানা। শোনা যায় ঐ বাংলোখানি নাকি অরুণাভের পিতার অর্থেই নির্মিত হইয়াছিল। অন্দরে দালানের দুয়ারে ভারী

তালার গায়ে পুরু মরিচা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। উহা চোখেও পড়ে না তাহার।

অরুণাভ তাহার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে সর্বক্ষণের জন্য বিছান একটা চাদর বিহীন তোষকের উপর।

সুপ্রিয় চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিতে করিতে বলে, "আমি কিন্তু নাম ধরেই ডাকবো পদ্মাবতীকে।" অরুণাভ হাসিয়া বলে, "তাহ'লে পদ্মাবতীরও অধিকার থাকে তোকেও নাম ধরেই ডাকবার।" "একটুও আপত্তি নেই।"

সুপ্রিয় আজ মুরগি কিনিয়া আনিয়াছে হাট হইতে। ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসে, "কি, দিয়ে যাব নাকি এক প্লেট ?"

ঠাকুরমা তাড়া দিয়া বলে, "যা, যা পোড়ারমুখ, আমাকে ছুঁইস না তোরা। যতসব অখাদ্য-কুখাদ্য না হইলে আর রোচে না।"

সুপ্রিয় গল্প করে পদ্মার কাছে, "জান, গল্প আছে এই বাড়ীর ঘাটলায় একবার একটা শিয়ালে এক মুরগির ঠ্যাং এনে ফেলায়, পাঁচ বাড়ীর রান্নাঘরের হাড়ি-কড়াই সব মাজা হ'য়েছিল। আর আজ সে বাড়ীর ঘরেতেই মুরগির "বাদশাই পছন্" তৈয়ার হ'চ্ছে পদ্মা-বৌয়ের হাতে। কালের গতি একেই বলে, না।" সস্‌প্যানের ঢাকনাটা তুলিয়া মাংসটা নাড়িয়া দেয় পদ্মা। এক ঝলক সুস্বাদু গন্ধ বাহির হইয়া ছড়াইয়া পড়ে ঘরময়। অরুণাভ উঠিয়া আসে, "নাঃ, এমন সুস্বাদুগন্ধ ছড়ালে, আর শুয়ে থাকা চলে না।" সুপ্রিয়ও একটা প্লেট লইয়া বসিয়া পড়ে মেঝেতে।

কয়দিন ভরিয়াই এ পাড়া, ও পাড়া হইতে রায়তজনের বৌ-ঝিরা আসে খামার বাড়ীর ছোট হিস্‌সার নূতন বৌকে দেখিতে। ঘরের দাই

নিস্তারণী বাটায় করিয়া পান বাহির করিয়া দেয়। নম-বৌ হাসিয়া বলে, “আউজকা শুধ্যা পান দিয়াই বিদায় দিলেন। তারপর নাতির ঘরে পুতি আসবো যখন, সেদিন আর শুধ্যা পানে চলবো না।”

পদ্মা একটু আরক্তিম হইয়া উঠে।

বৃদ্ধা ছুতার-বৌ অনুরোধ জানায়, “ছোট কর্তা এইবার বাড়ীতে আইস্যা বসেন। আমরা আপনাগো ভিটা কামড়াইয়া পইড়া আছি, আপনারা বিদেশে থাকলে কি ভাল লাগে?”

পদ্মা লক্ষ্য করে, বাড়ীর লোকজন, কামলা, গোমস্তা সকলেরই চোখে চোখে ঐ একই অনুরোধ—তাহারা বাড়ীতে থাকুক। তাহাদের এ অন্তর-ভেজা অনুরোধ স্পর্শ করে পদ্মার মনে।

ঘরের বুড়া দাই হাসিয়া বলে, “উঠানের কাপড় রোদে দেওয়ার তারটাও আজ কেমন মানাইছে। অন্য সব বাড়ীর তারে শাড়ি ঝোলে, কেমন শোভা দেখা যায়। এই বাড়ীতে আউজকা বিশ পঁচিশ বছর পরে শাড়ি ঝুললো তারে।”

কামলারা সবাই কাজ করিতে করিতে তাকাইয়া দেখে সপ্রশংস দৃষ্টিতে নূতনবৌর হাটা-চলা। সকলেরই মনে একই প্রশ্ন—“ওনরা থাকবেন ত। না আবার চইল্যা যাইবেন বিদেশে।”

শীতলাদেবীর কুলা লইয়া আসিয়াছে পাশের গ্রাম হইতে। নিস্তারণী উঠানে একটু জল টানিয়া দেয়।

কুলাধারী বৌরা গান করে—“মাগন দাওগো পুরবাসী”। পদ্মা দেখে, আর রূপসীর কথা ভাবে। আর হয়তো কোনও দিনই যাওয়া হইবে না তাহার রূপসী গ্রামে।

পাঁচআনির বিমানের বৌ কমলা পদ্মারই সমবয়সী প্রায়, দুইটি

ছেলেমেয়ে। কমলা, তাহার শাশুড়ি সুরবালার সঙ্গে আসে পদ্মার সহিত আলাপ করিতে; কিন্তু কেমন তবু দূরত্ব বজায় রাখিয়াই আলাপ করে তাহারা। যেন কিছু সমালোচনার চোখ দিয়াই দেখিতে আসে অরুণের পাশ-করা বৌকে। পদ্মা তবু আড়ষ্ট হইয়া পড়ে তাহাদের সামনে। সহজভাবে মিশিতে পারে না।

পদ্মা, অরুণাভ ও সুপ্রিয়ের সঙ্গে বেড়াইতে যায় পূবের নদীতে—মরা নদী, প্রায় খাল বলিলেই চলে! সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরে তিনজনেই একসঙ্গে। পদ্মার চোখ পড়ে—কমলা তাহার ঘরের জানালার পর্দা ফাঁক করিয়া দেখিতেছে তাহাদেরই। মৃদু ঈর্ষা-ভরা লোভীদৃষ্টি। তবু অস্বস্তি বোধ করে পদ্মা তাহারই বয়সী একটি মেয়ের দৃষ্টির এ লুব্ধ দৃষ্টিতে। ছোট্ট মন্তব্যও কানে আসে, বাড়ীর উঠানে পা দিতে দিতে,—"বেশ আছে ওরা।"

মনটা একটু খারাপ হইয়া যায় তাহার। সে আপত্তি জানায় পরের দিন, "থাক, নাই বা গেলাম বেড়াতে। যখন যেখানে থাকতে হয়, সেখানকাব রীতি মেনেই চলা উচিৎ ত।"

সুপ্রিয় ঠাট্টার সুরে বলে, "তাহ'লেত চিরদিন কুয়োর ব্যাং হ'য়েই থাকতে হয় তোমাদের। মেয়েদের "এত স্বাধীনতা" এ পূণ্যভূমির কোথায়ও বরদাস্ত করবে কি।"

পাঁচআনির অন্দরের পুকুর পাড় দিয়াই নদীতে যাইবার সোজা-পথ। যাইতে যাইতে কানে আসে সুরবালার উত্তপ্ত কথা কিছু। বধূর উপরই ঝাড়িতেছে মনের ঝাল, বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বধূর মাথার ঘোমটা কিছু ছোট হইয়া যাওয়াই শাশুড়ির এ ক্রোধের কারণ।

'শ্বশুরে ভাশুরে আসে যায়, তাও এতটুকু লজ্জা নাই—এমন বেলাহাজ জন্মে দেখি নাই। নাক-ছাবি দেখান ঘোম্‌টা দিয়াই বা

কি, না দিয়াই বা কি? এ যে দেখি রুই কাতলার দেখাদেখি চুনাপুটিও জলের উপর গা ভাসাইয়া উঠতে চায়।”

পথে চলিতে চলিতে তিনজনেরই কানে যায় স্বরবালার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। অরুণাভের মনটা ভিজিয়া উঠে একটু কমলার জন্য—বধূ নির্যাতন, এত এদেশে নূতন কিছু নয়।

সুপ্রিয় ঠাট্টা করিয়া হালকা করিতে চায় ভারী আবহাওয়াকে।

“পদ্মাবতী, রুই কাতলাটা কে বুঝলে ত?”

পদ্মা একটু গম্ভীর হইয়া উত্তর দেয়, “বুঝেছি। এ সামান্য বুদ্ধিটুকু আছে।”

অরুণাভ সাতদিন থাকিয়াই চলিয়া যায়, হাজার অনুরোধেও তাহাকে রাখা যায় না।

‘তাহলে আমার নাতনীই থাকুক কিছুদিন।” ঠাকুরমা অভিমানে অনুরোধ জানায়।

“পদ্মা যদি থাকতে চায়, থাকুক সে। তাকেই জিজ্ঞাসা কর।” পদ্মা রাজী হয়। কেমন একটা অসহায়-দুঃখে মনটা ভিজিয়া উঠে তাহার এই বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ির জন্য। চোখের নিষ্প্রভ তারা দুইটিতে কিসের করুণতা মাখা। আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কেহই নাই পৃথিবীতে। পদ্মা ভাবে, তাহাদেরও জীবনের শেষ বেলায় কি এমন একাকীত্বের অভিশাপ নামিয়া আসিবে। বৃদ্ধা তাহার জপের মালা লইয়া তন্ময়চিত্তে এমন একাগ্রতার সহিত কাহাকে কামনা করিতেছে। মৃত্যুকেই কি? মৃত্যুর জন্যও এমন করিয়া প্রতীক্ষাকুলতা আসে মানুষের জীবনে!

“আর কিছুই চাইনা নাতনী, শুধু এই ভিটাটুকুতেই তোর শ্বশুরকে রাইখা মানে মানে যাইতে পারি, তবেই হয়।” ভারী কণ্ঠে বলে বৃদ্ধা।

তাহারই পুত্রবধূ তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন পুত্রও যদি চলিয়া যায় আগে, সে লজ্জা, সে দুঃখ যেন মাটিতেও রাখার স্থান পাইবে না। তাই মৃত্যুর জন্য এত আকুল আবেদন ভগবানের কাছে।

পদ্মা ভাবে, "মানুষের শেষ জীবনটা কত দুঃসহ।"

দিনের বেলায় তবু লোকজন আসে যায়। উঠানে লোক চলাচলের ছায়া পড়ে। কিন্তু রাত্রিতে বড় করুণ, বড় অসহায় মনে হয় এ নিঃসঙ্গ মানুষটিকে। যেন একটা অভিশপ্ত পুরীর দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়া উঠে পুরু ইটের স্যাঁতসেতে গাঁথনিগুলি। একটা সাবেক অট্টালিকাকে যেন ঐ ক্ষীণদেহ বৃদ্ধা আগলাইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে ধর্মের সিন্দুকের মত। কেমন একটা গা-ছমছম-করা অশরীরী জীবলোকের মত নিস্তব্ধতা।

ক্রমে সহজ হইয়া আসে পদ্মার কাছেও শূন্য পুরীর স্তব্ধতা। সংসারের কাজে ঢালিয়া দেয় সে নিজেকে। নিস্তারিণী আসিয়া চাবির গোছা দিয়া যায় পদ্মার হাতে, "এখন, বৌ-ঠারান আইছে— এইবার আমার ছুটি। যান 'মাটির' থেইকা 'ঝাই ধানি'র চিরামুড়ি বাইর কইরা দেন।"

পদ্মা ভাঁড়ার ঘরের তালা খুলিয়া ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি দিয়া মাচাতে উঠে। মাচার উপরে সাজান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির জালা, এক কোণায় স্তূপীকৃত তামার পূজার বাসন—কোশাকুশি ঠাট পুষ্প পাত্র। আরেক কোণায় মস্ত মস্ত পরাত, গামলা, ডেগ কড়াই।

মুহূর্তের জন্য পদ্মার মন দূর অতীতে চলিয়া যায়। পূজাপার্বণ ক্রিয়া কর্ম মুখরিত তিন-আনির গৃহপ্রাঙ্গণে। পদ্মা অবাক হইয়া ভাবে, বাড়ীর বংশধর অরুণাভ এদের অবজ্ঞার চোখে দেখিলেও

এ বাড়ীর চাকর নফর রায়তজন আজও ভুলিতে পারে নাই মনিব বাড়ীর সে অতীতের জাঁকজমক। যেন তাহাদেরই জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় অপসারিত হইয়া গিয়াছে কালের স্রোতে। তাহাদের মুখে মুখে, কথায় কথায় পদ্মা অনেক কিছুই জানিয়া ফেলিয়াছে।

নিস্তারিণী গল্প করে, "আমাগো অরুণের অন্নপ্রাশনের সময় রাত ভইরা পাঁঠা বলি হইছিল। অভাবত ছিল না কোনখানেই, অভাব শুধু খাওনের লোকের।"

বুড়ি দাই আপসোস করে, "তোমরা বাড়ীতে বসলে তোমাগো ছেলে পুলেগো কোলে কাঁখে লইয়া ঘুরুম, সে আমাগো কত আনন্দ।"

পদ্মা জানাইয়াছিল অরুণাভকে, "ওরা কত খুশি হয়। আমরা এখানে থাকলে দোষ কি?"

অরুণাভ হাসিয়া বলে, "দোষ আর কি? দিব্যি ফরাশ পাতা কাছারি ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে, চাষীদের শেষ রক্তটুকু চুষে নিয়ে—আরামে আয়াসে গা ছেড়ে দেওয়ায় দোষ আর কি?" পদ্মা উত্তর দেয়, "চাষীদের প্রতি অত্যাচার না করলেই হয়।"

"ঐ একই কথা। যে পন্থাতেই হোক, তাদের স্বার্থকে ঠকানইত।"

কিন্তু পদ্মার মন চায় গ্রামে থাকিতে—এই গ্রামের আত্মার সঙ্গে তাহার প্রাণের যে নিবিড় সুর বাঁধা তাহা যেন বারে বারে ছিঁড়িয়া যাইতে চায় শহরের কোলাহলে। পদ্মা ও অরুণাভের মনের গঠনে পার্থক্য এইখানেই।

পদ্মা অনুভব করে এ শান্ত প্রকৃতির আবেষ্টনীর মাঝে এক নিবিড় আকর্ষণ। উঠানের বুকে রৌদ্র নামে, আবার ধীরে ধীরে সে রোদ মিলাইয়া যায় সন্ধ্যার ছায়ায়। রৌদ্র-ছায়ার ঢাকা

উঠানটুকুর সঙ্গে কি মধুর মমতা-মাখা সম্পর্ক তাহার প্রাণের, সে খোঁজ জানে শুধু সে নিজে। তাই সে আজ উপলব্ধি করিতেছে তাহার দিদিশাশুড়ির চর্মঢিলা বুকের আড়ালের ব্যথার স্থানের। অরুণাভ জানে না তাহা। মানুষের দুঃখকে সমগ্রভাবেই দেখে সে। এ চিরন্তনী দুঃখের অবসান আনিতে চায় সে—সমগ্র ভাবেই প্রতিকার করিয়া। কিন্তু পদ্মার মনে ধরা দেয় মানুষের একক দুঃখের স্বরটি।

বাড়ীর পেছনের আনারস ক্ষেতটার পাশ দিয়া সরু একটা মাটির রাস্তা চলিয়া গিয়াছে গোলাবাড়ী পর্যন্ত। এই জায়গাটুকু বড় প্রিয় তাহার। গাছের ছায়ায় ছায়ায় শীতল হইয়া থাকে পথটুকু। পথের উপরে কয়েকটা আমগাছের গুঁড়ি পড়িয়া আছে। কিছু দূরে গোলা-বাড়ীতে কামলারা সব ধান মাপে, ধান তোলে, তামাক খায়—গরুর জন্য বিচালি কাটে আর গল্প করে। বড় একটা চালা আড়াল পড়ায় পদ্মাকে দেখিতে পায় না তাহারা।

আমের গুঁড়িটার উপর বসিয়া একটা কুশির লেস বোনে পদ্মা অন্য-মনস্ক মনে। সুপ্রিয় ফিরিতেছে সাইকেলে। দূর হইতে লক্ষ্য করে সে পদ্মাকে। সাইকেলটা ঘুরাইয়া আনে গোয়ালবাড়ীর সরু পথ দিয়া। "কি, কবিত্ব জাগে মনে?"

"এত দেরীতে ফিরলে? এর পর স্নান-খাওয়া হ'বে কখন?" সপ্রশ্ন-স্নেহমাখা দৃষ্টিতে তাকায় পদ্মা সুপ্রিয়ের উস্কো-খুস্কো রুক্ষ মূর্তির দিকে। সুপ্রিয় একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিয়া পড়ে আরেকটা গুঁড়ির উপর সাইকেলটা গোয়ালঘরে ঠেকাইয়া রাখিয়া। "আমার ত তবু সময় মত না হোক, অসময়ে হ'লেও স্নানাহার মিলবে।"

আর কিছু বলে না সুপ্রিয়—কিন্তু আরও কিছু রূঢ় সত্যস্পর্শ থাকে তাহার কথা বলার অস্পষ্ট বিদ্রূপে। পদ্মা একটু অস্বস্তি বোধ করে ভিতরে। মুখে বলে, "আবার বসলে যে? এত বেলায় নাইলে অসুখ করবে না?"

"তাহ'লে আর নাই বসলাম।" উঠিয়া পড়ে সুপ্রিয়। "ভেবেছিলাম একটা গান শুনবো।"

"গান শোনার এই ত সময়, আর এইত উপযুক্ত জায়গা কিনা?"

"আর লেস বোনারই ত উপযুক্ত সময় আর স্থান কিনা? ধানের দাম কত উঠেছে জান? আতংকে ত্রাস ধরে গেছে লোকের মনে।"

কথাটায় হোঁচট খায় পদ্মার মন। লজ্জিতও হয়। সুপ্রিয় সত্যি বসে না আর। সাইকেলটা ঠেলিয়া লইয়া হাঁটিয়াই চলিয়া যায়।

পদ্মা ভাবে, কি অস্থির ছেলে? একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছে তার এরই মধ্যে। সুপ্রিয়ের মধ্যে কি একটা গুণ আছে—মনে কোনও গভীর বিষণ্নরূপ টিকিতে পারে না তাহার হালকা দুষ্টুমী-ভরা ব্যবহারের কাছে। গম্ভীর কথাগুলিও সে হালকা ভাবে বলিয়া যায় অনায়াসে। মানুষের বয়স্ক জীবনেও এ শিশুসুলভ চপলতার প্রয়োজন আছে। মাঝে মাঝে তাই বয়স্ক মানুষেরাও ছেলেমানুষ হইয়া উঠে বাস্তবের গাম্ভীর্য ভুলিয়া।

পদ্মার কয়দিন যাবৎ মনটা বড় উদ্বিগ্ন হইয়া আছে। অরুণাভের এক ছত্র লেখার আশায় উদগ্রীব হইয়া থাকে মন। সুপ্রিয়ও কয়দিন বাড়ী ছিল না। কৃষক-প্রধান চরগুলিতেই তাহাকে বাস করিতে হয় বেশী। শীগ গীরই কনফারেন্স আসিতেছে।

পদ্মা দুপুরবেলা যায় সুপ্রিয়ের ঘরে। পদ্মাদের বাড়ীর অন্দরের বেড়ার গা ঘেঁষিয়া একটা ছোট আনারসের ক্ষেত। এক কোণে গৃহদেবতার ছোট একটি মন্দির—মন্দিরের গা-ঘেঁষা একটা চাঁপা গাছ—তার পরই সুপ্রিয়ের ঘর।

সুপ্রিয় সবে বিছানার উপর গা এলাইয়াছে, পদ্মা ঘরে ঢোকে।

"কি খবর? দুপুরেই পাড়া বেড়াতে বের হয়েছো? ঘরের বৌ না।"

"ঘরের বৌকে যদি পরের ছেলে পাগল করে তোলে ত, তার না বেরিয়ে উপায় কি।"

সুপ্রিয় হাসিয়া বলে, "কি লিখেছে অরুণদা। চটে গিয়েছে—যাচ্ছ না বলে?"

"তা হ'লেত খুশিই হ'তাম। এদ্দিনের ভিতর একটু কি খোঁজও নেওয়া চলে না তার—এ মানুষটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে।"

"তা ত বুঝলাম—কিন্তু সেজন্য এ ভাগ্যবানের স্মরণ নেওয়া কেন।"

"ভাগ্যবানকে একবার চট করে সাইকেলে পোষ্টাফিস থেকে ঘুরে আসতে হ'বে।"

সুপ্রিয় আরও একটু আরাম করিয়া শুইয়া পড়ে।

"অত উতলা হওয়ার কি আছে। চিঠি আজ না পেলে কাল পাবে, না হয় কোনদিন না পেলেই বা তা'তে কি আসে যায়। বোস বরং, এলেই যখন কষ্ট করে।"

পদ্মা সুপ্রিয়ের ভাব দেখিয়া হতাশ হয়। খাটের পাশে বসিয়া বলে, "প্রেমের স্বাদ কিংবা বিস্বাদ কি একেবারেই মেলে নাই জীবনে।"

"মিলবে না কেন? তবে সে স্বাদ শুধু তেষ্টাই বাড়াতে পারলো—তেষ্টা মেটাতে পারলো না—সমুদ্রের জলের মত।"

দুষ্টুমিভরা হাসি ছলকিয়া উঠে পদ্মার চোখে। "তাই নাকি?" কার ঘরে সে ভাগ্যবতী স্রোতস্বিনী নদী রূপ ধরেছেন।"

সুপ্রিয় রসচ্ছলে বলিয়া যায় একই খেলার সুর টানিয়া "খুব বেশী দূরে নয়। ঐ তিন-আনির ছোট কর্তার ঘরেই। সে ফেনিল স্রোতস্বিনী আজ উঠে এসেছেন ফেনিল স্বচ্ছপাত্রে। কিন্তু এত কাছে থেকেও আমার কাছে সে শুধু ফেনিল সমুদ্রই রয়ে গেল—রূপে এবং গাম্ভীর্যে।"

সুপ্রিয় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পদ্মার চোখে। আধ সত্য, আধ রহস্যভরা কি কুয়াশা সে চোখে! কি একটা ব্যথার ইঙ্গিত সে খেলার ছলনাভরা দূরন্তদৃষ্টিতে। পদ্মার ভিতরটা কাঁপিয়া উঠে অলক্ষ্যে। নিমেষের জন্য একটু বিহ্বল হইয়া আবার আয়ত্তে আনে নিজেকে, হাসিয়া বলে, "আমাকে বিপদেই ফেলবে দেখছি, অত স্পষ্ট করে কি বলতে হয় এসব অস্পষ্ট কথা। আমাকে ঘর থেকে তাড়াতে চাও নাকি।"

"কে তাড়াবে ঘর থেকে? অরুণদা নাকি? অতই বোকা মেয়ে কিনা আমাদের পদ্মাবতী!"

পদ্মা একটু বিমনা হইয়া উঠিতে না উঠিতেই গা ঝাড়া দিয়া উঠে সুপ্রিয় "চা খাওয়াও, পদ্মা। আজ সারাদিন মাত্র তেরো কাপ খাওয়া হ'য়েছে।"

পদ্মা বলে, "তাহ'লে আর পাবে না। সিগারেট আর চা দিয়েই এই সুন্দর স্বাস্থ্যটুকু শেষ করবে দেখছি।"

সুপ্রিয় উঠিয়া আরেকটা সিগারেটের টিন বাহির করে। "চা আর সিগারেট একসাথে জমে ভাল, তাড়াতাড়ি হাত চালাও পদ্মা। স্রোতস্বিনী পদ্মাকে না হয় নাই পেলাম—তা'কে দিয়ে চা নিতে ত ক্ষতি নেই।"

পদ্মা খুঁজিয়া পাতিয়া চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করে, কতকগুলি পাটশলা আনিয়া চায়ের জল গরম করে বারান্দায় একটা তোলা উনানে।

"ঘরটাকে যা' করে রেখেছো।"

"তুমি এসে এসে একটু ঝেড়ে-পুঁছে দিয়ে গেলেইত পার।"

হাসে সুপ্রিয় মনে মনে। সে জানে, পদ্মা আসিবে না। সে টের পাইয়াছে, পদ্মার মনে ভয়ের ছায়াপাত করিয়াছে। দুর্নাম ঘাড়ে নিতে রাজী নয় পদ্মা। হাজার হউক এটা গ্রাম দেশ। আর কোন দেশেই বা নাই চোখের উঞ্ছবৃত্তি?

সুপ্রিয়ের এইটুকুই আনন্দ। পদ্মার মনের এই মৃদু ভয়ের সিঞ্জন-টুকুই যেন তাহার উপভোগের বিষয়। সেইজন্যই সে আরও বিপদগ্রস্ত করিতে ভালবাসে পদ্মাকে। আনন্দই পায়!

একটানা দীর্ঘ রেলপথে মাঝে মাঝে ছোট ষ্টেশন আসে। তারও একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে চলার পথের যাত্রীদের মনে। ক্ষণিকের জন্য একটানা চলার একঘেয়েমী কাটিয়া যায়। তাই কোনও বিশেষ বয়সের যাত্রীরা প্রয়োজন থাক বা না থাক প্রতি ষ্টেশনে একটু না নামিয়া থাকিতে পারে না!

জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাপথেও মানুষের প্রয়োজন, ছোট ছোট বিরতি, সামান্য একটু বৈচিত্র্য। হোক ফাঁকি, হোক ক্ষণস্থায়ী।

গন্তব্যপথের একটিমাত্র বড় জংশনের ধ্যানে দুই পাশের বিজ্ঞাপনের বাহারে চটকদার ছোট ছোট ষ্টেশনগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যাইবে সে জাতের মানুষ নয় সুপ্রিয়। বটের ছায়ার অপেক্ষায় পথের দুইধারের কিশলয়কে অবহেলা করিতে পারে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে অভিনন্দন জানাইয়া চলে সে।

দুই দিন পদ্মা আর আসে না। সুপ্রিয়ও যায় না। মজা দেখে

সে। পদ্মার স্নেহের এক বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে সে, এইটুকু অন্ততঃ না বুঝিবার মত উদাসীন মন নয় তাহার।

তৃতীয় দিনে পদ্মাই আসে। 'দশগণ্ডার' ঝিয়ের মুখে শোনে, তাহাদের ছোটবাবুর অসুখ। কি অসুখ, বলিতে পারে না। বলে, একটু আদা লইতে আসিয়াছে—ছোটবাবু কি যেন ওষুধ খাবে।

পদ্মা বলে, "তুমি যাও। আমিই নিয়ে যাবখন।"

পদ্মা সুপ্রিয়ের ঘরে ঢুকিয়া বলে, "অসুখের খবরটা কি পরশুই জানাতে পারতে না কাউকে দিয়ে?"

"একটা মাত্র উঠোন পেরিয়ে তুমিও কি আসতে পারতে না তিন দিন আগে?

পদ্মা হাসিয়া বলে, "আমি কি করে জানবো, তোমার অসুখের কথা। আমি কি গণা জানি?"

"তা' হ'লে আমিও ত গণা জানি না। আমিই বা কি করে জানবো যে তোমাকেই একটা খবর পাঠান প্রয়োজন। আরও ত দু'টো বাড়ী রয়েছে।"

পদ্মা হার মানিয়া চুপ করিয়া যায়। সুপ্রিয় মনে মনে হাসে।

"আদা দিয়ে কি হ'বে এবার বল?"

"চা খাব। খুব কড়া করে এক কাপ চা খাইয়ে যাও—এলেই যখন।"

পদ্মা চা করিয়া আনে।

"এবার তা'হলে যাই। কিছু দরকার-টরকার হ'লে তিন বাড়ির কাউকেই না হয় জানিও।"

অরুণাভের পত্র আসে না বহুদিন। অভিমানে ও উদ্বেগে আচ্ছন্ন

হইয়া থাকে পদ্মার স্পর্শাতুর মন। বৃদ্ধাদিদিশ্বাশুড়ির নজর এড়ায় না। "কিলো, অরুণের পত্র যে আর আসে না।" পদ্মা যেন মরমে মরিয়া যায়। তবু শান্ত স্বরে উত্তর দেয়,

"কাজে ব্যস্ত আছেন তাই সময় পান না।"

দিদিশ্বাশুড়ির মনে সায় দেয় না এ উত্তর। মনে মনে ভাবে, হাজার কাজ থাকলেও বৌকে একখানা পত্র লেখারও সময় পায় না! কেমন একটা আশঙ্কার অস্পষ্ট রেখাপাত করে মনে, হয়তো অরুণ রাগ করিয়াছে বৌকে রাখিয়া দেওয়ায়।

পদ্মাকে ডাকিয়া বলে, "তাকে আসতে লিখে দেই।"

পদ্মা উত্তর দেয়, "আসতে ত পারবেন না এখন—লিখে লাভ কি?"

পদ্মার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে বৃদ্ধা—এ কেমন ধারা কাজ। বৌকেও ভুলিয়া থাকে।

সুপ্রিয় আসিয়া দাঁড়ায়—হাতে একটা এনভেলাপ।

"এই মাত্র পোষ্ট-অফিস থেকে এলাম—নাও তোমার পত্র।" পদ্মার হাতে দেয় চিঠিখানা। পদ্মা একটু তাকাইয়া দেখে সুপ্রিয়ের মুখের দিকে—কি রুগ্ন হইয়াছে চেহারা। পদ্মা পত্রখানা খুলিয়া পড়ে, অরুণাভের পত্র। সুপ্রিয় তাকায় জিজ্ঞাসু চোখে, পদ্মার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বলে, "ব্যাপার কি।"

"ছোড়দা গ্রেপ্তার হ'য়েছে—রাজদ্রোহিতার অপরাধে।"

সুপ্রিয় চুপ হইয়া যায় পদ্মার মনের অবস্থা বুঝিয়া।

পদ্মার মন আকুল হইয়া উঠে—প্রাণদণ্ডাদেশ হইবে না ত? ছোড়দার সাথে আর কি দেখা হইবে না জীবনে?

পরের দিন ভোরে ডাক আসিতেই পত্রিকাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখে পদ্মা। প্রতি কাগজে বিপ্লবের আভাস বড় বড় উজ্জ্বল অক্ষরে।

লেলিহান শিখা, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পদ্মার চোখের সামনে ভাসে যেন আগুনের শিখাগুলি। বিপ্লবের রথধ্বজা হাতে ছুটিয়া চলিয়াছে শতাব্দীর পুঞ্জিভূত বেদনা-বিক্ষুব্ধ নিপীড়িত দেশবাসী। বিদ্রোহী আত্মার নির্ভীক ঘোষণা পদ্মারও প্রাণে নাড়া দিয়া যায়—"করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" সশস্ত্র জঙ্গীবাহিনীর টোটাভরা সঙ্গীনের মুখ স্থির নির্ভীক যুবকদল। মরিতে ভয় পায় না তাহারা—বলীয়ান কিশোর বীরেরা। সুকল্যাণও ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে এ রণভেরীর অমোঘ আমন্ত্রণে। গর্বে ভরিয়া উঠে পদ্মার মন। তাহারই দেশের মানুষ, তাহারই গৌরবের ভ্রাতা-ভগিনী সব। পত্রিকার পঙ্‌তিতে পঙ্‌তিতে রক্ত-ঝরা বীরগাথা।

পদ্মার মন উতলা হইয়া উঠে। দিদিশাশুড়িকে বলিয়া সুপ্রিয়ের সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে চায়।

দিদিশাশুড়ি ভাবে, "অরুণের জন্য মন কেমন করে। ছোঁড়া, একখান পত্রও লিখে নাই বৌর কাছে।" বধূ জীবনের একটা স্মৃতির দমকা হাওয়া বহিয়া যায় বৃদ্ধার মনে।

সরকার মশাইকে ডাকিয়া পদ্মাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলে। "পাল্কীর বেহারাদের একটা খবর পাঠান"। সরকার মশাই মৃদু আপত্তি জানায়, "সেখানেত এখন গোলমাল চলছে।"

কিন্তু বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ি সহজাত মেয়ে মানুষের মন দিয়া বোঝে পদ্মার মনের অবস্থা "ছেলে যখন পইড়া আছে গোলমালের মুখে, তখন এর আর সেখানে যাইতে দোষ কি ?"

মদন সেই যে পুলিশের সাক্ষী দেওয়ার ভয়ে উধাও হইয়াছিল, আর তাহার খোঁজ নাই। ছয় বছর কাটিয়া যায়। কেহ বলে, সে নাকি জাহাজের খালাসী হইয়া রেঙ্গুন গিয়াছে, কেহ বলে কলিকাতায় বাস চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। সৌদামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে যমুনার অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া। কিন্তু যমুনার ভ্রূক্ষেপ নাই স্বামী নিখোঁজ হওয়ায়। সংসারের অভাব অনটন কিছুতেই বিষণ্ণ করিতে পারে না তাহাকে। দারিদ্র্যের কঠিন প্রলেপেও দেহের তীব্র জ্যোতি, অপাঙ্গের বিদ্যুৎ মিলাইয়া যায় না।

ঠাকুরমার পয়সার পুঁটুলি খুলিয়া চুপি চুপি চার পয়সা দামের লাল একখানা গন্ধ সাবান আনাইয়া লয় বলাইকে দিয়া। তারপর খাটে বসিয়া চোখে-মুখে-হাতে-পায়ে গায়ে সাবান মাখে। সাবানের ফেনিলতার অফুরন্ত পুলক মাথায় পরিপূর্ণ অঙ্গে অঙ্গে। গুণ গুণ করিয়া সুর টানে একটু "কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।"

সৌদামিনী টিকার গুঁড়ি গুলিয়া বসিয়াছে উঠানে। উঠানের আরেক প্রান্তে মাটির গর্ত করা উনানে ভাত সিদ্ধ হইতেছে—ভাতের জল শুকাইয়া আসে তবু যমুনার ঘাট হইতে ফেরার নাম নাই।

"ভাত পোড়া লাগে—তবু পোড়ারমুখীর নাওয়া শেষ হয় না," বুড়ি গজ গজ করে।

যমুনা ফেরে এতক্ষণে—ভিজা কাপড়ে। সাবানের গন্ধ এখনও লাগিয়া আছে গায়ে গায়ে।

ঠাকুরমার নজর এড়ায় না।

"আবার সাবান কিনছিস—পয়স। পালি কই ?"

যেখান থেইকা খুশি পাইছি—অত নিকাশ দিতে পারি না।"

সৌদামিনী আগুন হইয়া উঠে, "রস আইছে শরীলে। লজ্জা নাই মাথারীর। তোর স্বোয়ামীর কামাইয়ের পয়সা নাকি লো—যে নিকাশ দিতে পারবি না ?"

"অমন স্বোয়ামীর হাতে দিছিলি কেন—তখন মনে ছিল না ?"

যমুনা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া হঠাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করে ফুলিয়া ফুলিয়া। "মালো, তুই আমারে ফেইলা কই গিয়া রইছিস লো ?"

সৌদামিনীর মনটা নরম হইয়া আসে।

মা-মরা মাইয়াটা! ওর কপালে কি আর সুখ আছে ?

ঘরে ঢুকিয়া ডাকে সে, "যমুনা উঠ—খাবি চল।"

"না, খামু না আর। স্বোয়ামীর কামাইয়ের ভাত যখন না তখন ছাই খাইয়াই থাকুম—তবু তোর ভাত খামু না।"

"আমার মাথা খা, যমুনা। চল। তুই কি বোঝস না গন্ধ সাবান-কেলীর কি সময় পড়ছে এখন ? ধানের দাম কত গেল গেছে হাটে খোঁজ রাখস ? পরাণটাত কাঁইপা উঠছে—মানষের। গুষ্ঠিশুদ্ধা না খাইয়া মরণ লাগবো-লো।"

এতক্ষণে বোধহয় একটু হুঁস হয় যমুনার। পেটেও ক্ষুধা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আবার দিন দুই পরই চুপি চুপি ছয় পয়সার নারকেল তেল কিনিয়া আনে অশ্বত্থতলা হইতে। আবার এক পশলা হইয়া যায় ঠাকুরমার সাথে।

সৌদামিনীর আসল রাগ তার ছেলের উপর।

যমুনাওত ওরই সন্তান। ভালমন্দ এটা সেটা ছেলেপুলে লইয়া যায়, একবার এই মাইয়াটারে একটু ডাকিয়াও লয় না। আর সেও ত তারই গর্ভধারিণী মা। কিন্তু এখন যথাসর্বস্ব গিলিয়া বসিয়াছে ঐ ছোট বৌটা।

"ঐ বৌয়ের কপালেও সুখ থাকবো না, ওর পেটের সন্তানও ওকে এমন কইরাই জ্বালাইব। শাপ দিলাম এই ভর-সন্ধ্যায়। বিষে জর্জরা হইব শরীর ওর।"

ছোট বৌও জ্বলিয়া উঠে, "শুনলাত কি কইল?" তুমুল লাগিয়া যায়।

যমুনার ভ্রূক্ষেপ নাই—সে তখন ঘরের ভিতরে আরশী লইয়া চুল বাঁধা শেষ করিয়াছে। একমুখ পান খাইয়া বাহির হইযা পড়ে।

ছোট বৌয়ের গলা রাস্তা হইতেও শোনা যায়, "নাতনী কি শুধু বড় বৌয়ের মাইয়াই। আমার হারাণী ওর নাতনী না? বলাই ওর নাতি না? এই বাড়ী, ঐ বাড়ী থেইকা কত কিছু যে আনে—অগো হাতে দেয় ভুলেও একখানা।"

সৌদামিনী কাঁদিতে আরম্ভ করে। "হ, কত কিছুই মণ্ডামিঠাই খাই আমরা ঘরে খিল দিয়া। আজ দুই দিন ধইরা যে এক সন্ধ্যা কইরা খাইয়া আছি—খোঁজ রাখে তা' পেটের পোলায়?"

"রাখবো ক্যান? নাতনীর পীরিতের জনের কাছ থেইগা চাউল মাইগা আনতে পার না? সাবান কিনতে পার, ফুলতেল মো মো করে চুলে। আর চাউল কিনতে পার না? চাউলের বেলায় বুঝি পেটের পোলার নাম মনে পড়ে?"

এইবার সৌদামিনী ডাক ছাড়িয়া যমুনার চৌদ্দপুরুষের উদ্ধার আরম্ভ করে।

"মরেও না ঐ হারামজাদী।"

যমুনা ঘোর সন্ধ্যার সময় ঘরে ফেরে। "হয়েছে কি? এত চেচাইতেছেন ক্যান?"

"চেচাই ক্যান। বুঝবি লো বুঝবি। বুড়া তুইও হবি—। বাড়ী আসনের আর নাম নাই—ওদিকে কলসী যে ঠন-ঠন করে, খেয়াল আছে। আমার এই বুড়া হাড়ে আর কত মেহনত সয়।"

যমুনা কি জানে না তাহা। কিন্তু বেলাবেলি জল আনিতে গেলে মালির ছেলেকে মিলিবে কি টিপ-কলের তলায়?

সময়ের হিসাব তাহারও আছে।

যমুনা বাহির হইয়া যায় গর্বিত পদক্ষেপে। কে বলিবে, এক বেলা ভাত খাইয়া থাকিতেছে সে। আরেক বেলা পাড়ার বাবুদের বাড়ী হইতে চাহিয়া-আঁনা পানের রস দিয়া উর্বর রাখিতেছে রক্তের শিরা উপশিরাগুলি।

সুন্দর সন্ধ্যা। যমুনা তাকাইয়া দেখে, সূর্যের হাতে-গড়া ফুলের বাগিচা। উন্নত-বৃন্ত রজনীগন্ধা, সূর্যমুখী আর অজস্র দোপাটি ফুলে রঙের বন্যা। সূর্যই ত লাগাইয়াছে ঐ সূর্যমুখীর চারাগুলি। যমুনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। কি মদিরতা যৌবনোচ্ছল চোখের কালো মণিতে।

খেলার মাঠটা খালি হইয়া গিয়াছে। শুষ্ক মাঠের বুকে যেন কি কামনার মৃদু ক্রন্দন!

সূর্যের বাগানে জল দেওয়া শেষ হইয়া যায়।

"কিলো, এত দেরি যে জল নিতে।" বলিয়া উঠিয়া যায় আরেক ঝাঁঝরি জল লইতে।

শিশু কামদেবতার মদির আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়ে মূর্খ-অজ্ঞ ভীরু চোখে। সুন্দর সে দৃষ্টি।

প্রেয়সী সাম্রাজ্ঞীর সুখ-স্বপ্ন-মধুর দৃষ্টি ধরা দেয় যেন তমসাঘেরা চঞ্চল কম্পিত আদিম চোখে।

বেদনা আর আনন্দের রস সংমিশ্রনে কি রহস্য অনুভূত হয় যৌবন-পুষ্ট বক্ষপিঞ্জরে। পৃথিবীর কলরব থামিয়া গিয়াছে যেন এক অদৃশ্য সংকেতে।

স্কুল ঘরের পেছনে টিউব-ওয়েলের পাশে আসিয়া দাঁড়ায় দুইটি নরনারী। মাথার উপরে গোধূলি আকাশে ধ্রুবতারা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অদূরে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিয়াছে খালের জলে। নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কথা কয় সূর্য, "যমুনা, তোরে আমি বিয়া করুম। মদন কি আর বাঁইচা আছে। ঠিক করছি, কোর্টে গিয়া বিয়া করুম তোরে।"

কাঁপুনি খেলিয়া যায় যমুনার বুকের ভিতরে। কি স্পষ্ট কথা! শত-সহস্র ইঙ্গিত আর ইশারার অবসান হইয়া যায় ছোট্ট কয়টি কথায়। "সূর্য বিয়া করিবে তাহাকে।" পথ আছে, উপায়ও আছে। কোর্টের বিবাহ। তাহার দুঃখের যবনিকা পড়িল বুঝি এতদিনে!

পৃথিবী-ভরা সেই একটু দুর্নিবার প্রাথমিক আকর্ষণ সংস্কারাচ্ছন্ন সূর্যেরও পুরুষবক্ষের আড়ালে। কি অপূর্ব চঞ্চলতা! আগুন ধরিয়া যায় বুঝি যমুনার কুমারী রক্তের অনু-পরমাণুতে কাল-ঠোঁটের প্রথম চুমায়। মনে হয় যেন, সমস্ত পৃথিবীর কর্ম চঞ্চলতা ডুবিয়া যাক অন্ধকারে, চির অন্ধকারে। শুধু এই মুহূর্তটুকু অক্ষয় হইয়া থাক শাশ্বত দেবতার আশীর্বাদে।

যমুনা জলভরা কলসী তুলিয়া লয়। এত আনন্দ, এত আরামও আছে এই পৃথিবীতে! একটা তীব্র মধুর ঘুমন্ত চেতনা যেন হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে তাহার সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে।

পরের দিন মধ্যাহ্নে আবার আসে যমুনা কলতলায় অন্তরীক্ষের কোন অলৌকিক আকর্ষণে। ছুটির দিন। বোবা মাঠের বুকে বুলিহীন সবৎসা গাভীর ব্যাকুল আহ্বান ভাসিয়া আসে দূর শব্দ তরঙ্গে তরঙ্গে।

সূর্য জানায়, এই মাসেই বিবাহ করিবে তাহাকে। যেদিকে তাকায়, দেখে যমুনা, কি সুন্দর সোনার-বরণ রৌদ্র। দীর্ঘ স্রোতের উজান ঠেলিয়া যেন দুইজনে মিলিয়াছে এক রৌদ্র-নাওয়া সোনার চরে। দূরের তটভূমি চোখে পড়ে, কি না পড়ে এ মিলন মুহূর্তে।

বাড়ী ফেরে যমুনা। আনন্দ বিহ্বল পদধ্বনি মেলে ধূলিপথ রেণুতে রেণুতে।

বাড়ী আসিয়া দেখে যমুনা, মদন আসিয়াছে। দিনে দুপুরে ভুত দেখিলেও বুঝি এমন করিয়া আঁৎকাইয়া উঠিত না বুকটা।

যমুনা ভীতি-বিহ্বল চোখে তাকাইয়া দেখে, বহুদিনের হারাণ জামাইকে-পাওয়া পরিতুষ্ট পরিজনদের। অফুরন্ত, অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছে মদন, বিস্ময়ে হতবাক শ্বশুর-শাশুড়ি-শ্যালকদের কাছে। মাথার সেই বাবরি চুল আর নাই। গোঁফটি এখনও আছে, তবে গোঁফের ধরনটি বদলাইয়াছে। আগের মত সজারুর কাঁটার মত গোঁফ নয়। নূতন গিলবার্ট ফ্যাশনের সরু একটি রেখা পুরু ঠোঁটের উপরে। সব-চাইতে বড় বিস্ময়, সাহেবদের মত পরনে খাকি পেণ্টুলান, গায়ে বুশজ্যাকেট। বোতাম-খোলা সাহেবী জ্যাকেটের ভিতর হইতে তলার নোংরা তেল-চিটা গেঞ্জিটা দেখা যায় একটু। তবে অতদূর নজর যায় না বিস্ময়নামা গ্রাম্য অবাক-চোখে।

হাতে একটি রিষ্টওয়াচ—এইটি চুরির সামগ্রী, সেকথাটা অবশ্য গোপনই থাকে এ তাক-লাগানো মজলিসে।

কে বলিবে মদনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছোঁয়-ছোঁয়। কথার ফাঁকে ফাঁকে হাসিয়া এদিক-ওদিক তাকায়। যমুনা একটু তাকাইয়া দেখে—কি নোংরা দাঁতগুলি। উপরের পাটিতে দুইটি সোনার খিল করা বাঁধান দাঁত ঝকঝক করে। আবার কথা বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে অমন কাঁধ কাপায় কেন, ব্যাটা? বোঝে না যমুনা মদনের এ "স্রাগ" করার মর্মার্থ।

যমুনা ঘরে ঢুকিয়া বেড়ার ফাঁক হইতে শোনে—তাহার আত্মীয় পরিজনদের প্রতিটি কথা, প্রতিটি রসিকতা। এতদিনে নাকি যমুনার কপাল ফাটিয়াছে। সৌদামিনী আহ্লাদে ভরিয়া ডাকে, "কইল, যমুনা, আয় ত। দেখুক ব্যাটা এতকাল এমন বৌরে ভুইলা ছিল কেমনে।"

সূর্যও একফাঁকে ঘুরিয়া যায়। খুশি হইতে পারে না সে মদনকে দেখিয়া। মদন কত মায়না পায়, কোথায় ছিল, এসব জানিবার জন্য উদগ্রীব নয় সূর্য। যমুনা খুশি হইয়াছে কিনা মদনকে পাইয়া তাহার আজ সেইটাই সব চাইতে বড় কথা জানিবার। সন্ধ্যার কাছাকাছি দেখা মেলে যমুনার। বাসন মাজিতেছে ঘাটে বসিয়া। সূর্য আজ ভুল করিয়া তাহাদের ঘাটে আসিল নাকি পা ধুইতে! বির বির করিয়া কি যেন বলে সে, "আমাগো ঘাটের পথে একটা গরুর ঠ্যাং আইন্যা ফেলছে কুত্তায়—তাই এই ঘাট থেইকাই পাওটা ধুইয়া যাই।"

কিন্তু যমুনা একবার তাকায়ও না। বাপরে দেমাক কত। সূর্যের বুকটা যেন অবশ হইয়া আসিতে চায় যমুনার এই নীরবতায়। তবু একটু খোঁটা দিতে ছাড়ে না—"কিলো যমুনা, শহরে কবে চল্লি।" যমুনা তবু কথা কয় না।

"বাসাবাড়ীতে যাবি বইলা কি এতই তাচ্ছিল্য আমাগো।"

যমুনা মুখ তোলে এতক্ষণে। দুই চোখ তাহার জলে ভরা।

সূর্য খুশি হয়, যমুনা কাঁদিতেছে। আর কিছু জানিবার দরকার নাই তাহার।

কিন্তু মদন যদি লইয়া যাইতে চায়। যমুনা চোখের জল মুছিয়া তাহার স্বাভাবিক গর্বিত উদ্ধত স্বরে জবাব দেয়, "কে যাইব ঐ ব্যাটার লগে। আমারে কাইটা ফেললেও না।"

কিন্তু মদন লইতে আসে নাই যমুনাকে। বাড়ীর সকলে অবাক হইয়া যায়।

"এত টাকা করছো—এত জিনিসপত্র, তবে মাইয়ারে নিবা না—সেটা কেমনতর।" হারাধনের পিতৃস্নেহটা আজ যেন বড় বেশী উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে প্রথমা কন্যার সুখদুঃখের চিন্তায়।

মদন তার ভারিকি চালে জবাব দেয়, "সেখানে কি গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝিরা স্বভাবচরিত্র ঠিক রাইখ্যা চলতে পারে। সাহেবে গিজ গিজ করতাছে চতুর্দিকে। আর সাহেবগুলির নজরত শুধু ঐ মাইয়া মানুষের উপর।" হাসে মদন—অশ্লীল অসভ্য হাসি।

শিহরিয়া উঠে গৃহস্থ বৌ-ঝিরা। মদন ধীরে ধীরে তামাক টানে। সেকি আসিয়াছে বৌ লইয়া যাইতে? ঐ ত চেহারা বৌর। না, চেহারা এমন কিছু মন্দ না। তবু তাহাদের এরোড্রামের রাস্তার সুরকি ভাঙ্গার কাজ, লওয়া সেই গোলাপী, সুবর্ণ, কালামিঞার বৌ—তাহাদের সেই সরস হাসির কাছে—যমুনার ঐ বোকা বোকা চাউনির তুলনা হয়? একরাতেই টের পাইয়াছে মদন—যমুনাকে দিয়া কাজ চলিবে না তাহার। মদনের দৃষ্টি পড়ে প্রতাপের বৌর উপর। বিলাতী সাহেবের মন টলাইতে না পারিলেও দেশী সাহেবের মন গলিবে নিঃসন্দেহে!

খোদ আমেরিকান অফিসার সাহেব হইতে বেয়ারা পর্যন্ত সকলেরই আজ প্রয়োজন লাল-শাদা মদ আর উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে। একটা উন্মত্ত ক্লেদাক্ত কামনা, লালসার পুতি-গন্ধভরা উদ্দাম হাওয়া বহিতেছে আজ মিলিটারীর তাঁবুতে তাঁবুতে, এরোড্রামের খোলা ময়দানে—সুরকী-ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে মোড়ে, কনট্রাক্ট লওয়া নূতন সামরিক শহরে।

সে দূষিত বাতাসের কাল-সর্পিল গতি আঁকিয়া বাঁকিয়া পথ খুঁজিয়া লইতে বাহির হইয়াছে—গৃহস্থ ভদ্র পল্লীর গলিতে গলিতে, গ্রাম-গ্রামান্তরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মধুর পরিবারের প্রাণকেন্দ্রে।

যুদ্ধার্ত পৃথিবীর অদৃশ্য বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ভারতীয় সভ্যতারও অন্তিম শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে বুঝি কালপর্দার আড়ালে। কিন্তু সে গবেষণায় ব্যস্ত হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না প্রতাপের ঘরের আঙ্গিনায়। মদন সিন্ধুবালাকে এক টিন বিলাতী মাছ আনিয়া দিয়াছে তাই লইয়াই ব্যস্ত সকলে।

"দেখ দেখি কেমন মারভিং মাছের স্বাদ ."

সকলে অবাক হইয়া শোনে মদনের মুখেও দুই এক টুকরা ইংরাজী বুলি। মাছের টিনটা কাটিতে কাটিতে প্রতাপের যেন জল আসে জিভে। মদন অনর্গল চাখাইয়া চলিয়াছে। কত কৌটা ভর্তি-ভর্তি দুধ, চিজ্ বাটার! হঠাৎ সকলে ছুটিয়া উঠানে নামে—মাথার উপর দিয়া কয়টা উড়োজাহাজ যাইতেছে!

মদন তাচ্ছিল্যভরা গর্বে বলে, "ঐটা লিবারেটার—আর ঐ তিনটা ফ্লাইং ক্যামেল। সিন্ধুবালা বিস্ময়ে বিষম-খাওয়া চোখে তাকাইয়া দেখে মদনকে। "তা জামাই বুঝি উড়ো জাহাজেও চড়ছো!"

"কত!" বেমালুম মিথ্যা কথাটা বিনা-দ্বিধায় বলিয়া যায় মদন।

উড়োজাহাজেই যদি না চড়িয়া আসিয়া থাকে এই যুদ্ধের যুগে, তবে শ্বশুর বাড়ীতে সম্মান থাকে কই। বিশেষ ঐ সুন্দর-বৌয়ের কাছে।

মদন আবার তাকাইয়া দেখে সিন্ধুবালার গায়ের রংটা। মনে মনে ভাবে, রং বটে। ভুইমালির ঘরে কি আর এ মানায়?

তাহাদের ক্যানটিনের পাশের রাস্তা দিয়া যে মেমগুলির কোমর জড়াইয়া আধ-মাতাল সাহেবগুলি ঘোরে ডিনার খাওয়ার পর—সেগুলির রূপত এমন কিছু না। তবে ঐ ফ্রক পরে বলিয়া যেটুকু বাহার দেখায়। আর ঠোঁটগুলি অত টুকটুকে লাল বলিয়া। চুলগুলিও বাবরি করিয়া ছাঁটা। এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে একদিন ত মদনের দফা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছিল এক মিলিটারী লরীর তলায়।

কিন্তু সেই মদনকেও মনে মনে স্বীকার করিতে হয়—সিন্ধুবালা কাল মেমগুলির চাইতে অনেক সুন্দরী। কোন রকমে একবার প্রতাপকে পটাইয়া শহরে নিয়া ফেলিতে পারিলেই বাজী মাৎ।

মদনের গল্প আর ফুরায় না। সিন্ধুবালার চোখে যেন স্বপ্নকথা নামিয়া আসে। এত সুখ শহরে! সেই বাবরিমাথা মদনও আজ সাহেব বনিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া প্রতাপকে জানায় মনের ইচ্ছাটা, "জামাইরে কইয়া মিলিটারীতে একটা কাজ জুটাও না।" প্রতাপেরও মন্দ লাগে না যুক্তিটা। ধানের মন ১৫৲ উঠিয়াছে গেল হাটে। দাম কমার নাকি আশা নাই। আরও ভয়ংকর দিনই আসিতেছে সামনে। কিন্তু সূর্যের মত হয় না। ছোট হইলেও ভাইয়ের মতামতকে সমীহ করিয়া আসিয়াছে প্রতাপ চিরদিন। আজও উহা উড়াইয়া দিতে পারে না। সুন্দর-বৌ ঝঙ্কার দিয়া উঠে "ভাইয়ে গ্রাম থেইকা সরবো ক্যান—তার পীরিতের জনরে কালাইয়া।"

প্রতাপ চুপি চুপি পরামর্শ করে মদনের সঙ্গে—একটা কাজ-টাজ জুটাইয়াই যেন সে পত্র দেয়।

পদ্মা ছাদের ঘরে বসিয়া জামা ইস্তিরী করিতেছে। মনের ভিতরে জমিয়া আছে অফুরন্ত চিন্তার কুহেলী। স্বকল্যাণের বিচারের রায় বাহির হয় নাই এখনও। থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে স্বকল্যাণের কথা।

মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। ছাদের এক কোণায় সরিয়া গিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে যেন নিস্তেজ রোদটুকু। পদ্মা অচঞ্চল চোখে তাকাইয়া থাকে। স্মৃতির অবসাদমাখা স্তিমিত রৌদ্র।

অরুণাভও ঘরে ফেরে নাই এখনও। মৃদু প্রতীক্ষ্যমাণ মনে কাজ করিয়া যায় পদ্মা। ইস্তিরী ঠাণ্ডা হইয়া আসে। পদ্মা উঠিয়া যায়—উনানের উপর ইস্তিরীটা বসাইতে।

নীচে পদশব্দ শোনা যায়। অরুণাভেরই পায়ের শব্দ। পদশব্দেও এত প্রাণ, এত উত্তাপ আছে জানিত না সে। নীচে নামিয়া যায় পদ্মা! আরেকটি মেয়েও আসিয়াছে সঙ্গে। অরুণাভ পরিচয় করাইয়া দেয়। "আমাদেরই একজন কমরেড—ইরা বসু।"

সামনের সপ্তাহের কর্মসূচি লইয়া আলোচনা আরম্ভ করে তাহারা। পদ্মা চুপ করিয়া বসে এক কোণায়। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া দেখে, অপরিচিতাকে। ব্যস্ততার স্পষ্ট অভিব্যক্তি চোখেমুখে। স্বন্দর মুখশ্রীতে একটা কাঠিন্যের ছাপ পড়িয়াছে।

পরের দিনও ইরা আসে অরুণাভের খোঁজে। হাতে এক গোছা জনযুদ্ধ, কাঁধে ঝুলান বর্মি থলিতে পুস্তিকা রাশি। পদ্মা চেয়ারটা একটু

টানিয়া দেয় বসিতে। কিন্তু বসে না ইরা। টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটা চিরকুট লেখে অরুণাভের নামে।

পদ্মা জানালার পাশে বসিয়া একটা পুরান ফরোয়ার্ড ব্লক পড়ে মন দিয়া। ইরা আড়-চোখে তাকাইয়া দেখে। একটু অবজ্ঞামিশ্রিত মৃদু সংশয়ের ছায়াপাত করিয়া মিলাইয়া যায় পীতাভ উজ্জ্বল চোখের তারা দুইটিতে। পদ্মার দৃষ্টি এড়ায় না।

কি একটু ভাবিয়া বলে সে, "চা করি, চা খেয়ে যান ?"

"চা খাওয়ার সময় নেই এখন। তাছাড়া চা আমি খেয়েই এসেছি আসার পথে।"

পদ্মার হাতের কাগজটার দিকে একটু সন্দেহ-ভরা দৃষ্টি বুলাইয়া বলে সে, "তুমিত বস্তি টস্তিতে যেতে পার অনায়াসে অরুণাভের সঙ্গে। অন্ততঃ একটা অভিজ্ঞতাও ত হ'তে পারে ওদের জীবন সম্বন্ধে।"

একটু থামিয়া আবার বলে, "অরুণাভের কাছে শুনলাম, লিখতে টিখতে নাকি পার। গেলে কাজে আসবে তোমার।"

নীরবেই শোনে পদ্মা, ইরার এ অকুণ্ঠিত উপদেশ। ইরা তাহার অলংকার বিহীন হাতের রিষ্টওয়াচটায় একটু চোখ বুলাইয়া বলে, "চলি এবার। আজ বিকেলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটা সভা আছে। দরদীরাও যেতে পারবে। যেও তুমিও।"

একটা কথা লক্ষ্য করে ক'দিনেই পদ্মা, সে যে উহাদের দলের মেয়ে নয়; সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন উহারা।

একটা ধারাল ছুরি দিয়াই খুদিয়া খুদিয়া কে যেন লিখিয়া দিয়া যায় তাহার বুকের ভিতরে এই রূঢ় সত্য, একটা অস্বস্তিকর চেতনায়। টের পায় পদ্মা, এ বিষয়ে একমাত্র ইরাই যে খেয়াল রাখে, তা' নয়—

অরুণাভও এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। একটু দরদী অনুকম্পার চোখেই যেন দেখে অরুণাভও তাহাকে, লক্ষ্য করে পদ্মা।

অরুণাভের ঘরে একটা ঘরোয়া মিটিং ডাকা হইয়াছে। দুপুরবেলায় আর বাহির হয় নাই সে আজ। প্রায় দুইটা বাজে, অরুণাভ মিনিট বুক ইত্যাদি সব গুছাইয়া রাখে। মেঝেতে একটা শতরঞ্জি বিছান। ইরা আসিয়াছে আগেই। সে বসিয়া বসিয়া পত্রিকা দেখে। "একটু চা পেলে মন্দ হ'ত না" বলিয়া অরুণাভ যায় ছাদে রান্না-ঘরের দিকে। পদ্মার স্নান খাওয়া হয় নাই তখনও। গঙ্গার জলের ট্যাঙ্কের সামনে বসিয়া বাসন মাজিতেছে সে।

অরুণাভ নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়ায় পিছনে। কেমন একটা দুঃখবোধে মনটা ভিজিয়া উঠে তাহার। পদ্মাকে যেন একটু কৃশ দেখাইতেছে—ভাবে অরুণাভ।

"এখনও স্নান করনি, পদ্মা? দুটো যে বাজে?" কোমল সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠস্বর।

পদ্মা হাসে একটু—উত্তর দেয় না। মৃদু বিদ্রূপ-মিশ্রিত হাসি। অরুণাভ লক্ষ্য করে। একটু চটিয়া যায় সে মনে মনে। পদ্মার হাসির অর্থ হয়তো এই, মাসের পর মাস ত কাটিতেছে এই ভাবেই—আজ হঠাৎ এ সমব্যথা উঠিল কি কারণে বা অকারণে? সত্যিই ত তাই। কিন্তু উপায় কি? পত্রিকা অফিসে একটা সাব-এডিটারের চাকুরী। ঐ সামান্য আয়ে আর এই যুদ্ধের বাজারে কি-ই বা সহজ গতি আসিতে পারে জীবনযাত্রায়?

কিন্তু পদ্মার অভিযোগ সে জন্যও নয়। তাহার জ্যেঠীমার সংসারেও

দারিদ্রতার আড়ালে বাস করিত না সে। সংসারে কতটুকু অভাব আছে আর কতখানি অভাব নাই—তাহা লইয়া চিন্তাও করে না, চিন্তিতও হয় না পদ্মা। তবু তাহার বিদ্রূপের হাসি ফিনিক দিয়া যায় কেন? সে প্রশ্ন লইয়া চিন্তা করিবে কে? অরুণাভের সময় আছে কি এ চিন্তাজালে নিজেকে জড়াইবার মত। কাজেই পদ্মাও জানায় না কোনদিন তাহার ব্যথার কথা।

মুহূর্তের মধ্যে আবার তাহার চোখের কোমলতা ফিরিয়া আসে। অরুণাভের দিকে তাকায় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে। "চা চাই?"

"না, তোমাকে আর করতে হ'বে না। আমি নিজেই করছি। বল, কেটলীটা কোথায়?"

পদ্মা হাত ধুইয়া জল বসাইতে বসাইতে ঠাট্টার সুরে বলে, "ফুটন্ত জলের ধোঁয়ায় কোয়ালিটেটিভ চেইঞ্জ আর হয় না?"

"হয়, পদ্মা হয়। কিন্তু তা' আর আজ টের পায় কে?"

এত দুঃখ, কেন আজ অরুণাভের কণ্ঠস্বরে। পদ্মা বিস্মিত হয়। অরুণাভ কেন জানি আজ বড় অপরাধী মনে করে নিজেকে।

পদ্মা চায়ে দুধ-চিনি মিশাইতে থাকে।

অরুণাভ গভীর দৃষ্টিতে দেখে পদ্মাকে। এত বেশী বিশীর্ণ দেখাইতেছে কেন উহাকে?

"বড় রোগা হ'য়ে গিয়েছ, পদ্মা। কি হ'য়েছে বলত?"

পদ্মা হঠাৎ কেন জানি একটু লাল হইয়া উঠে, চোখের পলকে আবার সামলাইয়া লয়। অরুণাভ বিস্মিত হয়।

"চা-টা দিয়ে আসবো কি?" ঠাট্টামেশান আনুগত্যের সুর কণ্ঠে। ভীষণ ভাবে লজ্জিত হয় অরুণাভ। এ অর্থভরা কণ্ঠস্বরে একটা অবরুদ্ধ দুয়ার যেন খুলিয়া দেয় মনের। অরুণাভ চা লইয়া যায় ঘরে। ইরা

খুশি হইয়া বলে, "বড়ত ভাল বৌ পেয়েছো, অরুণাভ। দিনে কবার চা করাও।"

কিন্তু অরুণাভ উত্তর দেয় না, মন তাহার ভারী হইয়াই থাকে। ইরা কথা বলিয়া চলে। সব কথা তাহার কানে পৌছায় না। কেন যেন বড় অন্যমনস্ক আজ অরুণাভ। সত্যি কি পদ্মাকে শুধু "ভাল বৌ" করিয়াই রাখিয়াছে সে? আর কিছু নয়? কিন্তু সে দায়িত্ব ত পদ্মারও। সেত আর আসে না, "স্টাডি সারকেলে।" শুধু ঘরের কাজ নিয়া জড়াইয়া রাখিতেছে কেন নিজেকে?

মিটিং আরম্ভ হয়। অরুণাভ চিন্তার সুর ঘুরাইয়া আনে—দুনিয়ার চিন্তাচক্রের মাঝে।

হেমন্তের শেষ। শীতের হাওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বেলাও ছোট হইয়া আসিতেছে। পদ্মা ঘরের সব কাজ শেষ করিয়া আসিতে আসিতে পিচ-ঢালা রাস্তায় ছায়া নামিয়া আসে। তাড়াতাড়ি করিয়া কোনমতে কাজ সারা পছন্দ করে না পদ্মা।

পদ্মা তাহার ঘরে ঢুকিয়া জানালাটার পাশে বসে। এই সময়টুকু সে রাস্তা দেখে রোজই। চলমান পাথিকের চঞ্চল আনাগোনা-মুখর—রাজপথের মাদকতা! ব্যাফ্‌ল-ওয়ালের গা ঘেঁষিয়া বসা অন্ধ ভিখারী—লুঙিপরা মুসলমান ফলওয়ালা—স্তূপীকৃত ডাবের খোসা, লম্বা বিনুনি ঝুলান কলেজের ছাত্রী।

চঞ্চল চোখ জোড়া ঘুরিয়া আসিয়া নিবদ্ধ হয় একটা বড় অক্ষরে-লেখা পোষ্টারের গায়ে। দৃষ্টি আটকাইয়া যায় পদ্মার বে-আইনী ফরোয়ার্ড ব্লকের গোপন একটি ইস্তাহারে। পদ্মার মন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে। সুকল্যাণের বিচার হইতেছে। এদিকে তাহারই স্বামীর ঘরে

মিটিং বসিয়াছে—হয়তো সুকল্যাণদেরই জীবন উৎসর্গকরা চেষ্টাগুলির অপব্যাখ্যা হইতেছে ঐ পাশের ঘরে এখন। পদ্মার ভিতরের মন সায় দেয় না উহাদের এই ব্রিটিশের সাথে মিত্রতায়।

হঠাৎ কাহার মৃদুস্পর্শে চমকিয়া উঠে পদ্মা।

অরুণাভ মিষ্টি হাসিয়া বলে, "ভীরু মেয়ে, কি অত ভাবছিলে?"

পদ্মা যেন একটু অপ্রস্তুত হয় নিজের চিন্তাধারায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে—উত্তর দেয় না।

"ষ্টাডিতে আর যাওয়া কেন, পদ্মা।"

"সময় পাই না।" ছোট্ট উত্তর দেয় পদ্মা। যদিও সে জানে, সময় না পাওয়াটাই কারণ নয়, এ দূরে সরিয়া থাকার। বড় বেশী আত্মাভিমানী মন পদ্মার। তাই কমরেড মেয়েদের মাঝে কেমন একটা একচেটিয়া স্বদেশী করা ভাব লক্ষ্য করে সে। কেমন যেন কৃপার চোখে দেখে তাহারা নূতন-সভায়-আসা মেয়েদের। আন্তরিকতা বিহীন দাম্ভিক ব্যবহার সহ্য করিতে পারে না সে। কিন্তু অরুণাভকে জানায় না সে তাহার মনের এ বিরূপ ভাব। তাছাড়া আরও অভিমান জমা আছে তাহার মনে, অরুণাভও আর ডাকে না তাহাকে তাহার কাজের মাঝে। সাম্যবাদী-জীবনের যে স্বপ্ন—সেও আজ মরীচিকা হইয়া উঠিতেছে তাহার কাছে। অরুণাভ বলে, "ভাবছি আর একটা চাকুরি নেব, পদ্মা, যাতে তোমার খাটুনি কিছু কমে।" পদ্মা ব্যথিত হয় মনে মনে। তবু ধীর কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, "তাহ'লে রাজনীতি করবে কখন?"

"যেটুকু পারি করবো, তবু দুজনে একসঙ্গে কাজ করাই ভাল। সময় কম দিলেও, একজনের চাইতে দু'জনের শক্তিতে জোর বাড়বে আরও অনেক বেশী।"

কিন্তু পদ্মা মনে মনে ভীত হইয়া উঠে। মানুষত ধীরে ধীরে তার মহৎ আদর্শ ভুলিয়া সংসারের ঘূর্ণিতে আটকাইয়া পড়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই। অরুণাভ যদি ধীরে ধীরে সংসারের আবর্তে তলাইয়া যায় এক পা এক পা করিয়া! ভাবিতেও শিহরিয়া উঠে পদ্মা। জল হইতে ডাঙায় তোলা মাছের মতই এ জাতীয় মানুষ কখনও রাজনীতির পরিবেশের বাইরে নিঃশ্বাস টানিতে পারে না। তাহা হইলে তাহাকে আর জীবন্ত পাওয়া যাইবে না। শুধু অন্তঃসারশূন্য মনের কঙ্কালটুকুই পাইবে পদ্মা।

সংসারের কোনও সুদূর ছবি ধরা পড়ে পদ্মার চোখে। জীবনের আদর্শটাকেই সুন্দর করিয়া তুলিতে চায় পদ্মা, জীবনের ব্যবহারিক সুখসুবিধাকে নয়।

সংসার অর্থ কি? কতকগুলি ধারাবাহিক নিয়মে ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালনা করাইত। উহার জন্য এককভাবে সুবিধাজনক পরিবেশ সৃষ্টি করাইত সংসারী মানুষের চরম কাম্য! কিন্তু ইহা লইয়া সুখী হইতে পারে না পদ্মা।

পদ্মা কোমল স্বরে উত্তর দেয়, "আমারও এমন কিছু খাটুনি পড়েনি। তার চাইতে কত বেশী খাটে আমাদের দেশের মেয়েরা।" "কিন্তু তারাত শুধু ঘরের কাজই করে। আমিত তোমাকে সে ভাবে পেতে চাই না, পদ্মা।" পদ্মারও অভিমান ঐ খানেই। তাহার আহত স্থানে কোমল সমব্যথার সংস্পর্শ লাগে। চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতে চায় তাহার। অরুণাভ পদ্মার হাতখানা ধরিয়া অনুনয়ের স্বরে বলে, "কাঁদছো, পদ্মা। আমায় ভুল বুঝো না, লক্ষ্মীমেয়ে।"

প্রেমোষ্ণ হাতের নিবিড় স্পর্শ!

বলিষ্ঠ হৃদয়ের উত্তাপ লাগে অভিমানে ভারী স্নায়ুতে স্নায়ুতে। সহস্র জিজ্ঞাসার কুয়াশা কাটিয়া স্নিগ্ধ রোদ উঠে জলভরা চোখে।

যমুনা সরষে শাক তুলিতেছে কোমরে আঁচল জড়াইয়া। সূর্য পুলের উপর হইতে দেখে। তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে সে। তাহার মন বড় খারাপ আজ। হেডমাষ্টার মশাই আজ সকালে জানাইয়া দিয়াছেন, আর একমাস পরই তাহার আর স্কুলের কাজ থাকিবে না। স্কুলের আয় কমিয়া গিয়াছে, তাই মালী রাখা আর চলিবে না।

এত বড় দুঃসংবাদ সূর্য জীবনে এই প্রথম পাইল। শিশু-বয়স হইতে সে তাহার বাপের সঙ্গে ঐ বাগিচায় নিড়ান দিয়া আগাছা পরিষ্কার করিয়াছে, ঝাঁজরি দিয়া জল ঢালিয়াছে কচি ফুলচারায়। লক্ষ্মী পূজায়, কালী পূজায় ভিন্ন গ্রাম হইতে দলে দলে ছেলেরা আসিয়াছে ফুলের সাজি হাতে তাহার বাগানে। কত খোশামোদ করিয়াছে একটি সূর্যমুখী ফুলের জন্য। সেই বাগান হইতে বিতাড়িত হইবে সে!

বাগানে ফুল ফুটিবে, আবার সে ফুল ঝরিয়া পড়িবে। তাহার এত যত্নের সোহাগী গাছগুলি জলের অভাবে শুকাইয়া যাইবে!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সূর্য—এইবার হয়তো দেশ ছাড়িয়াই যাইতে হইবে। মদনের পত্র আসিয়াছে প্রতাপের কাছে, তাহার জন্য

কাজ ঠিক করিয়াছে সে এক কাঁচের ফ্যাক্টরীতে। সূর্যও চলিয়া যাইবে প্রতাপের সঙ্গেই, মনে মনে ঠিক করে। অভিমানে ম্রিয়মাণ হইয়া আছে তাহার মন। হেডমাষ্টার বাবুই তাহাকে রাখিলেন না যখন তখন আর কি হইবে দেশে থাকিয়া।

মনটা বড়ই দমিয়া যায়। দেশ ছাড়িলে যমুনার সঙ্গেত আর দেখা হইবে না।

কিন্তু যমুনার সঙ্গেত তাহার চিরকালের সম্পর্ক থাকিবে না! একদিনত মদন আসিয়া লইয়া যাইবেই তাহাকে সে মনকে বুঝায়! যমুনাকেত সে আর বিবাহ করিতে পারে না! সধবার বিবাহের ত কোন আইন নাই।

যমুনাকে জানায় সূর্য, দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে সেও।

যমুনার চোখ ভিজিয়া উঠে অভিমানে ; তবু মুখে বলে, "তুমি শহরে যাইবা, তা'তে আমার কি ?"

"সত্যইত ?"

"সত্য। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি ? এতকাল এক গেরামে রইছি, এই যা। শহরে গিয়া সুখে থাকবা, সুখের কথা। তা' এতকালের গেরামের লেইগা, বাপের ভিটাটার লেইগা পরাণ পুড়বো না ?"

পরাণ পুড়িবে কিনা তা' যমুনা কি বুঝিবে। মেয়েমানুষের চোখ বড় কানা, ভাবে সূর্য। মনটা ভারী হইয়াই থাকে।

প্রতাপরা সত্যি দুই ভাই-ই গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। একটা দোচালা ঘরের টিন বিক্রী করিয়া গাড়ী-ভাড়ার টাকা সংগ্রহ করে। এই ঘরখানা ছাড়া, একটা শনের ঘর ছিল শুধু। বড়ঘরের টিনত আগেই বেচিয়া শেষ।

সিন্ধুবালার উৎসাহের অন্ত নাই শহরে যাওয়ার নামে। মদনের মুখে গল্প-শোনা, স্বপ্নের দেশ! তবু শেষদিনে মনটা কেমন যেন করে তাহারও। খানকয়েক কলাই-করা থালা, গোটা দুই পিতলের ঘটি, খানদুই ছেঁড়া কাপড়, একটা ময়লা কাঁথা, বহুকালের পুরানো ভাঙা এক পোর্টম্যানে'র ভিতরে গুছাইয়া, প্রতাপের মাথায় তুলিয়া দেয় সে। তারপর দুই মাসের ছেলেটাকে একখানা ছেঁড়া কাঁথায় জড়াইয়া হাঁটে স্বামীর পিছু পিছু নৌকাঘাটের দিকে।

যমুনা আর সৌদামিনী খালপাড়ে দাঁড়াইয়া কাতর দৃষ্টিতে দেখে তাহাদের প্রতিবেশীদের শহর-যাত্রা। সিন্ধুবালার ছেলেটাকে একটু কোলে লয় যমুনা, তার কচি হাতটা নিজের গালে বুলায় মৃদুভাবে। সৌদামিনী ভারীগলায় বলে শিশুটিকে, "যা'ও বা এদ্দিন পরে আলি, তা'ও বরাতে রইল না, ঠাকুরদার ভিটায় থাকন।"

সিন্ধুবালার দিকে তাকাইয়া বলে, "সাবধানে চইল। আর ওরে ঠাণ্ডা লাগাইও না পথে-ঘাটে। ভাল কইরা ঢাইকা ঢুইকা লইও।"

যমুনা আজ তিন দিন ধরিয়া কথা বন্ধ করিয়া আছে সূর্যের সঙ্গে। রাত্রিতে ছেঁড়া পাটির উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদে সে। দুঃখ আর অভিমানের তপ্ত চোখের জলে ভিজিয়া যায় মলিন বালিশ।

পুরুষ মানুষ-গুলি এমনি মায়া দয়াহীন, ভাবে যমুনা। আবার মৃদু আশা উঁকি মারে, সূর্য বলিয়া গিয়াছে কিছু টাকা পয়সা হইলেই সে চলিয়া আসিবে।

সূর্য ও প্রতাপের জন্য কাজ ঠিক করিয়াছে মদন। ঘরও ঠিক রাখিয়াছে। তাহার ঘরের সংলগ্ন ছোট একখানা খোলার ঘর। সামনেই উঠানে একটা টিউব-ওয়েল। অন্ধকার ভোর হইতে টিপ-

কলে জল নেওয়ার শব্দ আরম্ভ হয়, রাতের আগে বিরাম হয় না এ শব্দের।

দশ-পনেরটি গৃহস্থের জন্য ঐ একটি মাত্র জলের কল। সকলেরই 'ভোঁ' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিসাব-করা বাঁধা সময়। সিন্ধুবালা দিন ভরিয়া দেখে, তাহাদের বাসন ধোওয়া, কাপড় কাচা, স্নানকরা।

কয়টি পেট-উঁচু নেংটা ছেলে আসিয়া দাঁড়ায় সিন্ধুবালার ঘরের সামনে অবাক চোখে। জলপান করিতে করিতে দুই একটি বৌও একটু তাকাইয়া দেখে তাহাকে। তাহারাও পরিয়া আছে তালি-দেওয়া ময়লা কাপড়। তারপর আসে জন দুই হিন্দুস্থানী। ঘটি মাজিতে মাজিতে তাহারা দেখে, নূতন ভাড়াটিয়াদের। সকলেরই একবার করিয়া মুহূর্তের জন্য চোখ আটকাইয়া যায় সুন্দর-বৌর রূপের দিকে।

এরই মধ্যে কি কারণে হঠাৎ কলতলায় দারুণ ঝগড়া আরম্ভ হইয়া যায় মেয়ে-পুরুষে।

সিন্ধুবালার রঙ্গিন স্বপ্ন যেন এক নিমেষে মিলাইয়া যাইতে চায়। নূতন ট্রাম-বাস-বিজলির আলো-দেখা চোখের নেশা কাটিয়া যায় এইটুকু সময়ের মধ্যেই। পোস্তা-বাঁধান ঘর হইলে কি হইবে, ঘরের ভিতরে কিসের একটা ভ্যাপসা গন্ধ। সামনেই পচা নর্দমা দিয়া রাজ্যের নরক যেন গলিয়া পড়িতেছে। ঘেন্নায় গা বমি-বমি আরম্ভ হয়, সুন্দর-বৌর। তাহাদের রূপসী গাঁয়ের রৌদ্র-ভরা উঠানের ছবিটা মনে পড়ে বারে বারে।

এখানে আশে পাশে গাছ গাছড়া একটাও নাই। যে দিকে তাকাও শুধু খোলার চালা।

যমুনা, ঠান্‌দি কি করিতেছে এখন, কে জানে। তাহাদের

তুলসীতলায় আজ আর কেহ বাতি দিতেছে না। মনটা কেমন যেন করে একটু।

এই বেলাও সিন্ধুবালা মদনের ঘরেই রাঁধে। ভাল ভাল জিনিসই জোগাড় করিয়াছে সে এই তুর্দিনেও। মাছ কিনিয়াছে একটা আস্ত ইলিশ। চকচক করে প্রতাপের ম্যালেরিয়া-ধরা চোখগুলি। কতকাল পরে তাহারা আজ এমন পেট ভরিয়া ভাত খায় সুন্দর-বৌর হাতের ভাল রান্না দিয়া! এতক্ষণে মনটা অনেক হালকা হইয়া আসে; যাক্, ঘরটা ঘুপসি হইলে কি, প্রাণ ত বাঁচিবে খাইতে পাইয়া।

মদন একটা বিলাতী-তুধের কৌটা দেয় সিন্ধুবালার হাতে তাহার ছেলের জন্য। বেশী বয়সের সন্তান, বুকে কি আর কিছু আছে। ছেলেটা সারাক্ষণই ট্যাঁ ট্যাঁ করে।

পরের দিন 'ভোঁ' পড়ার সঙ্গে ডাকিয়া লইয়া যায় মদন প্রতাপ আর সূর্যকে—তাহাদের মনিবের কাচের ফ্যাক্টরীতে।

তুপুরবেলা সুন্দরবৌ চাউল ধুইতে গিয়া দেখে, কলের নীচে একটা বালতি পাতা রহিয়াছে, সামনে দাঁড়ান বছর সাতেকের একটি মেয়ে। অতটুকু মেয়ে কি আর জল পাম্প করিতে পারে? সিন্ধুবালা বলে, "সর খুকি, আমি পাম্প কইরা দেই।" কল পাম্প করিতে করিতে আবার বলে, "কোনদিকে ঘর তোমাগো।"

"ঐত ঘর দেখা যাচ্ছে।"

"তাইলে ত আমাগো কাছেই থাক। আর কে আছে বাড়ীতে।"

"মা আর ভাই। বাবা গেছে কাজে।"

মেয়েটি অতিকষ্টে টানিয়া লইতে থাকে বালতিটা। মাথাটা কাৎ হইয়া গিয়াছে বালতির ভারে। সিন্ধবালার মায়া হয় দেখিয়া।

"দেও, খুকি আমি দিয়া আসি তোমার বালটিটা।" বলিয়া হাত হইতে তুলিয়া লয় জলের বালতি।

"কি নাম তোমার ?"

"সিন্ধু।"

"তাইলে ত তুমি আমার সই।"

মেয়েটি অবাক হয়, এই নূতন-আসা মানুষটির কথা বলার ভঙ্গীতে।

দুপুরবেলা ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া যায় সে তাহার ছোট্ট সইয়ের বাড়ী। একখানা ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কি থাকা যায় সারাদিন! কথা বলার জন্য প্রাণটা হাঁসফাঁস করে। তাহাদের রূপসীর উঠানে এতখানি বেলার মধ্যে কয়বার মানুষের ছায়া পড়িত।

"কই গো আমার সই কই ?"

সিন্ধুর মা, কমলা বাহির হয়।

"এক জায়গায়ই থাকুম যখন, একটু আলাপ করতে আইলাম, দিদি।"

"বেশত। এস, ঘরে এসে বোস।" হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে।

ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতিয়া দেয় কমলা। মেয়ের মুখে আগেই শুনিয়াছে সে সিন্ধুবালার কথা।

কমলার স্বামীও কাজ করে ঐ একই কাচের ফ্যাক্টরীতে। শুনিয়া আরও খুশি হয় সিন্ধুবালা।

রাত্রিতে স্বামীর কাছে গল্প করে কমলা সিন্ধুবালার সম্বন্ধে।

"খুব আলাপী মানুষ। এরই মধ্যে মেয়ের সঙ্গে সই সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে।"

কিন্তু পরেশ খুশি হয় না বিশেষ। মদনের আত্মীয় ওরা। কেমন লোক হইবে বলা যায় না।

কিন্তু সিন্ধুবালা দিনে অন্ততঃ দশবার আসে কমলার ঘরে।

"কি রাঁধতাছো সইয়ের মা। ওমা! পুইশাকেও আবার মিষ্টি দাও তোমরা?" হাসে সিন্ধুবালা।

বিকালবেলা আরেকবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যায়, "কলাপাতা পাওয়া যায় না, দিদি, এই দেশে। কচুর লতি কিন্যা আনছে দেওরে, লতিপাতরি ভালবাসে।"

"কচুর লতিপাতরি। সে আবার কেমন পদার্থ হ'বে?" বিস্ময়ে চোখ বড় হইয়া উঠে কমলার।

সিন্ধুবালা রান্নার প্রণালী শিখাইতে আরম্ভ করে।

"কিন্তু কলাপাতা না হইলে ত হইবে না।"

"কলাপাতাও কিনতে পাওয়া যায়"।

"কলাপাতাও কেনন লাগে?" অবাক হয় গ্রামের বৌ।

কয়দিনেই সিন্ধুবালা ছোট্ট বস্তিটুকুর প্রায় সব ঘরের মেয়েদের সঙ্গেই আলাপ জমাইয়া ফেলে।

কোণের ঘরের বীরুর বৌকে ডাকিয়া বলে, "আস বৌ তোমার চুলটা বাইন্ধা দেই। আমাগো গ্রামে আমার হাতের চুল বান্ধা পছন্দ ছিল সকলের।"

চুল বাঁধা শেষ করিয়া সরস্বতীর মার রান্নাঘরে একবার উঁকি মারিয়া আসে।

"দিদির ঘরে একখান আখা পাইতা দিয়া যামু। সই-এর একটা চিহ্ন থাকবো।"

"আখা আবার কি গো, মেয়ে?"

"চুলা গো চুলা। উনান, না কি কয়।" হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে সুন্দর-বৌ।

সুকল্যাণের বিচারের রায় বাহির হইয়াছে, দশ বৎসর কারাদণ্ড। তারাসুন্দরী ভাঙিয়া পড়ে। নগেন্দ্রশেখরের ভিতরটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—নূতন করিয়া বেদনা বোধের যেন শক্তি নাই স্নায়ুতে। তাহার আজন্মের সাধনা—তাহার গ্রাম, তাহার স্কুল, আশ্রম, সব যেন চোখের উপর ধসিয়া পড়িতেছে! ইহাত তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

দুর্ভিক্ষের করাল স্পর্শে গ্রামের প্রাণ-প্রদীপই নিবিয়া গিয়াছে। স্কুলে ছাত্র সংখ্যা কমিয়া অর্ধেক দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ের মাহিনাও অর্ধেক হইয়াছে।

চির-অভ্যাসমত স্কুলের প্রথম ঘণ্টায় সমস্ত ক্লাসের বারান্দা দিয়া এক বার ঘুরিয়া দেখে প্রধান শিক্ষক।

স্কুলের ছাত্রদের সেই কলরব আর নাই। ছাড়া-ছাড়া শূন্য বেঞ্চিগুলি করুণ দীর্ঘশ্বাসে ভরা।

মাষ্টার মহাশয়দের চোখে দুশ্চিন্তার ঘনছায়া। নিরুৎসাহ স্বরে বুঝাইয়া যায় পলাশীর যুদ্ধ।

খাতা দেখার ফাঁকে ফাঁকে অর্ধ-মৃত-স্ত্রী-পুত্র কন্যার কংকালসার মূর্তিগুলি ভাসে চোখে।

অথচ পূর্বে বুঝাইতে কত কবিতা আবৃত্তি করিয়া এই পলাশীর যুদ্ধের পড়া বুঝাইয়াছে।

কোথায় গেল সে উদ্দীপনা, সে বিপুল আগ্রহ! শিক্ষকের জীবনের আজন্ম সাধনা!

লাইব্রেরী ঘরের সামনে দপ্তরী ঝিমাইতেছে। পাঁচমিনিট দেরি করিয়াই হয়তো টিফিনের ঘণ্টা দিল। ভ্রূক্ষেপ নাই আজ আর কাহারও।

টিফিনের সময় পত্রিকার উপর ঝুঁকিয়া পড়ে মাষ্টাররা দুনিয়ার খবর জানিতে। পত্রিকার মধ্যেই আছে তাহাদের জীবন-মরণ সমস্যার বীজমন্ত্র।

কোন জেলায় কত টাকা চাউলের মন, বাড়তি জেলার উদ্বৃত্ত চাউলগুলি ঘাটতি জেলায় আসিবে নাকি, সশংক জিজ্ঞাসা—চশমার পুরু কাঁচের আড়ালে নিষ্প্রভ চোখের তারায়। তারপর চলে আলোচনা।

"চোরাকারবারীদের ধরাইয়া না দিলে আর রক্ষা নাই।"

"ধরাইবা কার কাছে? চোরে চোরে মাসতুত ভাই। দারোগারাও কি আর এই সুযোগে কম লাল হইছে।" পরিতোষবাবু লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া ভিজা গামছাখানা সযত্নে জানালার উপর মেলিয়া দেয়। পাঁচমাইল দূর হইতে আসিতে হয় তাহাকে। পথে খাল সাঁতরাইয়া পার হইতে হয়। বিলাসপুরের সাঁকোটা ভাঙিয়া গিয়াছে একবছরের উপর। মেরামত করিবার লোক নাই গ্রামে। বিলাসপুর গ্রামত প্রায় নিশ্চিহ্ন। যাও বা অবশিষ্ট ছিল, ম্যালেরিয়ায় শেষ হইতে চলিয়াছে।

একখানা গামছা কাঁধে ফেলিয়া পাঁচমাইল রাস্তা হাঁটিয়া খাল সাঁতরাইয়া স্কুলের খাতায় নামটা বজায় রাখে বৃদ্ধ পরিতোষবাবু, পুরানো অঙ্কের মাষ্টার।

ধীরেনবাবু বলে, "শুনলাম, আমাদের হেডমাষ্টার মশাই-এর ভাই-পো, প্রকাশও নাকি বেশ কিছু করছে এই যুদ্ধের বাজারে।"

পরিতোষবাবু উত্তর দেয়, "একমাত্র ঐ ত শুধু টিইক্যা থাকার পথ। কণ্ট্রাক্টরীতে যে যে নামছে, সেই আজ কিছু কামাইছে। আরেক পথ যুদ্ধে নাম লিখান।" "আপনাদের গ্রামের নরেন মাষ্টারও যুদ্ধে গেছে, না। বাড়ীতে খরচ টরচ আসে নিয়ম মত?"

ধীরেনবাবু উত্তর দেয়, "গেছিলত। কিন্তু টিইকা থাকতে পারলো কই। তার সে মিলিটারীর চাকরিও গেছে না আজ দুই মাস যাবৎ। তার নামে নাকি গোপন রিপোর্ট গেছে—সে কম্যুনিষ্ট। এই অপরাধে তার চাকরি খতম।"

"তবে যে শুনি, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিত্রতা ব্রিটিশের।" "পত্রিকায় ত দেখি তাই। তবুও এই ব্যাপার। দেবা ন জানন্তি, আজ কালকার পলিটিক্সের রহস্য।"

"হেডমাষ্টার মশাইকে দেখি না যে।"

উত্তর দেয় হেড ক্লার্ক, "তিনি পোষ্টাফিসে গেছেন, রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ভাঙাইতে। মাসের শেষ, ওদিকে সবত ফাঁকা। মায়না দেয় নাকি ছাত্ররা।"

"মায়না দিব কে? আসে নাকি ছাত্ররা। বাঁইচা থাকলেত আসবো স্কুলে। ক্লাসে গিয়া বেঞ্চিগুলিরেই পড়াইতেছি, না ছাত্রদের পড়াইতেছি বোঝা যাইব না।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অঙ্কের মাষ্টার। পরিতোষবাবু উঠিয়া গামছাখানা তুলিয়া রাখে। টিফিনের ঘণ্টা পড়ে।...

ছুটির ঘণ্টাও পড়ে। মাষ্টার মশাইরা বাড়ী ফেরে দুশ্চিন্তায় ভারী মন লইয়া। রিজার্ভ ফণ্ড ভাঙাইয়া মাহিনা চলিতেছে—এভাবে আর কদিন?

ছুটির ঘণ্টা পড়ে। ছাত্ররা বাড়ী যায়। মাষ্টার মশাইরাও চলিয়া যায়। নগেন্দ্রশেখর তবু বসিয়া থাকে লাইব্রেরী ঘরে। সামনে ফুলের বাগান, জঙ্গল আর আগাছায় ভরা। তুলা ক্ষেতটা একেবারে ফাঁকা। মাষ্টারদেরই মায়না জোটে না, মালী রাখাত পরের কথা।

দক্ষিণে তাকাইলেই, চোখে পড়ে আশ্রমের চালাগুলি। বেড়াহীন চালাগুলি পড়িয়া আছে অতীতের করুণ স্মৃতিমাখা।

সুকল্যাণ ধরা পড়ার পরই আশ্রমে সিল্ পড়িয়াছে, বে-আইনী ঘোষণায়। তারপর একখানা একখানা করিয়া টিনের বেড়া, জানালা কপাট সব উধাও হইয়াছে। ভিটাগুলির উপর ঢেকি শাকের ক্ষেত জমিয়াছে, আর ব্যাঙের ছাতার সারি।

মুসলমান পাড়ার মেয়েরা আসিয়া শাক তুলিয়া লইয়া যায় আশ্রমের ভিটা হইতে। অন্নবিহীন ব্যঞ্জন দিয়া ক্ষুধা মিটাইবার আয়োজন চলে দুর্বল শিশু হাতে।

"মেচির শাক রাধবো বুঝি তোগো আউজকা। চাউল আনছে বুঝি তোর বা'জানে?" হালিমার বোন ক্ষুধার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সোনার মেয়েকে।

"চাউল নাই আউজকা কয়দিন না? কচু সিদ্ধ চলছে দুই সন্ধ্যা। এক সন্ধ্যা গেছে মিঠা আলু-পোড়া দিয়া। আউজকা একটু ফ্যান আনছে বাবুগো বাড়ীর থন। তাই দিয়া সেচির শাক সিদ্ধ খাওন হইব।" অদ্ভুতভাবে বলিয়া যায় সে। জিভ্‌টা জড়াইয়া আসে। আউশধানের ফ্যানাভাতের স্বপ্ন উঁকি মারে ছোট ছোট চোখগুলিতে।

জার্মানরা ক্রমশ পিছু হটিতেছে। তাহাদের কতদূর পর্যন্ত লইয়া

যাইবে রাশিয়া সেটাই আলোচনার বিষয় আজকের দিনে। লাইব্রেরী ঘরে পত্রিকা খুলিয়া মাষ্টার মহাশয়দেরও আলোচনার বিষয়ই আজ একমাত্র রুশজার্মান যুদ্ধ। পরিতোষবাবু ঠাট্টা করে হিটলার ভক্ত জিতেন বাবুকে।

"কই, জিতেনবাবু, আর্য-সন্তানের সে বীর্য এখন গেল কই ?"

জিতেনবাবু তবু সুনিশ্চিত সুরেই উত্তর দেয়, "দেখুন হয় কি না হয় শেষ পর্যন্ত। এখনও বলা যায় না।"

ধীরেন বাবু ঠাট্টা করে, "বার্লিনে যে লাল নিশান উড়তে বসেছে, আর দেখবো কবে।"

নগেন্দ্রশেখরও যোগ দেয় আলোচনায়।

"যুদ্ধের এ মোড় আর ফিরবে না। তার কারণ, রাশিয়াই সত্যি-কারের দেশভক্তের দেশ। এমন আত্মত্যাগ পৃথিবীতে বিরল। ওরা মুখে বললে কি হ'বে যে তারা ধর্ম মানে না, কিন্তু আসলে ওরা জানেও না যে তারা কত বড় ধর্ম পরায়ণ। ধর্মের মূল কথাই হল' 'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেদের মধ্যে যে বিরাট শক্তি বিদ্যমান, তা' তারা জানে বলেই রাশিয়ানরা আজ হটাতে পারলো জার্মানের এ বিপুল বাহিনীকে। কম কথা নয়। গোটা ইয়োরোপের রসদ আজ হিটলারের হাতে। সেই হিটলারকেও পরাস্ত করলো এরা।"

নগেন্দ্রশেখর আবার বলে, "মৃত্যুকে ভয় করে না শিশুরা পর্যন্ত। স্ত্রী-লোকেরাও যুদ্ধ করছে, প্রাণ দিচ্ছে। তবু বলবো, এরা নাস্তিক ? শুধু মন্ত্র জপলেই আস্তিক হয় না।"

ভোরের রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে বাহির-বাড়ীর বারান্দায়

একটু একটু শীত পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নগেন্দ্রশেখর বাহিরের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া একখানা রাশিয়ার বই পড়িতেছে গভীর মন দিয়া। আমেরিকার পর্যটকের লেখা।

বিস্ময়কর শক্তিমান সমাজের কাঠামো। এতটুকু ছিদ্র রাখে নাই সেখানে শয়তানের চোরা-পথের সংকেত জানাইয়া। গোড়াতেই এমন কঠোর ব্যবস্থা না করিলে কি আর টিকিতে পারিত এ শিশুরাষ্ট্র? কয়দিনেরই বা কথা। এতকাল নগেন্দ্রশেখর সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বড় বড় নেতাদের গুলি করিয়া হত্যা করাটা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু এখন বুঝিতেছে, ঐ রকম কঠোর পন্থা না লইলে সোভিয়েট আজ এতবড় শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারিত না।

নগেন্দ্রশেখর মনে মনে উচ্চারণ করে, "ঠিকই করেছিল, রাশিয়া ঠিকই করেছিল।" ও রকম কঠোর ব্যবস্থা লইতে পারিলে এদেশও টিকিয়া যাইত। চোরাকারবারের বিষে ভারতবর্ষের অস্থিতে পচন ধরিয়াছে। এইবার গলিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য, তার নিজস্ব সম্পদ, সবই এইবার ধ্বংস হইয়া যাইবে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নগেন্দ্রশেখর।

ছোট ছোট একপাল ছেলে-মেয়ে পিতলের ঘটি রাখিয়া যায় রান্নাঘরের সামনে ফ্যানের প্রত্যাশায়।

(তারাসুন্দরী একজনের মত চাউল বেশী লয় রোজই। কিছু কিছু ভাত ও ফ্যান একসঙ্গে ঢালিয়া দেয় ঐ পিতলের ঘটিগুলিতে। কোন কোন দিন নিজের ভাতটুকুও দিয়া দেয়। বুকটা যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—কি ভীষণ দুর্দিন! ঘরে ঘরে অনাহারে মৃত্যু আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই হাড়গিলা শিশুগুলি টিকিয়া থাকিবে কি এই ফ্যানটুকুর জোরে। ঘটিতে ফ্যান ঢালিতে ঢালিতে ভাবে তারাসুন্দরী।)

ভাত খাইতে বসিয়া টপটপ করিয়া চোখের জল পড়ে ভাতের থালায়। ভাত খাইতেও লজ্জা করে। সারাদিন থাকিয়া থাকিয়া সুকল্যাণের কথা মনে পড়ে। সুন্দর উজ্জল একহারা চেহারা—তীক্ষ্ণ চঞ্চল দুটি চোখ !

কল্যাণরা বাহিরে থাকিলে হয়তো এমন হইত না, ভাবে তারাসুন্দরী। কি ব্যথা, কি অসহ্য ব্যথা বুকের ভিতরে। স্বামীর নিরানন্দ বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাইতে আর পারে না। ঠাকুর ঘরে গিয়া পূজার আয়োজন করিতে করিতে পদ্মার কথা মনে পড়ে। নিজের গর্ভধারিণী মা আর ভাইও তার সঙ্গে সম্পর্কে রাখে নাই। প্রকাশও এমন স্বার্থান্ধ হইয়া উঠিল !

প্রকাশের ব্যবসা নাকি খুব ভাল চলিতেছে। আবার এই গ্রামেরই জমিদারদের কাচের ফ্যাক্টরীতে ম্যানেজার হইয়াছে সে।

নগেন্দ্রশেখর গম্ভীর হইয়া বলে, "তার নাম আর আমার কাছে কোর না তোমরা।"

তাহারই ভ্রাতুষ্পুত্র, তাহাদের চৌধুরী বাড়ীর ছেলে, শম্ভুনাথের পৌত্র—আর সে করিতেছে চোরাকারবার! মাষ্টার মহাশয়রা আলোচনা করে।

নগেন্দ্রশেখর লজ্জায়, অভিমানে, ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। সুকল্যাণ ব্যথা দিয়াছে তাহাকে, তবু সে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের গৌরবে মহীয়ান।

পদ্মা আঘাত দিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে আছে মানব ধর্মের স্নিগ্ধতা। শশাংক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তবু তাহার আছে নীতির উদার বৈশিষ্ট্য। তাহারা আজ খাটিতেছে গ্রামে, গ্রামে, দেশকে

বাঁচাইবার জন্য অজস্র চেষ্টায়। অস্বীকার করার উপায় নাই তাহাদের এ প্রচেষ্টার সততাকে।

কিন্তু প্রকাশ? এ কি করিতেছে সে।

সহস্র শিশুর প্রাণবলি দেওয়া দানবদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে সে শুধু ধনী হওয়ার উন্মত্ত লালসায়। এ অঞ্চলের চাউল রপ্তানীর "সোল্ এজেন্সী" লইয়াছে নাকি সে ঐ বদমাইস সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে একত্রে।

আগুন হইয়া উঠে নগেন্দ্রশেখর একদিন পিতলের ঘটি হাতে শিশুদের ক্রমবিলীয়মান সংখ্যাগুলি গুণিতে গুণিতে।

"কিরে, আজ যে তোরা মাত্র পাঁচজন।"

"মইরা গেছে পূবের ঘরের মাইয়া-পোলা। মালো পাড়ার কেষ্টাও মরছে কাউলকা।"

"রাধুও" শুষ্ক গলায় জবাব দেয় আরেকটি শিশু।

নগেন্দ্রশেখর হঠাৎ কি কারণে গর্জিয়া উঠে, "বড়লোক হবি। কাঠের ফারনিচার দিয়ে ঘর সাজাবি। বাড়ী করবি, গাড়ী করবি। কিন্তু তোর দেশ? দেশ যে হারাবি তাতে ব্যাটা। তা একবারও ভাবলি না? কতকগুলি কাঠ আর ইঁটের স্তূপই তোর কাছে বড় হ'ল? আর এই রক্তমাংসে গড়া, এই নিষ্পাপ কচি প্রাণগুলি তুচ্ছ হয়ে গেল? পোকা মাকড়ের মতই তুচ্ছ তোর কাছে?"

বারান্দায় পাইচারী করিতে থাকে নগেন্দ্রশেখর। ভয়ংকর গম্ভীর মূর্তি।

শিশুরা ভীত হইয়া উঠে। অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে—ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে।

ঐ ফ্যানটুকুও বোধহয় আর দিতে চায় না বাবু—তাই এত চেঁচাইতেছে, তাহারা।

তারাসুন্দরী স্বামীর দিকে তাকায় অপরাধী-চোখে। কি লজ্জায় আবার ভাতও রাঁধিতেছে সে।

উঠানে আসিয়া বলে, "তোরা আজ এখানেই ভাত খাবি। বুঝলি ?"

এক মুহূর্তে সব কটি চোখ সুইচটেপা—বাতির মত জলিয়া উঠে। ভাত, ভাত খাইবে তাহারা আজ বাবুর বাড়ীতে। কত মিষ্টান্ন, খিচুরী প্রসাদ খাইয়াছে, তাহারা এই বাবুর বাড়ীর উঠানে বসিয়া। সে সবত ভুলিয়া গিয়াছে কতকাল। মনেও পড়ে না, সে-সব দ্রব্যের স্বাদ।

তারাসুন্দরী ভবিষ্যতের চিন্তা ভুলিয়া চাউল বাহির করিয়া আনে ভাঁড়ার হইতে, ভাত, রাঁধে, ডাল রাঁধে। তারপর কলা-পাতায় পরিবেশন করে শিশুদের গরম ভাত। গরম ভাতের ধোঁয়ায় ঢাকিয়া যায় শিশু চোখের কালিমা। নগেন্দ্রশেখরের মুখে হাসি দেখা দেয়।

বহুকাল পর তারাসুন্দরী দেখিল, এ হাসি তাহার স্বামীর চোখে। এক অনাস্বাদিত তৃপ্তির স্বাদ যেন পাইল তাহারা আজ। ঠাকুরের প্রসাদ ত কতবার কত তিথি উপলক্ষ্যে তাহারা বিতরণ করিয়াছে এই দরিদ্র শিশুদের। কিন্তু আজকের এ মুহূর্তস্থায়ী আনন্দে উপলব্ধি করে কি এক অপূর্ব শিহরণ। ইহাতে নাই ধনী-চিত্তের করুণার বিলাস, নাই সুপ্ত যশাকাংখার মোহ, নাই দরিদ্র-সেবার তৃপ্তি। এ শুধু মুমূর্ষু মানব শিশুর চিত্তে ক্ষণিকের জন্য প্রাণের আলোক দান।

শিশু চিত্তের সে অন্তিম আনন্দ রেখার স্বচ্ছছায়া পড়ে দুইটি পৌঢ় মুখ-দর্পণে।

পাগল হইয়া গিয়াছে আজ পৃথিবীটাই। একদল ক্ষমতার জন্য, অর্থের জন্য, জীবনের ভোগের জন্য পাগল হইয়া গিয়াছে; এত বড়

স্বর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া না হইয়া যায়! যুদ্ধ জিইয়া থাকিতে থাকিতেই করিয়া লইতে হইবে, যাহা কিছু করণীয়। দেশ, কাল, সৎ, অসৎ, কোনও বিচারশক্তি নাই আর এ বিকৃত, উন্মাদ দৃষ্টিপথে। শুধু আছে টাকা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, শেয়ার মার্কেট, আর কারবারী ফিকির।'

ম্যানেজার, ডিরেক্টার, ঠিকাদার, জোতদার হইতে আরম্ভ করিয়া কেমিষ্ট, সাংবাদিক, সাহিতিক, বেয়ারা বয় মতিচ্ছন্ন-সর্বহারা কেহই *বাদ যায় নাই এই উন্মাদ পাপচক্র হইতে।*

*চিৎকার উঠিয়াছে মর্মস্থল হইতে, "টাকা চাই, টাকা চাই—* ক্ষমতা চাই। আরও টাকা, আরও ক্ষমতা।"

আরেক চক্রের উন্মাদ যাহারা, তাহারাও এক আত্মত্যাগের উন্মত্ততায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। তাহাদের আকুল ক্রন্দনে দিগ্‌বলয়ে কম্পিত প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে—"বাঁচাও—বাঁচাও। এ মহীয়ান দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা কর।" দিশাহারা ব্যাকুলতায় পাগল হইয়া গিয়াছে তাহারাও।

সুপ্রিয় আসিয়াছে, এম এ পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা। আর কয়মাস পরেই পরীক্ষা। অরুণাভ বলে, "আমাদের এইখানেই থাক। এই কয়মাসের জন্য আর মেসে গিয়ে কি করবি।"

স্থপ্রিয় রাজী হয়। ছাদের উপরের ছোট্ট কোঠাখানা দখল করে সে বই খাতাপত্র লইয়া। ছাদের অপর প্রান্তে একটা টালির রান্নাঘর। স্থপ্রিয় পড়িতে পড়িতে দেখে রন্ধনরতা পদ্মাকে। জলের ব্যবস্থা নাই উপরে। কলসী করিয়া জল তোলে পদ্মা

স্থপ্রিয় ডাকে পদ্মাকে, "শোন, পদ্মাবতী।"

পদ্মা আসে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে তখনও।

"কয় কলসী জল তুলেই এই অবস্থা! একেবারেই ঠুনকোদেহ।" হালকাস্থরে বলে স্থপ্রিয়। কিন্তু মনে মনে ভাবে, পদ্মার চেহারা যেন অনেকখানি কৃশ হইয়া গিয়াছে এই কয়মাসে। একটু মায়া লাগে কেন জানি তাহার, পদ্মার জন্য।

"ডাকলে কেন, সেটা আগে বল।" বলে পদ্মা।

"এমনিই। বস গল্প করি।"

"কি আমার আবদার। তারপর জঠরাগ্নি যখন জলে উঠবে তখন ?"

"কি আর হ'বে। দোকান থেকে রুটি কিনে খাব। রান্নাটা এমন কিছু বড় কাজ নয়, কঠিন কাজও নয়। তার চাইতে অনেক বেশী জরুরী কাজ আছে পৃথিবীতে।"

"সেই জরুরী কাজটা কি তোমার সাথে বসে গল্প করা ?"

"গল্প না কর, একটা গান শুনাও।" নির্বিকার স্থরে বলে স্থপ্রিয়।

"কোনদিন শুনেছ আমার গান এখানে এসেছ পরে।"

একটু যেন ভিজিয়া উঠে গলার স্বর। স্থপ্রিয় লক্ষ্য করে। তবু ঠাট্টার স্থরেই বলে, "তাইত ভাবি, পদ্মাবতীর গান থেমে গেল কেন ? কি দুঃখ পদ্মাবতীর।" পদ্মা উঠিয়া পড়ে, "এখন আর বসলে ডাল পুড়ে কয়লা হ'বে।"

দুপুর বেলা রান্নাঘরে ঢুকিয়া অবাক হয় পদ্মা। দেখে, সব জলের পাত্রগুলিই পূর্ণ। 'নিশ্চয়ই সুপ্রিয়ের কাজ এসব'—মনে মনে ভাবে। কেমন একটা অস্পষ্ট ব্যথায় ভিজিয়া উঠে মনটা, কেন এত ভাবে সুপ্রিয় তাহার জন্য।

কাজের এক ফাঁকে সুপ্রিয়ের ঘরে ঢোকে পদ্মা।

"জল টানতে কে বলেছিল।" স্নেহার্ত অভিযোগ জানায় সে।

"বলবার মত কেউ থাকলেত দুঃখই ছিল না, পদ্মা।"

পদ্মা অবাক হয় সুপ্রিয়ের এ কণ্ঠস্বরে। এক মুহূর্তে, মাত্র ঐ কয়টি কথায়, পদ্মা এ হাস্য-কৌতুকে-ভরা সুন্দর রসিক মানুষটিরও অন্তরের আর্ত ব্যথার স্থানের সন্ধান জানিয়া ফেলে। কেহইত নাই সুপ্রিয়ের। মাতা-পিতৃহীন আত্মীয় পরিজনহীন এক অশান্ত বালক আপন স্বভাবের স্নিগ্ধতায় আপন করিয়া ধরিতে চাহিতেছে দূরের মানুষকে।

সামান্য দুটি কথা অনেকখানি নিকটে টানে পদ্মাকে।

একদিন একতলা হইতে জল তুলিতে গিয়া পা পিছলাইয়া পড়ে পদ্মা সিঁড়ি হইতে। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভিতরে ভীষণ টান পড়ে। মনে হয়, যেন একটা রগ ছিড়িয়া গেল। বাড়ীতে কেহ নাই। অতি কষ্টে সামলাইয়া লয় সে, কাহাকেও কিছু বলে না সারাদিন। কিন্তু বিকালের দিক হইতে পেটে অসহ্য বেদনা আরম্ভ হয়। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছে না যেন সে যন্ত্রনা। মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া উঠে, অরুণাভ লক্ষ্য করে।

"অসুখ করেছে নাকি পদ্মা, এত 'পেইল' লাগছে কেন।" পদ্মা ততক্ষণে শুইয়া পড়িয়াছে। আর নড়িবার শক্তি নাই, না জানাইয়াও উপায় নাই। অরুণাভ সুপ্রিয়কে পাঠায় তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাড়ী।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া ভীত হইয়া উঠে। সন্তানসম্ভবা পদ্মা। অবস্থা খুব খারাপ।

ডাক্তার আড়ালে ডাকিয়া লইয়া জানায় অরুণাভকে "ভয়ের কারণ আছে। শেষ পর্যন্ত সন্তান টিকবে, মনে হয় না। তা'হ'লে ওরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। তার চাইতে আগেই ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।"

অরুণাভ ভীত হইয়া উঠে ডাক্তারের কথায়। অবাক হইয়া ভাবে একটু, সন্তান আসিতেছে, তাহারই সন্তান!

"কিন্তু পদ্মা যদি না-ই বাঁচে।" উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে অরুণাভ। যে ভাবেই হউক পদ্মাকে বাঁচাইতে হইবে। ডাক্তারের প্রস্তাবে কিন্তু পদ্মাকে রাজী করান যায় না।

"অসম্ভব। প্রাণ থাকতে এ কাজ আমাদ্বারা সম্ভব হবে না।" তারপর একটু তিক্ত সুরেই বলে পদ্মা, "রাশিয়ার কাছে থেকে তোমরাও শিখেছ নাকি এসব দুর্নীতি।"

অরুণাভ স্তম্ভিত হইয়া যায় পদ্মার কথায়। তবু শান্ত সুরেই উত্তর দেয় "রাশিয়ার মত সন্তানের কল্যাণের কথা আর কোনও দেশ এত ভাবে কি, পদ্মা? তুমি আজ সুস্থ নও, তাই একথা বলতে পারলে। তাই, এ নিয়ে আজ আর আলোচনাও করবো না তোমার সঙ্গে।"

অরুণাভ বাহির হইয়া যায়।

পদ্মা চুপ করিয়া ভাবে। রাশিয়ার সমাজের কাঠামোকে ত শ্রদ্ধাই করে সেও, তবু কেন ইচ্ছা করিয়াই এত বড় ক্রূর মিথ্যা কথাটা বলিল

সে, তাহারই সবচাইতে প্রিয় ব্যক্তির কাছে। কেমন যেন এলোমেলো হইয়া যাইতেছে সবকিছু।

তখনকার মত সারিয়া উঠে পদ্মা। কিন্তু একমাসও কাটে না, তিন মাসের একটি অপূর্ণ সন্তান প্রসব করিয়া আবার শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে সে।

বাড়ীতে মেয়ে কেহ নাই। বিপাশা শিশুশিক্ষার ট্রেণিং-এ আছে মাদ্রাজে। ইরা আসিয়া বলে অরুণাভকে, "আমিই থাকি এখানে, যে কদিন পদ্মা ভাল না হ'চ্ছে।"

অরুণাভ খুশি হয়। মেয়েলী কাজ করায় একেবারেই অপটু সে বা সুপ্রিয় দুইজনেই।

কিন্তু পদ্মা খুশি হয় না এ ব্যবস্থায়। অবাঞ্ছিত লোকের পরিচর্যা গ্রহণ করা পীড়াদায়ক রোগীমাত্রেরই। তবু মুখে কিছু প্রকাশ করে না পদ্মা। মনে মনে বিরক্ত হইয়াই থাকে সে।

পদ্মা সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বেশী হাঁটাচলা নিষেধ এখনও। এভাবে পর-নির্ভর জীবন অসহ্য হইয়া উঠে। কেমন যেন বিচ্ছিন্ন মনে হয়, নিজেকে, স্বামীর সঙ্গে, স্বামীর পরিজন, বন্ধুদের সঙ্গে। মনে হয় যেন, জোর করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে সে উহাদের জগতে—কমরেডদের জগতে। কি মনে করিয়া নিজেরই হাতের বোনা ছোট্ট একটি ক্রুশের ফ্রক কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া ফেলে। আবার পর মুহূর্তেই কাঁদিতে আরম্ভ করে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া। যেন একটা সদ্যজাত কচি শিশুকেই হত্যা করিয়াছে সে। অসহ্য, অবুঝ বেদনার চাপ বুকের ভিতরে।

সুপ্রিয় ঘরে ঢুকিয়া দেখে, মেঝের উপর ছড়ান কাটা ফ্রকের শুভ্র ফেনার মত টুকরাগুলি।

"অমন স্থন্দর জিনিসটা কেটে ফেললে ?"

তাকাইয়া দেখে, পদ্মা কাঁদিতেছে নীরবে।

"কি হয়েছে, পদ্মা।" কোমল স্বরে ডাকে স্থপ্রিয়।

"কিছু ভাল লাগে না, স্থপ্রিয়। জীবনটা বড় ফাঁকি মনে হয়।"

"নিজের কথা বড় বেশী ভাব, তাই এত দুঃখ পাও। . পরের কথা, সবার কথাই ভাব যদি, দেখবে জীবনটাই সব চাইতে খাঁটি।"

পদ্মা উত্তর দেয় না। চুপ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে চায় যেন স্থপ্রিয়ের কথাগুলি।

স্থপ্রিয় ভাবে আত্মমুখীন মানুষেরা দুঃখ পায় বড় বেশী। এই কয় দিনেই লক্ষ্য করিয়াছে সে, পদ্মার ভিতরে একটা আত্মনিপীড়নের প্রবৃত্তি বড় বেশী। বড় দুঃখবিলাসী মেয়ে সে।

তবু কেন জানি কষ্ট হয় তাহার পদ্মার জন্য। পদ্মার বিষণ্ণ মুখখানা বারে বারে নাড়া দেয় মনে। স্থপ্রিয় অবাক হইয়া ভাবে, তাহার মত ছেলের মনেও পদ্মার এ বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে। এ বড় সংক্রামক রোগ। উড়াইয়া দিতে চায় স্থপ্রিয় এ চিন্তা। একখানা বই খুলিয়া বসে।

বিকালবেলা অরুণাভ বাহির হইবার জন্য জামাটা গায়ে দিয়া পদ্মার ঘরে ঢোকে থার্মোমিটার লইয়া।

পদ্মা তাকাইয়া দেখে। গম্ভীর হইয়া বলে সে, "বের হ'চ্ছ।"

"একটা মিটিং আছে।" অরুণাভ উত্তর দেয় শান্তস্বরে। পদ্মা কি

একটু ভাবিয়া প্রশ্ন করে, "আচ্ছা আমাকে নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়ে গিয়েছ তোমরা, না ?"

অরুণাভ বিস্মিত হইয়া তাকায় তাহার মুখের দিকে। কিন্তু ঠাট্টার সুরেই উত্তর দেয়, "অসুবিধায় পড়েছি-ই ত। এখন তাড়াতাড়ি ভাল হও, তবেত সুবিধা হয়।

পদ্মা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠে। থার্মোমিটারটা ছুঁড়িয়া ফেলে মেঝেতে। "আমার প্রতি আর দয়া না দেখালেও চলবে তোমাদের। কেউ তোমরা এসো না আমার ঘরে।"

অরুণাভ বিস্মিত হয় তাহার এ অদ্ভুত আচরণে। কিন্তু কোনও উত্তর দেয় না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে জানালার ধারে।

পদ্মা আরও উত্তেজিত হয় তাহার এ নীরবতায়।

"তোমার প্রবঞ্চনা আর অস্পষ্ট নয় আমার কাছে। আমাকে গ্রহণ করে এ দয়াটুকু না দেখালেও চলতো তোমার।"

পদ্মা যেন মরিয়া হইয়া আঘাত করিতে চায় আজ অরুণাভকে এক নূতন ধরনের আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে সে—প্রিয়জনের মনে আঘাত দেওয়ার এক তীব্র আত্মঘাতকের আনন্দ।

অরুণাভ স্তম্ভিত হইয়া যায় পদ্মার কথায়। মৃতের মত ফ্যাকাশে হইয়া উঠে মুখখানা, পদ্মা লক্ষ্য করে।

ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া যায় অরুণাভ। পদ্মা শুইয়া-শুইয়া ভাবে, এ কি করিল সে? যে প্রকাণ্ড ফাটল সৃষ্টি করিল সে, এই চেতনা-বিলুপ্ত মুহূর্তের মাঝে, এ ফাটল জীবনে জোড়া লাগিবে কি?

সে কি জানে না, তাহার প্রতি অরুণাভের দিনান্তের সামান্য একটি তুচ্ছ ঘটনাও কত গভীর অনুভূতির ইঙ্গিতভরা; তবু স্পর্দ্ধার সঙ্গেই জানাইল সে, প্রবঞ্চনা করিতেছে অরুণাভ।

আশ্চর্য মানুষের আচরণ। দুর্বোধ্য উহা নিজের কাছেও।

পদ্মা যেন আজকাল স্বামীর নিকট কমরেডদের সম্বন্ধে কটাক্ষ করিতে কি এক হিংস্র আনন্দ উপভোগ করে। সুকল্যাণ আছে, কারাপ্রাচীরের ভিতরে, ভুলিতে পারে না সে একমুহূর্তের জন্য।

মিথ্যা জানিয়াও বিদ্রূপ করে, কদর্থ করে সাম্যবাদীদের দৈনন্দিন চালচলনকে, জীবনাদর্শকে।

অরুণাভ ব্যথিত হয়। সে ব্যথাত পদ্মারও বুকে ফিরিয়া আসে। তবু আরাম পায় সে তাহার প্রিয়তমকে ক্ষতবিক্ষত করিতে। আত্ম-নিপীড়নের এও একটি ধারা। জানে না তাহা পদ্মা। সে স্বামীকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে চায়। সাম্যবাদী অরুণাভকে ক্ষতবিক্ষত করিতে চায়। কিন্তু উহাতে যে তাহারই প্রিয়তম অরুণাভকেও আহত করিল সে, পদ্মা বোঝে না তাহা। অরুণাভের ম্লান মুখখানাই ভাসে চোখে। সারাটা বিকাল অনুতাপে পুড়িতে থাকে সে। সন্ধ্যার পর আসে অরুণাভ ওষুধ লইয়া।

পদ্মা নিবিড় অন্তরের ঘনস্পর্শমাখা হাতে ধরে অরুণাভের হাতখানা, "ক্ষমা করো আমাকে।" আর কিছু বলিতে পারে না সে।

অরুণাভ লক্ষ্য করে, পদ্মার ভিতরের মনটাও যেন আজ পরিষ্কার দুইটি স্তরে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটি মন ভাঙিতে চায়। সব কিছুই মিথ্যা মনে হয় তখন, জীবনটাই যেন একটা ছলনা মনে হয়। আরেকটা মন গড়িতে চায়। সুন্দর অন্তর্জ্যোতির আলোকে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে সে মন। গ্রহণ করিতে চায় সে জীবনকে পরম আগ্রহে। পদ্মার ভিতরের মনের এ দ্বন্দ্বই রূপ পায় তাহার আচরণে।

অরুণাভ ভাবে চুপ করিয়া, শুধু আবেগদ্বারা চালিত না হইয়া, চিন্তার যুক্তি দ্বারা যদি চালিত হইত পদ্মা, তবে সেও বুঝিতে

পারিত ধরিত্রীরই আজ প্রসব বেদনা উঠিয়াছে। এ বেদনা অনুভূত হইতেছে মানুষের নিভৃত হৃদয়ে। একটা সুন্দর কিছু গড়িবার আগে এ ব্যথাত ভোগ করিতেই হইবে মানুষকে।

কিছুদিন যাবং লক্ষ্য করে সুপ্রিয়, কি যেন কি একটা ঘটনা ঘটিতেছে তাহার মনে। একটা স্থায়ী অবসন্নতা চাপিয়া ধরিয়াছে মনে। পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কয়েক দিনের ভিতরই চলিয়া যাইবে সে গ্রামে।

শুইয়া শুইয়া ভাবে সুপ্রিয় পদ্মার কথা।

এমন কিছু বিশেষত্ব নাই, যা মানুষকে হঠাৎ চমক লাগায়, তবু কি এক অদৃশ্য আকর্ষণের প্রাণশক্তি লুকান আছে যেন ওর ভিতরে। বাহির হইতে বুঝিবার সাধ্য নাই—নিজেকে আড়াল করিয়াই রাখে সে অতি সাবধানে। কিন্তু তার ভিতরের মনটি প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধে সজাগ বড় বেশি! তাই এত কষ্ট পায় প্রতি পদে। খাপ-খাওয়াইতে পারিতেছে না সে তাই, নিজেকে তার চারপাশের দুনিয়ার মাঝে।

অরুণাভকে বলে সুপ্রিয়, "এ ভাবে চললেত বেশিদিন আর সুস্থ থাকবে না পদ্মা। তোমার আর একটু লক্ষ্য দেওয়া উচিৎ তার দিকে। চেষ্টা করে দেখ না একটু, ওর মনকে সুস্থ করতে পার কিনা।"

অরুণাভ জবাব দেয়, "ওর মনের সৃষ্টির সূত্রপাতেই যে গলদ রয়ে গেছে, এখন আর শুধরাবে না ও মন। আর চেষ্টাদ্বারা কি মন কখনও রূপ বদলায়। তাকে তার নিজস্ব স্বাভাবিক পথে যেতে দেওয়াই ভাল। পদ্মার শৈশবই দায়ী এ জন্য। শিশুদের সবচাইতে প্রিয় কে? মা। পদ্মার মুখে শুনিস কখনও তার মার কথা? ওকে

মূক করে দিয়েছে ওর শৈশবস্মৃতি। যার কাছে ওর শিশুমনের পাওনা ছিল সবচাইতে বেশি, তার কাছেই বিমুখ হ'য়ে ফিরে এসেছিল ওর কিশোরী মন। তার ফলে সমস্ত জীবনের মনের ধারাই এমন আত্ম-নিপীড়নের রূপ নিয়েছে। সারাজীবন ধরে এ জাতীয় মন তার দুঃখেরই সুরটি খুঁজে নেবে। এই হ'চ্ছে বিষাদধর্মী মনের ধারা। আমিত উপলক্ষ্য মাত্র।'

সুপ্রিয় মন দিয়া শোনে, কিন্তু তাহার মনে সায় দেয় না এ যুক্তি। মানুষের জীবনে এভাবে কখনও 'ফুলস্টপ' দিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু মুখে বলে, "তবু কিছু চেষ্টাত তোমার করা উচিৎ। কোনও সুন্দর জায়গায় পাঠিয়ে দেখতে পার, ওর মনের পরিবর্তন হয় কিনা। তাছাড়া শরীরের জন্যও ত দরকার।"

"তা'ত বুঝি। কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কি করে যে করি—তাই ভাবছি।"

"দেশ থেকে আনলেই পার কিছু। যে ভাবে সে টাকা ব্যয় হ'চ্ছে সেখানে, তার চাইতে অপব্যয় নিশ্চয়ই হ'বে না।" বলে সুপ্রিয়।

অরুণাভ লাল হইয়া উঠে সুপ্রিয়ের কথার ইঙ্গিতে। কলংকময় পিতৃপরিচয়! ফিউড্যাল ভূস্বামীদের পংকিল পদচিহ্ন ধরিয়া চলিতেছে আজও এই নিবু-নিবু বংশবাতিরা। উচ্ছৃংখলতা আর আত্মদম্ভ—দূষিত ব্যাধির মত ঘিরিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের দেহ-মন। পৈত্রিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বংশধরদেরই। তাহাকেও।

পদ্মার পুরী যাওয়া ঠিক হইয়াছে। শুইয়া শুইয়া সে একটা মাসিক পত্রিকা পড়িতেছে। সুপ্রিয় জানালার পাশে বসিয়া সিগারেট পোড়ায়।

নীচে রাস্তায় একটা মাটিওয়ালী বুড়ী ডাকিয়া চলিয়াছে, "মাটি লেবে গো, মাটি।"

একটা অলস আবহাওয়া ঘরে এবং বাহিরে। মেঘাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন আকাশ। সুপ্রিয় স্থির দৃষ্টিতে দেখে পদ্মাকে—তাহার ঘন পক্ষ্মাবৃত গভীর কালো চোখ দুইটি!

পদ্মা চলিয়া যাইবে। তার আগেই চলিয়া যাইবে সে, ঠিক করে মনে মনে। সে নিজেও বোঝে না, পদ্মার এই চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে কি যেন একটা ব্যথাতুর সম্পর্ক জমিয়া উঠিতেছে তাহার মনে। তাহার স্বভাবের সাথে ঠিক যেন খাপ খাইতেছে না মনের এই অস্বস্তিকর পরিণতি।

জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া হাতের আধপোড়া সিগারেটটা শেষ করে। তারপর নিজের মনেই একটু সুর টানে মৃদু গলায়—

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম—
কস্তুরী মৃগ সম।"

পদ্মার প্রবন্ধটা পড়া আর শেষ হয় না। এ গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সুররাজ্যে। সুপ্রিয় আবার আরেকটা সিগারেট বাহির করে পকেট হইতে। পদ্মা তাকাইয়া বলে, "গানটা শেষই কর না, বাপু, আমিও একটু শিখে রাখি সুরটা মনে মনে।"

কি চিন্তা করিতে করিতে সুপ্রিয় সম্পূর্ণ সুরটা একটু আওড়াইয়া লয় গুন গুন করিয়া। তারপর গলা ছাড়িয়া গায় গান। সে আবেগঢালা গম্ভীর সুরের তরঙ্গ উঁচু নীচু পর্দায়, কড়িতে কোমলে ঢেউ খেলিয়া যায়।

"এত দরদে ভেজা সুরে ত কখনও গায় না সুপ্রিয়" মনে মনে ভাবে পদ্মা। ক্ষণিকের জন্য যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

পদ্মা মনে মনে ভাবে, নিজেকে নিবিড়ভাবে নিকটে পায় মানুষ সুর-স্রোতের ভিতর দিয়া।

সুপ্রিয় গান শেষ করিয়া চুপ করিয়া থাকে একটু। আবার সিগারেটটা ধরাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার মন যে নিজের ভিতরেই ডুবিয়া আছে, দেখে পদ্মা। লক্ষ্য করে, সুপ্রিয়ের চোখের পাতায় নামিয়া আসিয়াছে কি গভীর ঘন ছায়া! গভীর হৃদয়াবেগের বিষণ্ণ কাতরতা চোখে মুখে। একটু বিস্মিত হয় পদ্মা, তবু মৃদু ঠাট্টার সুরে বলে "সুপ্রিয়, এত দরদ দিয়ে ত গাও না তুমি কখনও। মনে হ'চ্ছে ভাল-টাল বেসেছো কাউকে।"

সুপ্রিয় হাসে পদ্মার দিকে তাকাইয়া। স্নিগ্ধ, মধুর দুষ্টুমি মাখা হাসি। তারপর হাসিয়াই উত্তর দেয়,

"ঠিক বুঝতে পারছি না, পদ্মা।"

কিন্তু পদ্মা লক্ষ্য করে, এ ম্লান হাসির আড়ালে ছায়াপাত করিতেছে বড় বিষন্ন একটি মূর্তি। এক অ-বলা কথা ধরা দেয় এ নিষ্প্রভ হাসির অন্তরালে।

সুপ্রিয় আবার একটু চুপ থাকিয়া বলে, "পদ্মা আমি কিন্তু কালই চলে যাচ্ছি।"

পদ্মা আরও বিস্মত হয়। "হঠাৎ এ খেয়াল কেন?"

সুপ্রিয় কি যেন চিন্তা করিতে করিতে বলে, "এ খেয়াল কেন, সেটা না জানাই থাক পদ্মাবতী।"

পদ্মা শংকিত হইয়া উঠে মনে মনে। আর একটাও প্রশ্ন করিতে সাহস পায় না। যেন কুয়াশার পর্দা ঠেলিয়া ধীরে ধীরে এক অস্পষ্ট আলোকরশ্মি স্পর্শ করিতে চাহিতেছে তাহাকে। এ রহস্যময় আলোকরশ্মির তীব্রতা যে কি, জানে তাহা পদ্মা।

চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকে সে সুপ্রিয়ের দিকে।

সুপ্রিয়ের দৃষ্টি বহু দূরে। বিষণ্ণ মৌন মধ্যাহ্ন। বাহিরে দূরের বাড়ীগুলির আড়ালে নারিকেল গাছের মাথাগুলি নড়িতেছে বাতাসে। ঊর্ধে মেঘাচ্ছন্ন উদাস আকাশ। পাশের বাড়ীর ছাদের আলিসাতে কুজনরত কপোত কপোতী।

পদ্মার স্থির দৃষ্টি আরও স্থির হইয়া যায়।

অরুণাভ ঘরে ঢোকে, "ওষুধ খেয়েছ, পদ্মা?" শিশির দিকে তাকাইয়া বলে, "খাওনিত। এত ভুলো মন হ'লে চলে।" সুপ্রিয় মধুর দৃষ্টিতে দেখে অরুণাভকে। অরুণাভের মনের দৃঢ়তা, আশ্চর্য-রকমের সংযমী মনের বলিষ্ঠতার পরিচয়ই পাইয়াছে সে এতকাল। কিন্তু তাহারও ভিতরে ছড়াইয়া আছে ফল্গুনদীর মত এক স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী, তাহা সে জানিত না এতদিন।

পদ্মা একটু অভিযোগের স্বরে বলে, "সুপ্রিয় নাকি কালই চলে যাচ্ছে।"

অরুণাভ উত্তর দেয়, "ওর যদি এখানে ভাল না লাগে, তবে থাকবেই বা কেন।" সুপ্রিয় হাসিয়া বলে, "আবার বেশী ভাল লাগলেও চলে যেতে হয় অনেক সময়। অরুণাভ ঠাট্টার স্বরে বলে, "এ যে কাব্যের কথা হ'য়ে গেল, সুপ্রিয়।"

সুদূর্ঘ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে কতকাল। আর কি সে দেশে ফিরিবে না? যমুনা টিপ-কল হইতে জল লইতে

আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে আগাছায় ভরা সূর্যের সাধের বাগিচাটা।

কি যেন ভাবে সে তন্ময় হইয়া; কলসী ভরিয়া জল উছলাইয়া পড়িয়া যায়। তাহার চোখের তারা দুইটি স্থির হইয়া থাকে দূর বনরেখার দিকে। আগের সে চঞ্চলতা আর নাই। যমুনার মনেও ছাপ ফেলিয়া গিয়াছে এক অকাল বার্ধক্যের ছায়া। লক্ষ্যহীন, অবলম্বনহীন জীবন। সিঁথির সিন্দুর প্রায় মুছিয়া আসে, তবু নূতন করিয়া সিন্দুরের টিপ পরার আগ্রহ আর নাই।

এর চাইতে বিধবা হইলেও ভাল ছিল। অলক্ষ্যে বুকটা কাঁপিয়া উঠে—অমন কথা ভাবাও পাপ! তাহার সূর্যেরই হয়তো কোনও অমঙ্গল হইয়া যাইতে পারে। নিজের ঘর ছাড়িয়া, ভিটা ছাড়িয়া কেমন আছে সে, কে জানে।

মনটা কাতর হইয়া উঠে। যমুনা কলসী কাঁখে তুলিয়া অনিচ্ছুক পায়ে হাঁটে—বাড়ীর দিকে। অন্ধকার ঘরটায় ঢুকিলে আরও যেন মনটা খাঁ খাঁ করে। এ ঘর, ও ঘরের ভিটা খালি। একটা বছরের ভিতর কি মরণই লাগিল গাঁয়ে। ঘরকে ঘর খালি করিয়া দিয়াছে আকালে।

অথচ এই গ্রামেই নীল পূজার সময় কত আমোদ না হইয়াছে এককালে। কত ভিনগেরামের দল আসিয়া রাত কাটাইয়াছে তাহাদের বাড়ীতে। ঢাকের শব্দে অন্ধকার রাত হইতে সরগরম হইয়া উঠিত উঠানটা। কাক-পক্ষীরা পর্যন্ত তটস্থ হইয়া যাইত ঢাকের শব্দে। আর আজ চালাহীন, বেড়াহীন শুধু নেড়া মাটির ভিটাগুলি উঠানের উপর উঁচু হইয়া আছে।

শুধু তার ঠাকুরমার ভাঙা ঘরখানি কোনমতে দাঁড়াইয়া আছে এত

বড় বাড়ীটার মধ্যে। যমুনা, তাহার ঠাকুরমা আর হারাণীর ছেলেটা এইত তিন প্রাণী তাহারা বাড়ীর মধ্যে। আর সবাই শ্মশানঘাটে ছাইয়ের তলায়।

প্রতাপ কাকার বাড়ীটার দিকে যেন আরও তাকান যায় না। গা ছম্‌ছম্‌ করে। আগাছা আর জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে ভিটাটা। বড় বড় গুইসাপগুলি দিনদুপুরে ভিটাটার উপর ঘুরিয়া বেড়ায়। পিছনে অন্ধকার বাঁশঝোপে কাঠ-ঠোকরার একটানা শব্দ!

সৌদামিনী একলা-একলাই ঘোরে সূর্যদের খালি বাড়ীর উঠানে। গরুর গামলাটা মাটিমাখা অবস্থায় কাত হইয়া পড়িয়া আছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে যেন শূন্য মাটির গামলাটার দিকে তাকাইয়া।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বুড়ী।

যমুনা স্কুলের মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটে। গোচারণ ভূমিতে ছায়া নামিয়া পড়িয়াছে—যমুনা তাকাইয়া দেখে নিরাসক্ত চোখে, সম্মুখের মাথার উপরে ধূসর আকাশ।

মাঠের শেষে ছোট একটি জনতার ভিড়। কে যেন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে জোরে জোরে। দূর হইতে দেখে যমুনা, বক্তার বলিষ্ঠ উন্নত কপালের উপর অবিন্যস্ত চুলগুলি বাতাসে উড়িতেছে।

মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া কথা বলিতেছে সে।

প্রতিটি কথায়, প্রতিটি অক্ষরে যেন দেহের সমস্ত জোরটুকু ঢালিয়া দিতে চায়।

বড় ভাল লাগে কেন জানি যমুনার আজ এই সভার মানুষটির কথাগুলি—তাহার কথা বলার ভঙ্গিটি। অতীতের কি এক দুরন্ত স্মৃতি বহন করিয়া আনিতেছে সে, টানিয়া টানিয়া প্রতিটি কথা বলার সুরে সুরে।

যমুনার অবাক চাউনি স্থির হইয়া যায়। সামনেই একটা লাল নিশান পোঁতা। হালকা নিশানটা দক্ষিণের উদ্দাম বাতাসের টানে পতপত করিয়া উড়িতেছে সশব্দে। সুন্দর মানুষটির চুলগুলিও উড়িতেছে।

দুই হাত দিয়া চুল ঠিক করে বক্তা—আর কথা বলে উত্তেজিত স্বরে। যমুনা এক পা এক পা করিয়া সভার সম্মুখে যায়। একটু দূরে দাঁড়াইয়া শোনে সে, কি বলিতেছে মানুষটি এমন জোর দিয়া।

…"আবার তোমরা গ্রামে ফিরে এস—ঘর বাঁধ, হাল ধর—গরু ধর। আবার—আবার বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা কর।"

যমুনার চোখদুটি উজ্জল হইয়া উঠে—গ্রামে ফিরিয়া আসিবে তবে সকলে। ধোপাবাড়ীর, কুমারবাড়ীর, মিঞাবাড়ীর যে যে বিদেশে গেছে—সবাই ফিরিয়া আসিবে? আর তাহার সূর্যও ফিরিয়া আসিবে? প্রতাপকাকা—সুন্দর খুড়ি—সকলেই? তার ছেলেটা কত বড় হইয়াছে এতদিনে? বুকের মধ্যে যেন কাঁপুনি খেলিয়া যায়।

হঠাৎ যমুনা চমকিয়া উঠে সকলের চীৎকারে—

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ।"

সবাই—সবাই বলিতেছে ঐ কথাগুলি—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। যমুনা অর্থ বোঝে না। তবু বোঝে কল্যাণের কথাই বলিতেছে উহারা।

বক্তৃতা-দেওয়া মানুষটি ঘামিয়া গিয়াছে। সার্টটা চুপসাইয়া উঠিয়াছে। এক গ্লাস জল চাহিতেছে সে। "জল, জল লইয়া আয় এক গ্লাস দৌড়াইয়া।" যমুনা আগাইয়া যায় কলসী লইয়া। কলসী দেখিয়া একজন কৃষক আগাইয়া আসে "জল আছে? এই বাবুরে একটু জল খাওয়াও দেখি।"

যমুনা কলসী হইতে জল ঢালিয়া দেয় তাহার হাতে। পরম তৃপ্তিতে জল পান করে বক্তৃতা-দেওয়া মানুষটি—যমুনা তাকাইয়া দেখে স্নেহের চোখে। আন্তরিকতায়, শ্রদ্ধায় ভিজিয়া উঠে মন। মনে মনে ভাবে,

অমন চেঁচাইলে গলাত শুকাইয়াই যায়। কইলজাটা ঠাণ্ডা হউক একটু ঠাণ্ডা জল খাইয়া।

সভা ভাঙিয়া যায়। জল খাওয়া শেষ হইলে ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের বুঝি কাছেই বাড়ী। কে কে আছে বাড়ীতে।"

যমুনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, "ছিলত অনেকই—আকালের বছর সবই গেছে।"

ভদ্র বাবুটি খোঁজ নেয় সবই খুঁটিনাটি। তাহারা নাকি একটা হাসপাতাল খুলিবে গ্রামে। যমুনার ঠাকুরমা রাজি হয় যদি, তবে সেও ঐ হাসপাতালে কাজ লইতে পারে, জানায় মানুষটি।

ভদ্রলোকটি চলিয়া যায়।, আরেক গ্রামে যাইতে হইবে এক্ষুনি। পুলের অপর প্রান্তে নামিয়া যায় সুন্দর মানুষটি—কি সুন্দর মাথার উড়া-উড়া চুলগুলি। যমুনা তাকাইয়া থাকে কিছুক্ষণ—তারপর কলসীটা কাঁখে তুলিয়া লয়।

তারপর, আবার সেই অন্ধকার ছায়ায়-ঢাকা জনহীন ভিটার দিকে পা চালায় আস্তে আস্তে।

ঢাকা মেইলে বাড়ী পৌঁছায় শশাংকশেখর—বাড়ীতেই থাকিবে সে এখন। আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে নগেন্দ্রশেখর শশাংকের কাজের পরিকল্পনা শুনিয়া।

রিলিফ কেন্দ্র খুলিবে তাহারা এই আশ্রমে! খুশিতে অধীর হইয়া উঠে যেন নগেন্দ্রশেখর। "দেখি, দে-ত একটু টিনের দুধ। চেখে দেখি। জীবনীশক্তি আছে ত এ কৌটার দুধে। দুধের ফ্যাক্টরী

গুলিতে আবার চোরাপথ নেইত?" শশাংক লক্ষ্য করে অগ্রজের চোখে-মুখে যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব। বোঝে, এ শুধু সুকল্যাণের জন্য নয়। তাহার অন্তরাত্মায়ই যে টান পড়িয়াছে আজ, এ টান সামলাইয়া উঠিলে হয়।

রাত্রিতে আলোচনা করে দাদার সঙ্গে। তাহাকেই রিলিফ কমিটির প্রেসিডেণ্ট করিতে চায় তাহারা। সেক্রেটারী হইবে কে? গ্রাম হইতে একবাক্যে উত্তর "আসে, শশাংক ছাড়া কে আর হইবে। গ্রামে আছেই বা কে।"

সকালে বিকালে আশ্রমে দুধ বিতরণ হয়, খিচুড়ি বিতরণ হয় দুপুরে।

ভোরে উঠিয়া বিলাতী গুঁড়াদুধের সঙ্গে ফুটন্ত জল মিশাইয়া বালতি বালতি দুধ তৈয়ার করে যমুনা। পরম উৎসাহে দুধ ঢালিয়া দেয় সে দুধ প্রার্থীদের ঘটিতে বাটিতে।

আরও কিছুদিন আগে যদি আসিত এ দুধ, তাহাদের বলাই, তাহাদের হারাণী, আপুছি—ক্ষ্যান্তপিসী, কেহই হয়তো মরিত না। তাহার সৎমাটাও মরিয়া গেল একটা সন্তান পেটে লইয়া।

যমুনা দুধ ঢালিয়া দেয় সযত্নে—ছোট-বড় পিতলের ঘটিতে, গ্লাসে। জীবনে এতবড় কাজ আর সে পায় নাই। দুধ পরিবেশন করিতে করিতে চক্‌চক্ করে হতাশায় ভেজা-চোখদুটি।

"সাবধানে বাড়ী যাইস, ফ্যালাইয়া দিস না। এই কানাই, তোর মার লেইগা পিল্ লইয়া গেলি না?" ডাকিয়া বলে সে।

পিলের প্রতি আসক্তি নাই শিশুদের। তবু অমান্য করিতে সাহস পায় না দুধ-দেওয়া বাবুদের কথা। কিন্তু বুড়াদের আগ্রহ প্রচুর পিলের প্রতি। হয়তো এ যাত্রা বাঁচিয়াও যাইতে পারে ঐ পিলের জোরেই। কাঁপিতে কাঁপিতে রোগজীর্ণ দেহটা টানিয়া তোলে, তারপর গ্লাসভর্তি জল

লইয়া পিলগুলি গিলিয়া ফেলে। আয়ু বাড়াইবার পিল্! ক্ষীণ আশার ঝিলিক খেলিয়া যায় মনে।

সূর্য মাথার উপর উঠিতে না উঠিতেই ভিড় জমে আশ্রমের প্রাঙ্গণে খিচুড়ীর প্রত্যাশায়। ক্ষুধার্তের ভিড়।

কুসুমলতা খিচুড়ি রাঁধে। লোলচর্ম দুর্বল হাতে পিতলের হাতা দিয়া খিচুড়ি নাড়ে পরম আগ্রহে।

গ্রাম ছাড়িয়া যাহারা শহরে গিয়াছিল, তাহাদের জীবনের অবসান কি ভীষণ, ভয়ংকর ভাবে ঘটিয়াছে, তাহা আর আজ অজানা নাই কাহারও। ইতিহাসের পাতাকে কলংকে লেপিয়া দিয়াছে তাহাদের এ বীভৎস মৃত্যু।

শশাংক আর কমলেশ পরিবেশন করে বালতি বালতি খিচুড়ি। গরম খিচুড়ির ধোঁয়ায় আবিষ্ট হইয়া উঠে মন। সকলেরই মনে ছুঁইয়া যায় একই কথা, একই ভাঙা সুর—আরও কিছুদিন আগে আসিত যদি এ খিচুড়ি; হয়তো বাঁচিত তাহাদের পরাণ, মনসা, মনসার বৌ আরও কত কে!

ভাতের অভাবে; চাউলের অভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিতেছে তাহারা, আর ওদিকে হাজার হাজার মণ চাউল পচা স্তূপে পরিণত হইয়াছে তালা-আঁটা গুদাম ঘরে। গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া শোনে এ মর্মস্পর্শী সংবাদ। তাহাদের বুদ্ধিতে নাগাল পায় না, এ রহস্যের কূল কোথায়। চাউল পচিতেছে, তবু তাহারা চাউল পাইবে না। বাপ-ঠাকুরদার আমলের বুদ্ধি দিয়াও উহার শিকড় খুঁজিয়া পায় না।

নগেন্দ্রশেখর আলোচনা করে শশাংকের সঙ্গে সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে। যত পড়াশুনা করিতেছে সোভিয়েট সম্বন্ধে, ততই তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া যাইতেছে।

কিন্তু সোভিয়েট ব্যবস্থার আড়ালের ফিলসফিকে মানিতে পারে না তাহার মন।

নগেন্দ্রশেখর বলে, "শ্রমের বন্ধনই একমাত্র বন্ধন, আমি তা' মানতে পারি না। যীশু, বুদ্ধ, সক্রেটিশ এরা কেহ আর শ্রমের বন্ধনে আসে নাই জনহিত কাজে। বুদ্ধ রাজার ছেলে, রাজসিংহাসন ছেড়ে এসেছিল কি শ্রমের বন্ধনে? এসেছিল প্রেমের বন্ধনেই। সোভিয়েটেও এই ত্যাগ বরণ করছে আজ ছেলেমেয়েরা, এও ত প্রেমের দ্বারা, মানব প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই করছে। শুধু রুটির তাগিদে এ লড়াই নয়। মানবতার তাগিদেই এ লড়াই।"

শশাংক উত্তর দেয়, "প্রেমের বন্ধনেই বেরিয়ে এসেছেন মহাপুরুষরা, ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পায়ের তলার দুস্থ সমাজেরই প্রতিচ্ছবি তাঁদের টেনে এনেছে মাটির মানুষের মাঝে। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতই তাঁদের শিকড়টা রয়েছে মাটির তলায়। আমরা শুধু জলের উপরের ফোটা ফুলটাই দেখি আর জলের তলার মাটিটাত চোখে পড়ে না। সেরকমই তাঁদেরও উপরের প্রেমটাই চোখে ভাসে, মাটির তলার সমাজের শিকড়টা চোখে পড়ে না।"

আবছা সন্ধ্যা। সমুদ্রের নরম বালুতটে বসিয়া আছে পদ্মা। সামনে উত্তাল তরঙ্গের একটানা গর্জন। বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়ে ফেনিল জলরাশি।

অনন্ত বিরাটের কি অপূর্ব প্রকাশ! কূল নাই, শেষ নাই, শুধু তরঙ্গের লহরীর পর লহরী ছুটিয়া চলিয়াছে গম্ভীর গর্জনে। ভ্রমণ-বিলাসী নারী-পুরুষের অস্ফুট গুঞ্জন দূরে মিলাইয়া যায়। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা আর সমুদ্রের অসীম বিস্তৃতি সম্মুখে।

অরুণাভ জলের কিনারা ধরিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে আরও অনেক দূরে—এখনও ফিরিতেছে না। পদ্মার প্রতীক্ষ্যমাণ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একটি বিশীর্ণ মূর্তির প্রতি। তাহারই দিকে আগাইয়া আসিতেছে, অন্ধকারে অস্পষ্ট একটি অতি কৃশ অবয়ব যেন। মুখটা দেখিতে পায় না, তবু অনুভব করে পদ্মা, লোকটি যেন হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারই নিকটে।

বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিটিতে থাকে পদ্মার। চমকিয়া উঠে সে এক বহুদিনের পূর্বের পরিচিত কণ্ঠস্বরে "পদ্মা, না।"

পদ্মা মুখের দিকে তাকায়। দাড়ি ভরা মুখের আড়াল হইতে জ্বল-জ্বল করে একজোড়া অতি তীক্ষ্ণ চোখ। আবারও জিজ্ঞাসা করে লোকটি, "সুকল্যাণের বোন না।" পদ্মা যেন আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পায় এক মুহূর্তে। এতক্ষণে চিনিতে পারে—তাহাদের রূপসী গ্রামের সেই রথীন্দ্রমাষ্টার। "মাষ্টার মশাই!" আনন্দে আর বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে পদ্মা। যেন সেই লাল পদ্মগুচ্ছ হাতে ছোট্ট পদ্মা ঝলমল করিয়া উঠে এই বিরাট গম্ভীর বেলাভূমিতে। চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যেন পরিপূর্ণা নারী, সেই শিশু বালিকার শ্রদ্ধাকরা অবাক আনন্দে পা ছুঁইয়া প্রণাম করে পদ্মা তাহার প্রিয় মাষ্টার মহাশয়কে। "সুকল্যাণ কোথায়?" জিজ্ঞাসা করে রথীন্দ্র।

একমুহূর্তে নিবিয়া যায় পদ্মার কণ্ঠদ্যুতি।

"সে যে জেলে আছে—জানেন না আপনি। আর কখনও দেখা হবে কি তার সঙ্গে—" ছলছল করিয়া উঠে কথাগুলি। নিজেকে আয়ত্তে আনিয়া আবার বলে সে, "এ অন্যায়ের যে কবে শেষ হ'বে, কবে আমাদের সুদিন আসবে তাই শুধু ভাবি।"

রথীন্দ্রমাষ্টার কি যেন ভাবিয়া নেয় মুহূর্তের জন্য। পদ্মার এ ভেজা গলার সুরে তাহার মনের পরিচয় ধরা দেয় পুরানো শিক্ষকের চোখে।

নিঃশব্দে বসে সে পদ্মার পাশে। মৃদুস্বরে কথা শুরু করে। এক দীর্ঘ কাহিনীর অতি সংক্ষিপ্তসারটুকু বলিয়া যায় কয়েক মিনিটে।

বড় ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। পদ্মা যেন কতদূর হইতে শুনিতেছে, রহস্যময় ভয়ংকর এক গোপন ইতিহাস। তাহার নিঃশ্বাস যেন জমিয়া আসে। পলাতক রথীন্দ্র মাষ্টার। তাহাদেরই রূপসী গ্রামের সেই মাষ্টার মশাই, সুকল্যাণদের দলের সেই রথীন্দ্র ব্যানার্জী। জাপান-ফেরতা, বার্মা-ফেরতা বঙ্গোপসাগরের পথে লাইফ বোটে ভাসিয়া-আসা এক অতি-মানুষের সম্মুখীন পদ্মা আজ এই মুহূর্তে, এই সমুদ্র তটে।

অনুভূতির কি বেগশীলতা! নিশ্চল মুহূর্তগুলি শুষ্ক বালুকণিকাতে যেন আটকাইয়া গিয়াছে।

পদ্মা শোনে তাহার সম্মুখের সেই অতিমানুষটি ক্ষীণ কণ্ঠে তাহারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে একান্ত নির্ভরে।

সুকল্যাণের বোন সে, রথীন্দ্র মাষ্টারের প্রিয় ছাত্রী সে, কিন্তু অরুণাভের স্ত্রীও সে। পদ্মা ভাবিয়া চলে।

"ভয়ংকর ক্ষিধে পেয়েছে, পদ্মা। গত তিনদিন এক কণাও খাবার

মেলেনি সমুদ্রের লোণা জল ছাড়া। চল তোর ঘরে। বেশী দূরে নয় ত। হাটবারও আর শক্তি নেইরে।"

কি বলিবে পদ্মা। অনতিদূরে দেখা যাইতেছে অরুণাভকে। তাহারই আশ্রয়প্রার্থী, তাহারই প্রিয় শিক্ষক, তাহারই দেশভক্ত, অভুক্ত থাকিয়া ফিরিয়া যাইবে অনিশ্চিত পথের নিশ্চিত বিপদের মুখে! একমুহূর্তে দুঃসাহসিকতায় মরিয়া হইয়া উঠে পদ্মা। অরুণাভ আসিয়া পড়ে। পদ্মা পরিচয় করিয়া দেয়, "আমার ছোটবেলার মাষ্টার মশাই। কোণারক থেকে বেরিয়ে ছিলেন পুরী দেখতে। কিন্তু রাত হ'য়ে যাওয়ায় এখনত ফেরা মুস্কিল। আমাদের ওখানেই থেকে যান রাতটা।"

ঘরে আসিয়া হারিকেন ধরাইয়া দেয় পদ্মা। টেবিলের উপর ষ্টালিনের ছোট ছবি একখানা ফটোষ্ট্যাণ্ডে, হাতুড়ি ও কাস্তে আঁকা। জনযুদ্ধ পিপলস ওয়ার দুই এক কপি এলোমেলো ভাবে ছড়ান।

চোখের পলকে তীক্ষ্ণ চোখে কিসের বিদ্যুৎ খেলিয়া যায় রথীন্দ্র মাষ্টারের। মোটা দাড়িতে ঢাকা কৃশ মুখখানি বিবর্ণ হইয়া উঠে, আবার নিমেষে সামলাইয়া লয় পলাতক আশ্রয়প্রার্থী। অরুণাভের লক্ষ্য এড়ায় না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে সে রাতের অতিথিকে—তাহারই প্রিয়তমার প্রিয় শিক্ষককে। কি সন্দেহ ঘন হইয়া উঠে যেন গভীর চোখে। আশ্রয়প্রার্থীর দৃষ্টি এড়ায় না।

অরুণাভ নীরব হইয়া ভাবে। পদ্মা খাবার লইয়া আসে। মনে মনে ভাবে, তিনদিন উপবাসী। আরও কত দীর্ঘকাল অনাহারে কাটাইতে হইবে তাঁহাদের কে জানে।

তাহার চোখে স্নেহ ঝরে, আতংক ঝরে। একজন বিপ্লবী যোদ্ধার সামনে বসিয়া সে! একটা রোমাঞ্চকর নীরব উত্তেজনা।

অরুণাভ লক্ষ্য করে অতিথির খাওয়া। স্থির দৃষ্টিতে দেখে সে। চোখে চোখ মিলিয়া যায়। কঠিন সন্দেহের পুরু দেওয়াল দুইজনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝে।

অরুণাভ উঠিয়া যায়।

রথীন্দ্র পদ্মার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

পদ্মা বোঝে, তাহার মনের অবস্থা। মৃদুস্বরে বলে সে, "ভয় নেই মাষ্টার মশাই। একজন বিপ্লবী যোদ্ধার প্রাণের মূল্য কত, তা জানে পদ্মা।"

রথীন্দ্র কথা বলে এতক্ষণে, "আগে বলতে হয় বোকা মেয়ে।"

"তা হ'লে কি আপনি আসতেন।"

"আসতাম—না এসে উপায় ছিল না।"

অরুণাভ ঘরে ঢুকিলে রথীন্দ্র বলে, "টেরত পেয়েছই। আর গোপন করে লাভ নেই—উপায়ও নেই। আমার স্নেহের পাত্রীর জীবনের বড় বন্ধু তুমি। তাই তোমারই আশ্রয় চাইছি একটা রাত ও একটা দিনের জন্য।"

অরুণাভ রাতে শুইতে গিয়া পদ্মার হাতটা মৃদু ভাবে ধরিয়া বলে কোমল স্বরে, "কেন মিছে কথা বলতে গেলে, পদ্মা।"

পদ্মা উত্তর দেয়, 'তোমাদের নীতি অনুসারে উনিত—তোমার শত্রুই নিশ্চয়। এই সংশয় ছিল—আশ্রয়দানের মর্যাদা তুমি রাখবে, কি রাখবে না।"

অরুণাভ উত্তর দেয়, "নীতির দিক থেকে এঁর চাইতে বড় শত্রু ঠিকই আজ আর কেউ নয় আমাদের। কিন্তু নীতিবোধত কেবল অঙ্কের ফরমুলা নয়। নীতির উপরেও আরেকটা জিনিস আছে—সেটা মানুষের শুভবুদ্ধি।"

একটু থামিয়া আবার বলে অরুণাভ, "বছরের পর বছর ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হ'য়েই আজ মুক্তিপথে বেরিয়েছে এরা, আমরাও তাই। মতের বিভেদে আজ দুইজনে দুই শিবিরে গেলেও আমাদের দুইজনেরই ভিতরের নিষ্পেষিত মূর্তিটি একই—অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ-সুরটি একই। তাই এদের আশ্রয় দিতে আমরা পারি, আমাদেরও যে-প্রাণ কাঁদে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের হাতে এদের নির্যাতন দেখে, সেটা কেন ভাবলে না, পদ্মা। আজ ভুলপথে গিয়েছে বলেইত, এরা আমাদের শত্রুর পথ সুগম করছে।"

অরুণাভ শুইয়া শুইয়া ভাবে, দেশের অহিত চায় না রথীন্দ্র মাষ্টারও। জনগণের কল্যাণ কামনা করে বলিয়াইত এ জটিলতম জীবনের প্রতিজ্ঞা তাহার চোখে। তবু জনকল্যাণের পথে চলিতেছে না তাহারা। কিন্তু কেন? পরাধীন দেশ বলিয়াই ত। ব্রিটিশের উপনিবেশ বলিয়াই ত আজ এ ভ্রান্ত পথ ধরিয়াছে উহারা। এ জটিলতা উঠিয়াছে দেশভক্তদের মাঝে।

আজ স্বাধীন দেশ হইলে, তাহারা ও উহারা কি মিলিতভাবেই প্রতিরোধ জানাইত না ফ্যাসিষ্ট জাপানকে? অদ্ভুত জটিল পরিস্থিতি ভারতবর্ষের!

দুপুর বেলা পদ্মার সঙ্গে গল্প করে রথীন্দ্র মাষ্টার। যুদ্ধক্ষেত্রের গল্প। পদ্মার স্থির চোখের সামনে ভাসিয়া যায় খণ্ড খণ্ড রোমাঞ্চকর দৃশ্য সব।

গম্ভীর গর্জন—দূর ভারত মহাসাগরের আড়ালে জাপানী কনভয়—মারণের যন্ত্রবাহী বম্বার—ফাইটার—সাবমেরিন, গুপ্তচরের নিঃশব্দ

নৈশযাত্রা···কুচকাওয়াজরত ভারতের মুক্তি ফৌজ—নিঃস্বার্থ নির্ভীক।

তাহাদের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে পর্বত-শিখরে, পাহাড়ী উপত্যকায়—পার্বত্য নদীতটে। সুদীর্ঘ বনবনানীর আড়ালে, পাহাড়ী টিলার ছায়ায় ছায়ায় কত অগণিত তাঁবু, ছাউনি, বিশ্রামরত সৈনিকদল। ভারতীয় শিবিরে শিবিরে উড়িতেছে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা—স্বাধীন ভারতের গৌরববাহী জাতীয় পতাকা। তাঁবুতে তাঁবুতে নিস্তব্ধ প্রান্তরে ট্রানসমিটারের কণ্ঠহীন গম্ভীর স্বরে গর্জিয়া কাঁপিয়া উঠে নেতাজীর বাণী।

শিলা-স্তরে স্তরে সে গভীর কণ্ঠস্বর আছড়াইয়া কাঁপিয়া যায় দূর বাতাসে···

পদ্মা স্থির দৃষ্টিতে তাকায় রথীন্দ্র মাষ্টারের দিকে—এই দাড়ি-গোঁফ ভরা কৃশ লম্বা আধাবয়সী মানুষটি সেই বিপ্লব বাহিনীরই একজন অগ্রদূত। তাহারই সম্মুখে বসিয়া কথা বলিতেছে সে—তাহারই দেহের উত্তাপ অনুভূত হইতেছে—উত্তেজনায় বুক কাঁপে পদ্মার। চোখের পলক পড়ে না।

লাজুক বাঙালী কন্যার মায়া-মাখান মনে কি বিপ্লবের সুর বোনে রথীন্দ্র—এ অলস মধ্যাহ্নে!

অরুণাভ ঘরে ঢোকে। আরও কয়টা দিন থাকিয়া যাইতে বলে সে রথীন্দ্রকে। "একটু বুঝে সুঝেই চলা ভাল, আবার বিপদে না পড়েন।"

পদ্মা সাগ্রহে পরিচর্যা করে। অরুণাভ উষ্ণ আতিথ্য দিয়া পথশ্রান্তি দূর করে তাহারই প্রিয়তমার প্রিয়শিক্ষকের; আশ্রয়প্রার্থীর নিরাপত্তা কামনা করে। ভুলপথে-যাওয়া মুক্তি যোদ্ধাকে সত্য-পথের সন্ধান

বলে। আবার তুমুল তর্ক উঠে। দুই জনেরই চোখে চোখে বারুদ-কণা ঝলসিয়া উঠিতে চায় ক্ষণে ক্ষণে। পদ্মা সভয়ে শোনে।

পদ্মা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে মাসাধিক কাল। তাহার কলেজের এক সহপাঠী আর তাহার দাদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া যায় ছোট্ট একটা পার্কের মোড়ে, পদ্মা আর অরুণাভের। কল্যাণী আর কমলেশ।

কমলেশ অরুণাভেরও পরিচিত। একসঙ্গে জেলে ছিল। সে ঠাট্টার সুরে বলে, "কি কমরেড, জাপানকে রোখা কতদূর? সুযোগ আর পেলেন না মনে হ'চ্ছে। আর এক মাসের মধ্যেই যমুনার তীরে এসে পড়বে।"

অরুণাভ উত্তর দেয়, "এতে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠার খুব কারণ আছে কি? জাপানী মার্কা স্বরাজের অভিজ্ঞতা বার্মা, মালয় কিছু কিছু পাচ্ছে, দেখছেন তো।"

"কিন্তু এবার ত জাপানীরা আসবে না। আসবে শ্রীযুত বসুর সেনাবাহিনী। তারা আসার সঙ্গেই দেখবেন, দেশের আমূল পরিবর্তন হ'য়ে যাবে।"

পদ্মার চোখ দুটি দীপ্ত হইয়া উঠে, লক্ষ্য করে অরুণাভ। মনের ভিতরে একটা কাঁটার মত বেঁধে। কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করে

না। সংযত স্বরে উত্তর দেয়, "সেটা সম্ভব হ'ত যদি তিনি স্বাধীন সেনাবাহিনী নিয়ে আসতে পারতেন।"

কমলেশ হাতঘড়িটায় চোখ বুলাইয়া বলে, "আজ চলি—ক্লাশ আছে। আপনার বাড়ী গিয়েই এ আলোচনা শেষ করবো একদিন।"

কল্যাণী পদ্মার দিকে তাকাইয়া বলে, "চলি, পদ্মা—একদিন যেও আমাদের বাড়ী। কাছেই ত থাক।"

রাত্রি অনেক। কল্যাণীদের বাড়ীতে বসিয়া গোপন বেতারকেন্দ্র হইতে তাহাদের বীর নেতার বক্তৃতা শোনে পদ্মা। রহস্য পথে উধাও হওয়া, শতসহস্র তরুণ প্রাণের বীর সেনাপতির গম্ভীর কণ্ঠস্বর গর্জিয়া উঠে ঘরের ভিতরে "ক্রীতদাস হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বড় অভি-শাপ, মানুষের জীবনে আর কিছু নেই, একথা কখনও ভুলো না। একথা কখনও ভুলো না, অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোস করে চলার মত ঘৃণ্য পাপ আর কিছু নেই।"

দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া রেডিওর সামনে ঘিরিয়া বসে সবাই। নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না। গভীর আশায় মন দিয়া শোনে বৃদ্ধ গৃহস্বামী, দূর শব্দতরঙ্গে ভাসিয়া-আসা প্রতিটি কথা, প্রতিটি ধ্বনি। বৃদ্ধের নিষ্প্রভ চোখের তারায় জ্বলিয়া উঠে বিদ্বেষের বারুদকণা। গুলি বিদ্ধ কিশোর পৌত্রের সে রক্তমাখা দেহ ভুলিতে পারে না বৃদ্ধ।

দ্রুতস্পন্দন শুরু হয়। এ অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে শীগগীরই আসিতেছে বিপুল সেনাবাহিনী।

"ব্রহ্মদেশ থেকে পালিয়ে এসেছেন বীর পুরুষেরা। এবার এখান থেকেও পালাতে হ'বে।"

"শোনা যাচ্ছে, জাপান বর্মাকে স্বাধীন করে দিয়েছে। এখন জাপানের পথ খোলসা করতে পারলে, এখানেও আর বেশীদিন টিকতে হ'বে না আমাদের মিত্রদের," বলে কল্যাণীর মেজদাদা, কুমারেশ ঘরের, নীরব শ্রোতাদের, বিশেষ করিয়া পদ্মাকেই লক্ষ্য করিয়া। পদ্মার স্বামী যে কম্যুনিষ্ট, জানে সে। রেডিওতে সংবাদ শোনা হইয়া গেলে পদ্মা উঠিয়া পড়ে।

কুমারেশ আসে পদ্মার সঙ্গে, "চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পদ্মাদের বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি একটা পরিত্যক্ত জমি। উল্টা দিকে কতকগুলি লোহার দোকান। দোকানের ভিতরে এখনও লোহা পিটানোর শব্দ চলিতেছে।

পদ্মা হঠাৎ কি দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠে। গ্যাস পোষ্টের আধ-ঢাকা আলোর তলায় ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে এক ভয়াবহ দৃশ্য। একটা কঙ্কালরূপী মৃত স্ত্রীলোকের নগ্ন বক্ষের উপর পড়িয়া আছে অর্দ্ধমৃত একটি ক্ষুদ্র জীব। মানুষ বলিয়া চিনিতে বিলম্ব হয়। পদ্মা থমকিয়া দাঁড়ায় একটু। বুকের ভিতরে নিঃশ্বাসগুলি যেন আতংকে আর বেদনায় জমিয়া যাইতে চায়। জীবনে এমন ভীষণদৃশ্য আর সে দেখে নাই।

দাঁত বাহির-করা কঠিন চোয়ালটা দেখিয়া বোঝা দুঃসাধ্য উহা একটা স্ত্রীলোকেরই মূর্তি। যেন নরক হইতে একটা প্রেতাত্মা উঠিয়া আসিয়াছে এই মুহূর্তে। শিশুটিরও শেষ শ্বাস উঠিয়াছে। ছোট দেহ টুকুতে খিঁচুনি আরম্ভ হইয়াছে।

পদ্মা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "এখনও প্রাণ আছে।"

কুমারেশ বিলম্ব করিতে চায় না। ধরা পড়িয়া যাইবার ভয় আছে। পলাতক সে।

মৃদুস্বরে বলে, "আর মিনিট তিন। এইত আমাদের মিত্র শাসনের স্বরূপ।"

খোঁচাটা লক্ষ্য করে না পদ্মা। কিছু ভাবিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে সে এই মুহূর্তে। পদ্মা চোখ ফিরায়। এ দৃশ্য আর দেখা চলে না। তাড়াতাড়ি পা চালায়—মুক্ত, একেবারে মুক্ত বাতাস চাই পদ্মার। না হইলে তাহারও বুঝি নিঃশ্বাস আটকাইয়া যাইবে।

পথের আরেক প্রান্তে একটা সিপাহী টহল দিতেছে—কুমারেশ আরেকটা গলির ভিতর দিয়া ঢুকিয়া যায়।

অরুণাভ ঘুমায় নাই তখনও। পদ্মা ফেরে নাই—বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইতে। বই পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হইয়া যায় অরুণাভ। ভাবে পদ্মার কথা। কি যেন লুকাইতেছে সে, কি যেন করিতে চায় পদ্মা। মৃদু সন্দেহের ছায়াপাত করে মনে।

অরুণাভ চিন্তিত হইয়া উঠে পদ্মার জন্য। ব্যথিতও হয়। পদ্মা—তাহার প্রেমের মূল্য কি এই ভাবেই দিল। তাহার নীতিকে, তাহার আদর্শকে অবিশ্বাস করিরা—ব্যঙ্গ করিয়া?

কিন্তু জোর জবরদস্তি পছন্দ করে না সে। সে জানে—পদ্মার এ ভুল একদিন ভাঙিবেই। পদ্মার মানবতা-বোধের স্বাভাবিকরূপ লইয়াছে ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা। যেমন করিয়াই হউক ইংরাজকে তাড়াইতে পারিলেই দেশের কল্যাণ আসিবে—এই বিশ্বাস পদ্মাকে আনিয়া দিয়াছে তাহার মানবতা-বোধই।

আবার এই মানবতাবোধই তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে দেশের নিপীড়িত জনগণের শিবিরে।

দুয়ারে মৃদু টোকা পড়ে। অরুণাভ দুয়ার খুলিয়া দেয়। পদ্মার মুখের বিবর্ণভাব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হয় সে। "কি হ'য়েছে পদ্মা? এত ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছ কেন?"

পদ্মা উত্তর দেয় না। তাহার ঘরে গিয়া আলো জ্বালায়। বড় বড় চোখে দেখে সে আলো—সভ্য জগতের বিজলির আলো। মন হইতে কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছে না ঐ ভীষণ দৃশ্য। অভিশাপের মূর্তিমান কায়া সব যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে পথে পথে—"ফ্যান দাও —ফ্যান দাও"। আর্তনাদে ছিঁড়িয়া পড়িতেছে অন্ধকার রাস্তাগুলি। আকাশে বাতাসে কিলবিল করিতেছে যেন এই অপমৃত্যুর অপ-দেবতারা।

শুইয়া শুইয়া ভাবে পদ্মা নূতন-পড়া ছোট্ট একটি বে-আইনী পুস্তিকার কথাগুলি।

"খাদ্য সংকট যতই ঘোরাল হইয়া উঠিবে, জনগণের জীবন যতই দুঃসহ হইয়া উঠিবে, ততই তাহারা মরিয়া হইয়া বিদ্রোহ করিবে। আর সত্যিকারের বিপ্লবীরা সেই বিদ্রোহকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইবেন।"

কিন্তু পদ্মার মনের প্রশ্ন মেটে না এ যুক্তিতে। এই কঙ্কাল মূর্তি মানুষগুলি এমন ভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইবে এই পৃথিবী হইতে। তাহা হইলে মানুষের শুভবুদ্ধির কি কোনই মূল্য নাই?

ঘুম আসে না পদ্মার চোখে। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে যেন ঘুম ঘনাইয়া উঠিয়াছে। নিদ্রামগ্ন রাজধানী। নিস্তব্ধতার বুক চিরিয়া চিরিয়া একটি করুণ বিলাপধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, দূরের কোনও

বাড়ীর বন্ধ-দুয়ারের নিকট হইতে। "মাগো দুটি পায়ে পড়ি; দুটি খেতে দাওগো মা। মাগো দুটি খেতে দাও গো।" সমস্ত কলিকাতার বাতাসে বাতাসে কাঁপিয়া বেড়াইতেছে যেন নিশীথিনীর আর্তক্রন্দন, "মাগো, দুটি খেতে দাওগো, একটু ফ্যান দাও গো, মা।"

পদ্মা ভাবে, জ্যান্ত মানুষগুলি এমন করিয়া মরিয়া যাইতেছে; এ পাপের অংশীদার ত সেও। এ মুমূর্ষু পৃথিবীর নিষ্ক্রিয়-দর্শক হওয়াটাই পাপ। সমস্ত জীবন ভরিয়া এ পাপের গ্লানি বহন করিতে হইবে তাহাকে। তুষানলের মত তিল তিল করিয়া এ গ্লানি ঝরিয়া পড়িবে তাহার সমস্ত আত্মায়। কিন্তু তাহাতেও ত এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না কোনদিন।

প্রকাশের বিবাহ হইয়াছে একবছর হইল। কিন্তু এ পর্যন্ত ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে দেখা হয় নাই পদ্মার।

প্রকাশের মতের অপেক্ষা না রাখিয়াই নগেন্দ্রশেখর পদ্মাকে বিবাহে আসিতে অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছিল। কিন্তু পদ্মা আসে নাই। সে বিবাহে উপস্থিত থাকিলেও নাকি সমাজের কেহ তাহাদের বাড়ীতে বৌ ভাতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে না। পদ্মার কানেও যায় এ সংবাদ। তাছাড়া তাহার মা কিংবা দাদা কেহই লেখে নাই তাহাকে যাইতে। সে অভিমানও ছিল। তাই জ্যেঠামণিকে তাঁহার অনুরোধ রাখিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র দেয় সে।

তারাসুন্দরী আক্ষেপ করে, "বুদ্ধিমতী মেয়ে সে। সে যে আসবে না জানতাম।"

তবু বধূ বরণের কুলা পিঁড়ি চিত্রিত করিতে করিতে বলে, "পদ্মা থাকলে এ সব কাজ আর আমাদের করতে হত না।"

নিজের বহু যত্নে তোলা মোতি-মুক্তার অলংকার দিয়া বধূকে আশীর্বাদ করে সুহাসিনী।

একদিন সুকল্যাণ পদ্মার বিবাহের পর বলিয়াছিল তাহার কাকি-মাকে, "আচ্ছা কাকিমা, পদ্মাকেও ত একখানা তোমার বাজু না ব্রেসলেট কি বলে, দিতে পারতে—বিয়ের সময়।"

সুহাসিনী গম্ভীর হইয়া উত্তর দিয়াছিল, "সে কি আর আমাদের মুখ রেখেছে। ও পোড়ারমুখে গয়না দিলেই কি মুখ উজ্জল হ'ত? সে যেমন আমাদের মুখ হাসিয়েছে, তার কখনও সুখ হ'তে পারে না।"

তারাসুন্দরী ও কুসুমলতা একসঙ্গে গালি দেয় ছোট বধূকে, "গর্ভ-ধারিণী মা হ'য়ে এমন শাপ দিও না, ছোট বৌ, মেয়েটাকে। বলা যায় না, কখন কোন কথা "ক্ষেণে" পড়ে যায়।"

সুকল্যাণ হাসিয়া জবাব দিয়াছিল—"গয়নার জন্য আর তার সুখ আটকে থাকছে কিনা। যা অমূল্য সম্পদ পেয়েছে সে।"

বিবাহ উৎসব মিটিয়া গেলে সুহাসিনী বধূকে লইয়া কলিকাতায় নূতন সংসার পাতে। নববধূ উর্মিলা পছন্দ করিয়া হালফ্যাসানের ফারনিচার অর্ডার দিয়া আসে দোকানে। জানালায় সরু নেটের পর্দা ঝুলায় ফিকা রঙের। দামী দামী কাঁচের বাসন, পিয়ালা, পিরিচ, কাঁটাচামচে ঠাসা হয় নূতন কেনা কাবার্ড। খাওয়ার টেবিলের উপর ফুলদানীতে ক্রিসেনথিমামের গুচ্ছ গৃহলক্ষ্মীর প্রাচুর্যকে সম্ভাষণ জানায়।

কিন্তু বৎসরান্তেই সুহাসিনীর ভুল ভাঙিয়া যায়। এ তাহার স্বামীর সংসার নয়, পুত্রের সংসার, প্রতিপদে মর্মস্থলে আঘাত করে এ রূঢ় সত্য। স্বাচ্ছন্দ্য থাকিলেও স্বাধীনতা নাই এ সংসারে, টের পায় সুহাসিনী গভীর বেদনার সঙ্গে।

চিত্রিতা ও প্রসাদ দুই জনেই কলেজে পড়িতেছে দাদার কাছে থাকিয়াই। তাহার সন্তানদের এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যেন তাহাকেই অনুগ্রাহীরূপে থাকিতে হইতেছে আজ প্রথম সন্তানের কাছে। একদিন কথায় কথায় প্রকাশ জানাইয়া দেয় তাহার মাতাকে, একজনের সন্তানকে আরেক জনের প্রতিপালন করার এ জঘন্য প্রথা নাকি একমাত্র এ দেশেই আছে। শিহরিয়া উঠে সুহাসিনী। বাহিরের আদব কায়দায় বিদেশী অনুকরণ করিলেও তাহাদের মনের ভিত্তিতে স্পর্শ করিতে পারে নাই সভ্য ইয়োরোপের বাতাস। কিন্তু আজ এমন করিয়া অপদস্থ হইবে সে তাহারই সন্তানের কাছে, এতো তাহার কল্পনারও অগোচর। ছোট বোন, ছোট ভাইকেও গলগ্রহ মনে করিতেছে নাকি আজ প্রকাশ! অনুপায় সুহাসিনী। প্রকাশের ব্যবসার উন্নতির জন্য তাহার সব কিছুই সে ঢালিয়া দিয়াছে। হয়তো প্রকাশ উহা তাহার অধিকার হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছে।

জন্মদানের দায়িত্ব সম্বন্ধে চেতনহীনতাকে এমন করিয়া নাড়া দিবে প্রকাশ কে জানিত!

কি উত্তর দিবে সুহাসিনী।

তার উপর প্রসাদ স্বদেশী করে দাদার মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই। প্রকাশ পছন্দ করে না উহা। "দায়িত্ব নিতে হ'লে সম্পূর্ণ ভাবেই নিতে চাই। না হ'লে যার যার ব্যবস্থা সে-ই যেন করে নেয়।" প্রসাদের রক্তে কম বয়সের উত্তেজনা। সেও স্পষ্ট উত্তর দেয, "তার অর্থ নিজের মতামত বলে কিছু থাকতে পারবে না।"

"থাকবে না কেন। তবে আমার বাড়ীতে আমার মতটাই সর্বপ্রথম চালু হ'বে।"

"বলতে চাচ্ছ ত তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হ'লে তোমার' বাড়ীতে থাকা চলবে না। আচ্ছা আমি অন্য জায়গায় থাকারই ব্যাবস্থা করবো।"

দিন দুইয়ের মধ্যেই প্রসাদ তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া আসে। সেই দিনই চলিয়া যাইবে সে। কিন্তু তাহার কথাবার্তা শুনিলে বোঝা সাধ্য নয়, ভাইয়ের সঙ্গে কোনও মতান্তর ঘটিয়াছে তাহার। দিব্যি খাওয়া দাওয়া করিয়া একটা ঘুম দেয়। "বৌদি, শেষ দিনের মত একটু আরামে ঘুমিয়ে নেই, কি বল? যে জায়গাটা ঠিক করে এলাম, চিত্রিতা ত দুয়ার দিয়েই ঢুকতে পারবে না, যা একখানা দেহ করেছে ও। আর তুমিও ঢুকতে যদি বা পার গা বমি-বমি করা, মাথা ঘুরুনি শুরু হবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই," হাসে প্রসাদ।

কিন্তু সুহাসিনী চোখের জল মোছে। "প্রসাদ, চল্লিই তবে।"

"তবে কি এখানে থেকে একেবারে হিটলারের সৈন্য বনবো নাকি?"

প্রসাদ চলিয়া যাইবে চা খাইয়াই। চায়ের টেবিলে বসিয়া প্রসাদ আবার দুরন্ত হইয়া উঠে, "বাঃ চমৎকার টেবিল্‌ক্লথটা ত। লেসের বোনা দেখ্‌ছি।"

উর্মিলা খুশি হইয়া বলে, "দেখো, আবার চা ঢেলে শেষ করো না।"

"তা একটু শেষ করে যাইও যদি, তবু রোজ চা খেতে খেতে মনে পড়বে দেবর লক্ষ্মণকে।"

"এমনিতেই যথেষ্ট মনে পড়বে। দেবর লক্ষ্মণের পোষ্টার লেখার কল্যাণে আর কম কিছু নষ্ট হয়নি আমার।"

কিন্তু সুহাসিনী দিন দিনই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বিলাসিনী, তেজস্বিনী সুহাসিনীর আজ যেন নবজন্ম লাভ হইয়াছে। চৌধুরী বাড়ির ছোট বৌয়ের সে সম্মানটুকু আজ যুদ্ধের ঢেউয়ে ধুইয়া মুছিয়া

গিয়াছে। যুদ্ধপূর্ব বিলাতী আদব-কায়দায় শিক্ষিত সুহাসিনীও ম্লান হইয়া গিয়াছে যুদ্ধের যুগের কন্‌ট্রাক্টর পত্নীর অন্তরশূন্য আদবকায়দায়। এ যেন জীবনের আরেক পর্ব। এ নূতন অধ্যায়ে মানুষকে আর নিজেকে পালিশ করিয়াও রাখিতে হয় না।

সুহাসিনী ছেলেকে বলে, "পূজো আসছে! তোঁর জ্যেঠামণি, জ্যেঠীমা, পিসীমাকে কিছু টাকা পাঠালে হ'ত না তাঁদের ঠাকুরের ভোগ দিতে?"

প্রকাশ পরিষ্কার জানাইয়া দেয়, "ঐ ওল্ড স্কুলমাষ্টারের ফুলিশ কতকগুলি ইডিওলজী চরিতার্থ করতে টাকা নষ্ট না ক'রে, বরং একটা ছোট পার্টি দিলেও কাজে আসবে আমার।"

সুহাসিনী স্তম্ভিত হইয়া ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা বাহির হয় না মুখ দিয়া।

এক মুহূর্ত সময় নাই প্রকাশের একমাত্র রবিবার ছাড়া। সেই দিন রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত তাস খেলা হয়। উর্মিলা ঘুমের চোখে তাসের কল দেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্বামীর মন প্রসন্ন রাখার জন্য।

সুহাসিনীও ঘুমভরা চোখে বসিয়া থাকে রাতের খাওয়ার অপেক্ষায়। সকলের খাওয়া হইয়া যায় যায়—তখন প্রসাদ ঘরে ঢোকে ঝড়ের মত।

"বাঃ বেশ সময়মত ত এসেছি।" বলিয়া বসিয়া পড়ে একটা চেয়ার টানিয়া। "মায়ের হাতের 'পর-চিত্ত-হরণী' পিঠা! খুব ভাল দিনে এসেছি ত।"

প্রকাশ গম্ভীর হইয়া থাকে। উর্মিলা তাকাইয়া বলে, "যা চেহারা হ'য়েছে। আয়না দিয়ে দেখো মাঝে মাঝে।" "তা' আর

হ'বে না। এমন ভাল ভাল খাবারত আর মেলে না বহুকাল। আর আয়না ত নাইই, যে চেহারাটা দেখেও হুশিয়ার হ'বো মাঝে মাঝে। আজকের রাতটা কিন্তু এখানেই থাকবো, বৌদি। দেখো, চিন্তাভাবনা করে। না হ'লে এখনই বিদায় হই।"

রাত ভরিয়া মার সঙ্গে গল্প করে প্রসাদ। মায়ের বিশীর্ণ চেহারাটা লক্ষ্য করিয়া বলে সে—"এ ভাবে মরবে নাকি তুমি। তার থেকে দেশে চলে যাও।"

"দেশে যে যাব—তোর জ্যেঠামণির আয়ে তাদেরই সংসার যে কি ভাবে চলছে এই বাজারে তা' কি আর বুঝি না। তার উপর বোঝার উপর শাকের আঁটিটিরও ভার কি সইবে আর ঐ বুড়া হাড়ে।"

ওদিকে তিনতলার উর্মিলার ঘরে তখনও বাতি জ্বলিতেছে। "সিদ্ধেশ্বর এসেছে দেখলাম। আজত তাহ'লে রাত দু'টো অবধি চলবে তাস।"

"ঐ মাতাল বদমাইসটা খুব বুঝি আড্ডা দেয় এখানে। আর রূপক ব্যানার্জীও নাকি মদ ধরেছে শুনলাম। কণ্ট্রাক্টর আর জোতদারে হ্যাণ্ডশেক তো হ'বেই একটু আধটু। তবে তাসের উপর দিয়েই সামলে নেয় যদি বৌদি তবেই রক্ষা। না হ'লেও তারও কপাল ভাঙবে—সে খেয়াল আছেত? শাড়ি গয়নায়ও তখন মুখের গ্লানি ঘুচবে না।"

প্রসাদ বলিয়া যায়, "দাদাদের ফ্যাক্টরীতে আমাদের ইউনিয়নটা ভাঙার মৎলবে এই সিদ্ধেশ্বরকেইত লাগান হ'য়েছে। সাকরেদ জুটেছে একজন—মদন। সেই আমাদের গ্রামের ভুইমালী বাড়ীর যমুনাকে মনে আছে—তার সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছিল—বাবরিওয়ালা মদন ব্যাটা—শয়তানের একশেষ। এদিকে আমাদের স্কুলের সেই

মালি সূর্য আর তার ভাই প্রতাপ—খুব ভাল ওয়ারকার।" প্রসাদ রাত ভরিয়া কথা বলে মায়ের সঙ্গে। সুহাসিনীর কানে পৌঁছায় না সব কথা। তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে—তাহার শ্বশুর গৃহের উঠান-ভরা রৌদ্র। আজ যেন নূতন চোখে স্বপ্ন দেখে সে গ্রামের। তাহার দেবতুল্য ভাশুর, দেওর, জা, ননদ। কেমন আছে তাহারা সে খোঁজও রাখে নাই এতকাল। আজ অনুতাপে পুড়িয়া মরে সে। পদ্মার কথাই মনে পড়ে বারে বারে। কত বছর দেখে না সে পদ্মাকে। "পদ্মাকে একদিন আসতে বলবি প্রসাদ। তোর সঙ্গেত তার দেখা হয়। কেমন আছেরে ?"

"দিদি আছে কিনা এখানে জানিনাত। সাংঘাতিক অসুখ থেকে উঠলো—তাই পুরীতে পাঠিয়েছিল তাকে।"

"কই আমাকেত জানাসনি তার অসুখের কথা।"

"জানার আগ্রহ কি ছিল তোমার, যে জানাব ?"

কমলেশের সঙ্গে দেখা হয় অরুণাভের বাড়ী আসার পথে। অরুণাভ বলে "কলেজ থেকে ফিরলেন ? চলুন আমাদের ওখানে। চা খেয়ে যান।"

কমলেশ ঘরে ঢুকিয়া পদ্মাকে বলে, "চা খাওয়ান দেখি। গরু মানুষ করতে করতেই শেষ হ'লাম। চাকরির উপর আবার ফালতু খাটুনি। আমাদের মেয়েদের ডিপার্টমেণ্টে এসেছেন এক মেয়ে প্রফেসার, কিছু বোঝাতে পারেন না। অগত্যা যত একস্ট্রা ক্লাশের বোঝা এসে জমে আমাদেরই ঘাড়ে। পরীক্ষার্থী ছাত্রীরা এসে ধরলো,—স্যার, ছুটির পর একটা ক্লাস করবো আমরা আপনার কাছে। কি আর করি, মাষ্টার মশাই যখন। এদিকে গলা যে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে ওঠে। এককাপ চা-ই না হয় খাওয়াও গুরুদক্ষিণা-বাবদ।"

অরুণাভ বলে, "মিসেস খাতুনত এসেছেন আপনাদের কলেজে, তাই না।"

কমলেশ উত্তর দেয়, "যেমন, ছাত্রীরা, তেমনি তাদের অধ্যাপিকা। এর চাইতে বাপু, তোমরা ঘরসংসার কর, ছেলেমেয়ে মানুষ কর—যা তোমাদের যোগ্য কাজ।"

পদ্মা বলে, "কেন মিসেস খাতুন ত অক্সফোর্ডের বিদূষী।"

"ঐ ত, মেয়ে বলেই উৎরে এসেছেন। মেয়ে আর মিঞা। এই দুই ম-এর জ্বালায় মা সরস্বতীর ত প্রাণ অস্থির। অপ্রেস্‌ড্ হ'লেই প্রিভিলেজ পাবে, নূতন থিওরী আবিষ্কার হ'য়েছে ত আজকাল! এইত কম্যুনিষ্টরাই ডুবাল আরও।" ঠাট্টার স্বরে বলে সে।

অরুণাভ হাসিয়া বলে, "কেন, কম্যুনিষ্টরা কি দোষ করলো।"

"দোষ কি আর একটা করছে তারা। আপাতত তাদের প্রধান দোষ—লীগকে সমর্থন করা।"

স্যানিটোরিয়ামে থাকাকালীন অবস্থায় বিশ্বরূপ মুক্তি পাইয়াছিল। তখন তাহার শয্যাশায়ী অবস্থা। একটু সুস্থ হইতে না হইতেই আবার কি সন্দেহে পুলিশের নজরবন্দী করিয়া রাখা হয় তাহাকে। বিপাশা তখন ইউ-পি-তে। দীর্ঘকাল বাদে মুক্তি পাওয়ার পর এই প্রথম কলিকাতা ফিরিয়া আসে বিশ্বরূপ।

পদ্মা প্রাণঢালা আন্তরিকতা দিয়া অভ্যর্থনা করে তাহাদের গৃহের এ পরম বান্ধবকে।

শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে বিশ্বরূপকে। বয়স অনুপাতে একটু বেশী বয়স্ক মনে হয়। এককালে সুদর্শন সুপুরুষই ছিল, তাহার অবশিষ্ট পরিচয় আজও আছে দেহের সর্বাঙ্গে! কিন্তু দীর্ঘ কারাবাসের নির্মম

লাঞ্ছনায় সে সুন্দর সুদৃঢ় দেহভঙ্গি আর নাই। শুধু আছে এক প্রখর দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য অন্তর্দর্শী চোখদুইটিতে। পৌঢ়ত্বের ছায়া স্পর্শ করিয়াছে যেন আজই তাহার প্রশান্ত ললাটে।

প্রথম দেখার দিন বিপাশা প্রসন্ন অভিনন্দন জানায় বিশ্বরূপকে, "লাল সেলাম।"

তাহার আবেগ ভরা, উজ্জ্বল চোখ দুইটিতে ধরা দিয়াছিল অপ্রকাশিত আরও বহু কথা। একটা সুন্দর লালিমায় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল কপোল দুইটি।

বিশ্বরূপও অভিনন্দন জানাইয়াছিল বিপাশাকে। সস্নেহে মাথা স্পর্শ করে ধীর, সংযত হাতে। সে জানে, বিপাশা অপেক্ষা করিয়া আছে তাহারই জন্য। বিপাশা—তাহার বিগত জীবনের অনুগত শিষ্যা, একান্ত বান্ধবী, প্রাণাধিক প্রিয়া বিপাশা। আজও কেহ আত্মীয় স্থানীয় যদি থাকিয়া থাকে তাহার, সে শুধু বিপাশাই।

তবু কিসের এক অভাব বোধ করে বিপাশা। তাহার এ দীর্ঘ বৎসরগুলির নিবিড় প্রতীক্ষার মানুষটিকেই যেন সে শুধু পাইল। অতীতের সে মাধুরীটুকু সবই যেন ধুইয়া মুছিয়া আসিয়াছে এ বৃহৎ মানুষটি।

দেহের দিক দিয়া সে বলিষ্ঠ মানুষটি অনেকখানি দুর্বল হইয়া আসিয়াছে রোগভারে, কিন্তু মনের দিক দিয়া বড় বেশী বিপুল হইয়া আসিয়াছে সে।

তাহার মনের এ বিরাট ব্যাপ্তির সীমা খুঁজিয়া পায় না বিপাশা।

গীতি কাব্যের মাধুর্য বিলীন হইয়া গিয়াছে যেন মহাকাব্যের বিশালতায়।

বিশ্বরূপের দেহের ও মনের এ পরিবর্তনে ভীষণভাবে হোঁচট খায় বিপাশা। বিশ্বরূপ একটু বিব্রত হইয়া পড়ে। বিপাশা আজও ভোলে

নাই তাহার পুরাতন স্মৃতিকে। সেও ত ভোলে নাই বিপাশাকে! কিন্তু বিপাশা যাহা আশা করে তাহার নিকট তাহা কি সম্ভব তাহার পক্ষে। কয়দিন ধরিয়াই চিন্তা করে বিশ্বরূপ। কি করিবে সে। তাছাড়া তাহায় এ ভগ্ন স্বাস্থ্য, উহাও ত উপেক্ষা করার নয়। বিপাশার এই সুন্দর প্রাণরসকে সে নষ্ট করিবে কি করিয়া।

বিপাশাকে বুঝায় সে। প্রথম একটু ঠাট্টার সুরেই তোলে কথাটা। "এদ্দিনেও অন্য কাউকে ভালবাসতে পারলে না, বিপাশা।"

বিপাশা উত্তর দেয়, "তা' হ'লে কি খুশি হ'তেন।" মনে মনে সে স্তম্ভিত হইয়া ভাবে, "সত্যি কি খুশি হইত বিশ্বরূপ, অন্য কাহাকেও ভালবাসিলে।" উন্মনা হইয়া যায় সে। আট বছর আগের একটা স্মৃতির দমকা হাওয়া ছুঁইয়া যায় মনের তলায়।

বিশ্বরূপ একটু গভীর ভাবেই উত্তর দেয়, "খুশিই হ'তাম বিপাশা। আমার জন্য এ ভাবে তোমার জীবনকে অপূর্ণ রাখায় খুশি হ'তে পারি নি আমি।"

বিপাশার ভিতরটা যেন এক মুহূর্তে চুরমার হইয়া যায়। অভিমানে ভারি হইয়া আসে চোখের পাতা। এ নিষ্প্রাণ মানুষটির কাছে কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করিবে না সে। নিজেকে সংযত করিতে চায়। কিন্তু পারে না। চোখ ভাঙিয়া বুকের ভিতরের এক অফুরন্ত কান্নার গতি বাহির হইয়া আসে। বিশ্বরূপ তাকাইয়া দেখে, বিপাশা কাঁদিতেছে। বিপাশা আহত হইয়াছে তাহার কথায়, উহা সহিতে পারে না সে।

বিপাশার মাথায় হাত রাখিয়া বলে গাঢ় কণ্ঠে, "পাশা, তুমি আমায় ঠিক বুঝতে পারনি, তাই এত দুঃখ পাচ্ছ।"

বিপাশা নিজেকে সংযত করিয়া বলে, "আপনার কাছে এতখানি অপমান আশা করি নি।"

বিশ্বরূপ বড় বিপন্ন বোধ করে। কি করিয়া বুঝায় সে বিপাশাকে। তবু ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয়, "আমার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথাত তুমি জান, পাশা। শুধু তোমার আমার কথাত ভাবলেই চলে না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনগুলিকে কেন মিছামিছি নিজেদের অন্যায় স্বার্থপরতার জন্য নষ্ট করবো আমরা।"

বিপাশা চুপ হইয়া যায়। এ কি দুরূহ সমস্যা আনিল বিশ্বরূপ। উড়াইয়া দিতে পারে না এ দূরদর্শী চিন্তার যুক্তি।

বিপাশা আবারও কাঁদে। এই বোধহয় জীবনে প্রথম কান্না। তাই এত অফুরন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে চোখের জল।

বোঝে না সে কেন কাঁদিতেছে।

বিশ্বরূপ বুঝাইয়া যায়, "বিপাশা, ব্যক্তিগতভাবে শুধু জীবনকে চিন্তা করার যুগ আর নেই—"

বিপাশার কানে পৌঁছায় না সে কথা। তন্ময় হইয়া ভাবে সে, যদি জানিত তাহার এ দীর্ঘবছরের কল্পনার বিশ্বরূপই জীবিত আছে, আজও, তাহা হইলে এমন অসহনীয় হইয়া উঠিত না ব্যথা।

ধীরে ধীরে বিপাশা নিজেকে সংযত করে। জীবনের ধারা বহিয়া চলে আবার তাহার শিথিল স্নায়ুতে। আবার সেই হাস্যমুখরা বিপাশা।

পদ্মা ভাবে বিশ্বরূপের কথা। এ কয়দিনেই বুঝিয়াছে সে, এজাতীয় মানুষের জন্য বিবাহের প্রয়োজন নাই। সংসারের আর সমাজের প্রয়োজন আছে এ জাতীয় মানুষের, কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন নাই সংসারে। নিজেদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই এরা।

বিশ্বরূপ থাকে পদ্মাদের বাড়ীর নিকটেই একখানা ঘর লইয়া। মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়ীতেও থাকে। পদ্মা অবাক হইয়া ভাবে, কি অপরিসীম শক্তি এই দুর্বল মানুষটির। সমস্ত রাত ভরিয়া চলে শ্বাসনালীর অসহ্য যন্ত্রণা। তবু লেখনীর কি শ্রান্তিহীন দক্ষতা। দৃষ্টিতে আর অনুভূতিতে, কাগজে আর কলমে মূর্ত হইয়া উঠে মানবতাবোধ।

বিশ্বরূপের নূতন আরেকখানা বই ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। অরুণাভ কতকগুলি কাগজ দেয় পদ্মাকে, "পদ্মা, বিশ্বদার এ বইটার সব প্রুফগুলি তোমাকেই দেখে দিতে হ'বে।"

অরুণাভ সারাদিনের ক্লান্ত দেহ ইজি চেয়ারটায় এলাইয়া দেয়। শুইয়া শুইয়া ভাবে বিপাশার কথা। 'আশ্চর্য মেয়ে। 'এনজয় দি লাইফ,' এই যার মনের মূল কথা, তার পক্ষে এ জীবন যে কত বড় দুঃসহ! অথচ বাইরে থেকে বুঝবার সাধ্যি নেই এত বড় দুঃখ লুকিয়ে আছে ওর মনের গভীরে।"

পদ্মা তাহার রান্নাঘরের কাজ সারিয়া লয় তাড়াতাড়ি। রাতের ভিতরই দেখিয়া দিতে হইবে বিশ্বরূপের বইয়ের অনেকগুলি প্রুফ।

রান্নাঘরের জানালা দিয়া চোখ পড়ে নারিকেল গাছভরা আনত চিক্কণ পাতাগুলি জ্যোস্নায় স্নান করিতেছে যেন। বহু উর্ধে শুক্লপক্ষের চাঁদ মুঠা মুঠা কিরণ ছড়াইতেছে সমস্ত ভুবনে।

স্থির হইয়া যায় পদ্মার অচঞ্চল চোখ দুটি। উনানে ভাত ফুটিতেছে। পদ্মা এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। তাহার অন্তর হইতে যেন কি ক্রন্দন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া উঠে অনুক্ষণ। এ সুন্দর পৃথিবীতে আসিয়াছে সে কেন? শুধু কি অরূপণ সময়ের পূর্ণ পাত্র

দিয়া সমৃদ্ধ করিতেছে সে আয়ুকে ? শুধু আয়ুকেই উপলব্ধি করিতেছে প্রতিটি পদার্থের অনুভূতিতে। আর কিছুই নয় ? তাহার যে বেগবতী শক্তি, রস মাধুরী, তাহা সবই কি বৃথা লয় প্রাপ্ত হইবে শুধু আয়ুর সমাধিতে ?

ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠে, "বাঁচার মত বাঁচিতে চায় সেও। তাহার ভিতরের সৃজন শক্তিকে পরিপূর্ণ করিয়া বিকাশ করিতে চায় সেও এ অনন্ত পৃথিবীর মানুষের মাঝে।"

জানিতে চায়, জানাইতে চায়, পাইতে চায়, দিতে চায় সে এ পৃথিবীকে—অফুরন্ত মাধুরী দিয়া পূর্ণ করিতে চায় সে মুহূর্তকে। শুধু সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশ গুলিকেই নয়, অনুভব করিতে চায় সে নিজের পরিপূর্ণ সত্তাকে, এ বেগশীলা, এ রূপরস মাধুরীভরা পৃথিবীর মাঝে।

গভীর আবেগে মনে মনে উচ্চারণ করে, "আমার প্রণাম লও, বিপুলা পৃথিবী।"

ইতিহাসের গবাক্ষ খোলা। দূর অতীতের আর দূর ভবিষ্যতের গাঢ় পর্দাটা ভাসিয়া যায় মনের অবগুণ্ঠন তলে।

আদিম মানুষের সুপ্তিভঙ্গের সে বেদনা, সে সাধনা, সে আনন্দ যেন তাহারও মনে শিহরণের মৃদু স্পর্শ বুলাইয়া যায়।

নীল-নদের ধারে বিস্ময়ে নির্বাক দীর্ঘাকৃতি মানুষের প্রথম জীবনারম্ভ। পিরামিডের তলায় উষ্ট্রবাহী তীর্থ-পর্যটকের ভিড়। প্রাচীন পৃথিবীর নগ্নভূমির বুকে পৌর-সভ্যতার প্রথম আভাস—ইষ্টক-নির্মাণরত আদিম মানুষের রোমাঞ্চকর বৃহৎ কল্পনা, ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায় স্থির দৃষ্টির অতলে।

কিন্তু প্রথম মানুষের সেই বৃহৎ অভিযানের শেষ পর্ব কি শুরু হইয়াছে আজ এই রক্তঝরা যান্ত্রিক যুগের লৌহ যাত্রাপথে।

গাঢ় বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসে পদ্মার গভীর দৃষ্টিতে। মানুষের এ কঠিন মহাযাত্রার শেষ কবে? রাত্রি প্রভাত হইতে আর কতদিন দেরি। এ বন্ধুর পথ আর কতদূর?

রসস্রষ্টা নারীমনের ক্ষত হইতে কি ব্যথা যেন ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে। জীবনরসের মাধুরীকে আর যেন ভিতরে গুটাইয়া রাখিতে চায় না ভিতরের মন। ভিতরের মানুষ গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদে। মায়াময় পৃথিবীর বুকে ছায়া ঘনাইয়া আসে রূঢ় বাস্তবের।

অন্তরাত্মার চিরন্তনী পিপাসা আর্তনাদ করে।

পদ্মা উঠিয়া যায়, গুল দিতে হইবে। মধ্যবিত্ত সংসারের আবর্ত তাহাকে ছিঁড়িয়া আনিতে চায় পৃথিবীরই নাড়ী হইতে।

একতুপুর লাইনে দাঁড়াইয়া ঠিকা ঝিটি জানাইয়া গিয়াছে—কয়লা পাওয়া গেল না।

অথচ কাল সকালে অরুণাভের জন্য রান্না করার মতও কয়লা নাই ঘরে।

পদ্মা জ্যোৎস্নার আলোতে বসিয়া গুল দেয়। কিন্তু এ কাঁচা গুল দিয়া ত উনান জ্বলিবে না কাল ভোরে। কি করিবে ভাবিয়া পায় না পদ্মা। বিশৃংখলা, চতুর্দিকে বিশৃংখলা।

তাহার আজ মনে হয়, জীবনের সব রসটুকুই চুষিয়া লইয়াছে এই ক্ষুধার্ত যুগ।

তাহার আবাল্যের শিক্ষা, সংস্কার, আদর্শ সবই যে আজ এ যুদ্ধের ঘূর্ণিচক্রে ঘুরপাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, পদ্মার মনে ত উহার জন্য প্রস্তুতি ছিল না। তাই এত অসহনীয় লাগে সংসারের এই "নাই" 'নাই'—আর্তনাদকে।

অরুণাভের দুইজন বন্ধু আসিয়াছে—রাত্রিতে থাকিবে তাহারা। কিন্তু সর্বনাশ! চাউল ত নাই ঘরে। কাল সেই ভোরে দশটার আগে আসিবে না রেশনের চাউল।

অরুণাভ হাসিয়া বলে, "তাতে কি। পাঁউরুটিতে বেশ চলবে। এতে কিছু অসুবিধে হ'বে না ওদের।" কিন্তু পদ্মা যেন লজ্জায় মরিয়া যায়। এমন লক্ষ্মীছাড়া সংসারের গৃহিণী সে আজ! অতিথিরও যোগ্য যত্ন করিতে অক্ষম সে।

কিন্তু অরুণাভের বন্ধুদের খেয়ালই হয় না যে, তাহারা ভাত খাইতেছে না।

রাজনৈতিক তর্কে মত্ত হইয়া উঠে সবাই।

মনে মনে ভাবে পদ্মা, মানুষের শিরা-উপশিরায় যেমন রক্তধারা বহে, এদেরও মনের শিরা-উপশিরায় তেমনি রাজনীতির চিন্তাধারা বহিতেছে সর্বক্ষণের জন্য। এক মুহূর্তের জন্য এ চিন্তাধারা থামিয়া যাইতে পারে না। এ চিন্তাধারা থামিয়া যাওয়া এদের মৃত্যুরই সমান।

প্রসাদের আশংকা ঠিকই হয়। অনভ্যস্ত সুহাসিনীর দেহ এত অপ্রত্যাশিত মানসিক অশান্তিতে ভাঙিয়া পড়ে।

প্রসাদ আসিয়া দিনরাত সেবা করে মায়ের। চিত্রিতার পরীক্ষা নিকটে। তাছাড়া কোন কাজেই সে পদ্মা বা প্রসাদের মত পটু নয়।

সুহাসিনীর রোগের লক্ষণ খারাপের দিকেই চলে।

প্রকাশ ডাক্তার এ, কে, রায়-কে 'কল্' দেয়।

ডাক্তার ওষুধ আর পথ্যের লম্বা চার্ট লিখিয়া দিয়া যায়।

উর্মিলা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ডাক্তার আসা অবধি শাশুড়ীর মাথার কাছে পাখা হাতে একভাবে বসা। পা টন টন করিতেছে। চিত্রিতাকে ডাকিয়া বলে, "তুমি বস একটু—আমার আবার একটা নিমন্ত্রণ আছে এক বন্ধুর বাড়ীতে জলসায়।"

সুহাসিনী সারিয়া উঠে—কিন্তু মন আর জোড়া লাগে না।

উর্মিলার দিদিমা—সস্নেহে নাতনীর গায়ে হাত বুলায়, "কি চেহারাই হইছে। তা হইব না। চোটত আর কম গেল না শাশুড়ীর অসুখে। রোগীর সেবা-যত্ন, তার উপর এতবড় এক সংসার একলার ঘাড়ে। ও ত আর আজকালকার মাইয়া গো মতন না। দেওর-ননদ-শ্বশুর-শাশুড়ী সব লইয়াইত ঘর করতে হয়। জামাইর উপরইত সব নির্ভর। তোর পিশশাশুড়ীও ত তোগো সংসারেই থাকে, তাই না? দেওরও ত উপার্জন করে না শুনি। কমত আর না। শ্বশুরও কিছুই রাখিয়া যায় নাই। তার উপুর বিয়ার যোগ্যি ননদ। ভাবনা কি কম।"

সুহাসিনী শোনে সবই। নিজের পেটের সন্তানের বিরুদ্ধে মা হইয়া কি-ই বা বলিতে পারে সে কুটুম্বের কাছে। ভিতরটা পাথরচাপা থাকে, তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলার নাই তাহার। তাহারই সন্তান, তাহারই প্রকাশ। মূক হইয়া গিয়াছে সে আজ।

প্রসাদের মুখে সব শুনিয়া পদ্মা স্তম্ভিত হইয়া যায়। কিসের সম্মান উহাদের। কিসের মমতা?

প্রসাদ বিতাড়িত এ গৃহ হইতে। তাহার মাতা অবহেলিতা, তাহার জ্যেঠামণির হাতে গড়া একটি গোটা পরিবারেই ভাঙন ধরাইয়াছে উহারা।

অরুণাভ বুঝায়, "না হয়, তোমার দাদা একটু অপমান করবে তোমাকে। অপমানিত কার কাছে না হ'চ্ছ? এই যে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেল না খেয়ে এ কি আর কম অপমান। এ ও মনে করবে, তারই অংশ একটু। এত কষ্ট সইছেন তোমার মা, তাঁর কথা ভেবে তোমার যাওয়াই উচিৎ।"

পদ্মা আসে মার সঙ্গে দেখা করিতে। তিনবছর পর দেখা। মায়ের চেহারা দেখিয়া বাকরোধ হইয়া যায় পদ্মার। কোথায় সেই গর্বিতা, আভিজাত্যাভিমানী, তেজস্বিনী মহিলা! দিনের পর দিন কত তীব্র দুঃখ পাইলে সুহাসিনীর মত বিলাসী মানুষেরও এমন পরিবর্তন হইতে পারে, ভাবিয়া পায় না পদ্মা।

জীবনে যাহার চোখের জল দেখে নাই সেই দৃঢ়মনা সুহাসিনীও আজ মেয়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আকুল। "পদ্মা, এসেছিস মা।"

পদ্মা নির্বাক। মুখোশপরা বিকৃত সভ্যতার এইত নগ্নরূপ। তাহার দাদা আজকের ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত মাত্র। এ বিকলাঙ্গ সভ্যতায় ভাই নাই, বোন নাই, মা নাই, প্রেম নাই, প্রীতি নাই, আন্তরিকতা নাই—আছে শুধু ধনলিপ্সা আর স্বার্থান্ধতা।

প্রকাশ ও একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢোকে। সভ্যসমাজের রীতি অনুসারে পদ্মারও পরিচয় করাইয়া দিতে হয়।

"আমার বোন—পদ্মা বসু। আর ইনি আমার বন্ধু বিমান রায়।"

"নমস্কার। কোলকাতাতেই থাকেন, না বাইরে।" ভদ্রলোক মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

পদ্মা ছোট্ট উত্তর দেয় মাপা হাসি দিয়া।

যাওয়ার সময় পদ্মার দিকে তাকাইয়া আবারও নমস্কার জানায় বিমানবাবু "সামনের শুক্রবার নিশ্চয় দেখা পাব, মিষ্টার চৌধুরীদের বিবাহতিথি উৎসবে।"

পদ্মা হাসে স্মিত হাসি। বিমানবাবুর ভাল লাগে পদ্মার স্নিগ্ধ, নম্র ভাবটুকু। অভিনয়টা উৎরাইয়া যায় নির্বিঘ্নে। মনে মনে ভাবে প্রকাশ, না, বুদ্ধিমতী আছে মেয়েটা। তাহার মান বাঁচাইয়াছে বিমানবাবুর কাছে।

বিমানবাবু যাইতে না যাইতেই ঊর্মিলা আসিয়া পৌঁছায়। হাতে একটা স্থন্দর বুনানির বেতের ব্যাগ।

প্রকাশ পরিচয় করাইয়া দেয় আবার, "পদ্মা, আর এই তোমার বৌদি।"

ঊর্মিলা হঠাৎ খুশিতে যেন ঝলসিয়া উঠে।

"ও! পদ্মা নাকি। বৌদিকে দেখতে ত এলে না একদিনও।"

"বৌদিও ত দেখতে যায়নি কখনও।" মৃদু হাসিয়া বলে পদ্মা। তীক্ষ্ম মন দিয়াই দেখে সে ভ্রাতৃবধূকে। "ঐ দেখো, দেখা হ'তে না হ'তেই ঝগড়া শুরু হ'য়ে গেল। এই জন্যইত বলে, ননদিনী রায় বাঘিনী। আচ্ছা যাক, এবার তাইলে ডাকছি আসা চাই-ই সামনের উৎসবে।"

পদ্মা বোঝে, কেন দাদা-বৌদির হঠাৎ এ পরিবর্তন। মনে মনে ভাবে সে, "এ হ'চ্ছে 'সোসাইটি' জীবনের নূতন সাজ। একই বেশ পরিয়া সব রকম সোসাইটিতে থাকা চলে না। তাই বোনকে বাড়ীতে ঢুকিতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞাটা এই নূতন পরিবেশে বে-মানান হইয়া পড়ে।

পদ্মার নিকট আজ যেন সবই স্বচ্ছ স্ফটিকের মত লাগে উহাদের মনের স্তরভেদগুলি।

তবু রাজী হয় সে আসিতে।

তিনদিন পর যথাসময়ে আসে পদ্মা ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর বিবাহ তিথির উৎসব বাসরে।

খোলা ছাদের উপর ফুলের টব দিয়া সাজান কৃত্রিম বাসর। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার আস্তরণ মূল্যবান কার্পেটের উপরে। সেতার, বেহালা, তবলা সাজান সুন্দর কায়দায়।

বিলাতী ঢংয়ের চেয়ার টেবিল আজকাল এ স্বদেশী যুগে ফ্যাসান নয়।

বন্ধু বান্ধবীরা সবাই আসিয়া গিয়াছে। তাহাদের সাজ-সজ্জায় মনে হয় যেন কমপিটিসন লাগিয়াছে। কে কাহাকে হার মানাইবে রূপচর্চায়।

পদ্মাও একটু সতর্ক হইয়াই আজ রূপচর্চা করিয়াছে। তাহার মহীয়সী মূর্তিখানিই ধরিয়া দিতে হইবে অগ্রজের চোখে। খুবই সাধারণ সজ্জা। তবু সুন্দর লাগে তাহার এ নিজস্ব রুচির অনাড়ম্বর বেশ। চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে কোমল আভিজাত্যের ভাব— মুহূর্তের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় তবু প্রকাশ সহোদরার দিকে।

পদ্মার সচেতন গর্বিত দৃষ্টি এড়ায় না। আত্মতৃপ্ত মৃদু অহমিকা একটু ছুঁইয়া যায় মনের তলায়।

বিমানবাবুও খুশি হইয়া লক্ষ্য করে তাহাকে, 'নমস্কার! আপনার কিন্তু দেরি হ'য়ে গেল।"

পদ্মা মৃদু হাসিয়া প্রতি-নমস্কার জানায়। চোখের পলকে সে একবার তাকাইয়া দেখিয়া লয় উৎসব-বাসরের অতিথিদের। রূপসীর রূপকের মত লাগে যেন কোণের ঐ মোটা মানুষটিকে।

ওদিকে মজলিস জমিয়া উঠিয়াছে। গানের পর গান, সেতার, বেহালা, তানপুরার ঝংকার নিস্তব্ধ সন্ধ্যার বুকে।

পদ্মা ছাদের এক কোণে কার্নিসের ধারে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কথা বলে প্রসাদের সঙ্গে।

"আমাদের রূপসী স্কুলের সেই রূপক, না?"

প্রসাদ হাসিয়া বলে, "যা মোটা হ'য়েছে—চিনতে একটু কষ্ট হয়। তা ছাড়া মদের-মেদত।"

পদ্মা চমকিয়া উঠে, "মদ ধরেছে নাকি? এই বয়সেই?"

"ধরা মানে? চুর মাতাল।"

পদ্মা আর প্রশ্ন করিতে সাহস পায় না। সাংঘাতিক আরও কিছু শুনিয়া ফেলে যদি তাহার সহপাঠীর জীবন সম্বন্ধে।

মজলিসের গান ভাসিয়া আসে। কিন্তু পদ্মার মনে স্পর্শ করে না এ আনন্দ সঙ্গীত। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে দূর হইতে রূপককে। রূপসী স্কুলের ছিপছিপে সুন্দর ছোট্ট রূপুর কচি চেহারা ভাসিয়া ওঠে সুদীর্ঘ জীবনের পর্দার আড়াল হইতে। সেই সুন্দর ছেলে রূপকের আজ এ কি পরিণতি?

মাংসল দেহের উপর আদ্দির জামাটা ঘামে ভিজিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে স্থানে স্থানে। পানখাওয়া লালরসে ভেজা ঠোঁট আর চোখের হালকা পরিহাস যেন এক ভয়াবহ জীবনেরই ইঙ্গিত জানাইতেছে।

সুরের পর সুর ভাসিয়া চলিয়াছে আসরে। কিন্তু পদ্মার চোখের সামনে ভাসিয়া যায় রূপকের অতীত জীবনছবি। গোপন স্বদেশী যুগে সুকল্যাণদের সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া ফিরিত এই রূপক পুলিশের চোখের আড়ালে কত রাতের পর রাত। সেই রুক্ষ বেশ, নির্ভীক যুবক, ফেরার রূপুর এই পরিণতি!

প্রসাদ আস্তে আস্তে বলে, "আমাদের পার্টিতেও কমদিন কাজ করেনি রূপক ব্যানার্জী। পার্টি সভ্যও ছিল।"

পদ্মা নিস্তেজ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "এখন।"

"এখন আর কি, যা দেখছো চোখের সামনে। পার্টি থেকেও এক্সপেল্‌ড। এদিকে ব্ল্যাকমারকেটে বেশ কিছু পয়সাও হ'য়েছে। বৌও মরল বিষ খেয়ে এই সেদিন। সবাই ভাবতো, এবার বোধহয় মোড় ফিরবে। স্বর্ণদিকে চিনতে ত? তার সঙ্গেই বিয়ে হ'য়েছিল।"

পদ্মা ধীর কণ্ঠে বলে, "মোড় ফেরার হ'লে কি আর বিষ খেত স্বর্ণ।"

দুইজনেই চুপ হইয়া যায়। পদ্মা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, "এই ত জীবন চলেছে এ যুগের?"

পদ্মা ভাবে, স্বর্ণলতার কথা। তাহাদের গ্রামের পোষ্টমাষ্টার বাবুর মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতো রূপককে। তারপর ওর বাবা বদলি হ'য়ে যাওয়ার পর আর খবর পায় নাই পদ্মা স্বর্ণলতার। একেবারে সংবাদ না পাইলেই ভাল হইত, তার জীবনের এ করুণ সমাপ্তির কাহিনী শোনার চাইতে।

প্রসাদ বলিয়া যায়, "অবশ্য স্বর্ণদিরও দোষ ছিল। সে তার স্বামীর আদর্শকে বুঝতে পারেনি, বুঝেছিল শুধু তার দারিদ্র্যকে। ফলে যা হয়।"

পদ্মার মনটা ভিজিয়াই থাকে সারাক্ষণ। ঊর্মিলার নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসে সে।

তাহার আর এ আনন্দের আসরে ভাল লাগিতেছে না। বাড়ী গিয়া একটু একা থাকিতে চায় এখন।

কলকণ্ঠ মুখর রূপসী স্কুলের সহপাঠীরা সব কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জীবনের কি পরিণতি ঘটিয়াছে জানে না পদ্মা। জানিতে চাহেও নাই এতকাল। আজ সকলেরই অস্পষ্ট ছবিগুলি মনে পড়ে।

বিশ্বরূপ মাঝে মাঝে আসিয়া থাকে অরুণাভের বাড়ীতে। পদ্মা পরম আগ্রহে রান্না করে তাহার জন্য, যত্নের সহিত পরিবেশন করে। অরুণাভকে খাওয়াইয়া কোনও আনন্দ পাওয়া যায় না। একহাতে পত্রিকা লইয়া, আরেক হাতে মুখে গ্রাস তোলে। কি দিয়া যে কি খাইল কিছুই টের পায় না সে।

বিশ্বরূপ লক্ষ্য করে পদ্মাকে। মৃদু হাসিয়া বলে অরুণাভকে "এ যে কয়েদীর জীবন!"

পদ্মা চমকিয়া উঠে মনে মনে বিশ্বরূপের এ উক্তিতে। কিন্তু অরুণাভ মৃদু হাসিয়াই উত্তর দেয়, "এ কয়েদ জীবনত সে স্বেচ্ছায়ই মাথা পেতে নিযেছে।"

বিশ্বরূপ চুপ করিয়া থাকে, তাহার মন গ্রহণ করে না এ উক্তি।

পদ্মা বিস্মিত হইয়া ভাবে, এ মানুষটি মানুষের ব্যথার স্থানের এত গোপন সংবাদ জানে কি করিয়া!

রাত্রিতে ঘরে ঢুকিয়া দেখে পদ্মা, অরুণাভ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মৃদু হাতে একটু স্পর্শ করে সে তাহার ঘুমন্ত ললাট। প্রশান্ত দৃষ্টিতে দেখে সে অরুণাভকে। কি মদির আকর্ষণ ঐ বলিষ্ঠ দেহ ভঙ্গিতে। প্রেমভরা আয়ত চোখ দুটি স্থির হইয়া যায়। একটা

দুঃখের রেশ লাগিয়া থাকে তাহার প্রেমার্ত চোখে। পদ্মা ঘুমায় না। বহুদিন পর আজ সে ভাবিতে চায় অরুণাভের কথা।

বেদনা জড়িত কোমল অনুভূতি শিরায় শিরায়। অরুণাভকে ভালবাসে সে। পাইতে চায় তাহাকে আরও নিবিড়ভাবে। তাহারই কর্মময় জীবনের সুর দিয়া বাঁধিতে চায় আজ সেও নিজেকে। তবু একসঙ্গে চলিতে পারে না সে। কি একটা সচেতন পার্থক্য অনুভব করে ভিতরে ভিতরে—যেন একটা রূঢ় বাস্তবের গভীর পরিখা দুইজনের মাঝখানে। পার হওয়ার কৌশল জানে না পদ্মা। তাই দূর হইতেই দেখে সে, অরুণাভ, তাহার সেই প্রিয় অরুণাভ, আজ কোন দূর জনস্রোতে হারাইয়া যাইতেছে। তাই জীবন ভরিয়া একাই অপেক্ষা করিতে হইবে তাহাকে। অরুণাভ জানিবেও না তাহার এই একলা চলার ক্লান্তিতে ভাঙিয়া-পড়া মনের সংবাদ।

পদ্মার মনে সহস্র অভিমান তোলপাড় করে। আহত আত্ম-অহমিকায় চোখ ভিজিয়া উঠে তাহার। কি একটা বেদনা—অসহ্য যাতনার দাহ অন্তরে।

সে আর সহিতে পারিতেছে না এ অকৃপণ সময়ের অত্যাচার। নিঃশব্দে উঠিয়া যায় ছাদে।

মাথার উপরে তারায় তারায় ভরিয়া গিয়াছে গাঢ় নীল আকাশ। ভুবন ব্যাপী সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি।

কিন্তু হারাইয়া-ফেলা যে অনুপম সুন্দরকে প্রতিনিয়ত কামনা করিতেছে সে, তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে কবে। দোসর-হারা আত্মার এ বিরহ ক্রন্দন কি কোনদিনই থামিবে না।

ছাদের ঘরে শুইয়া শুইয়া লিখিতেছে বিশ্বরূপ। সে টের পায় সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ। বোঝে, পদ্মাই আসিয়াছে ছাদে। ঘণ্টাও

কাটিয়া যায়। কিন্তু পদ্মাত নামে না। দুয়ার খুলিয়া বাহির হয় বিশ্বরূপ। মনে মনে ভাবে, এ সময়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন খুবই, সহজেই অসুখ হইতে পারে। বিশ্বরূপ শুনিয়াছে বিপাশার মুখে, পদ্মার সন্তান আসিতেছে। বিশ্বরূপ ডাকিয়া বলে, "এ হিমের রাতে ছাদে থাকলে ঠাণ্ডা লাগবে না,' পদ্মা ?"

উঠিয়া গিয়া বিস্মিত হয় পদ্মাকে কাঁদিতে দেখিয়া। মাথায় সস্নেহ স্পর্শ করিয়া বলে, "পদ্মা, কি হ'য়েছে, বলত।" বহু, বহুদিন পর পদ্মা যেন এত আন্তরিক হাতের স্পর্শ অনুভব করিল। এ সহানুভূতির স্পর্শে তাহার বুক ভাঙিয়া কান্না আসিতে চায়। বিশ্বরূপ স্নেহের সুরে বলে, "যাও, শোও গিয়ে, পদ্মা। ঠাণ্ডা লাগিও না। আরও একজনের কথাত ভাবা উচিৎ এখন তোমার।"

পদ্মা নিঃশব্দে নীচে নামিয়া যায়।

বিশ্বরূপের আর লেখা হয় না। শুইয়া শুইয়া ভাবে সে পদ্মার কথা।

গ্লাস্ ফ্যাক্টরীর পেছনে একটা খোলা জায়গায় শ্রমিকদের মিটিং হইতেছে। দুইটি কলেজে-পড়া ছেলে আসিয়াছে বক্তৃতা দিতে। সূর্য একটু আগাইয়া যায়। এখানে রূপসী গ্রামের সেই প্রসাদকে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠে দুই ভাই-ই।

প্রসাদের চেষ্টাতেই এই ফ্যাক্টরীতে একটা ইউনিয়ন হইতেছে। সূর্য ও প্রতাপ ইউনিয়নের মেম্বার হয়।

সূর্য ত ইহাই চায়। বড় লোক মালিকদ্বারা পদে পদে নীরবে অপমানিত হইতে রাজী নয় সে। কাজের এতটুকু চুলচেরা এদিক ওদিক হইলেই হুমকি আসে—'চাকরি থাকবে না।' কাহার চাকরি কে রাখে, একবার দেখিয়া লইতে চায় তাহারাও।

খুশি মনেই বাড়ী ফেরে সেদিন সূর্য। প্রসাদ আর সমীরের উপর আস্থা বাড়িয়া গিয়াছে তাহার।

বয়স কম হইলে কি হইবে। খাঁটি কথাই বুঝায় তাহারা ছোট ছোট মিটিং করিয়া। সত্যিইত তাহাদের ভবিষ্যৎ চিরকালই যে এত দুঃখের থাকিবে, এমন কোনও নিয়ম থাকিতে পারে না পৃথিবীতে। তাহারাও য'দ লেখাপড়া শিখিতে পাইত, তবে তাহারাও ঐ বড়লোকবাবুদের সমকক্ষ হইতে পারিত বিদ্যায়, বুদ্ধিতে।

ইউনিয়নের কাজে সূর্যের উৎসাহ প্রচুর। প্রতাপেরও কম নয় আগ্রহ। তাহাদের গ্রামের জমিদারবাড়ীর সেই সিদ্ধেশ্বর আসিয়া আবার এই ফ্যাক্টরীতে ছোটবাবু হইয়া বসিয়াছে। পান হইতে চুন খসিলেই আগুন হইয়া উঠে সিদ্ধেশ্বর। মদের মেজাজ। একবার জ্বলিলে আর রক্ষা নাই। ঐ ত সেদিন তাহাদেরই প্রতিবেশী ভজুয়াকে এক লাথি মারিয়া গেল। তাহার অপরাধ, হাত হইতে একটা কাচের চিমনী পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল।

আর যত নজর ঐ মজুরণীদের উপর। একটু ভাল চেহারা হইলেই ওর জ্বালাতনে অস্থির হইতে হয়। এই জন্যইত প্রতাপ তাহার বৌকে ঢুকায় না কাজে। এত যে অভাব সংসারে, তাও। মদন কত খোশামুদ

করে। বলে, "কি-ই বা কাজ। শুধুত প্যাকিং করা। সুন্দরবৌকে আমি কাজ জুটাইয়া দেই ছোটবাবুরে বইলা।"

প্রতাপ রাজী হয় না। মান ইজ্জৎ সবার আগে।

সূর্য আর প্রতাপ দুই ভাই-ই ভাল "ব্লোয়ার"। তবু তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয় ছোটবাবু। প্রায়ই আসিয়া ধমক লাগায়, এটা একটু বাঁকা হইয়াছে। ওটা একেবারেই হয় নাই।

প্রসাদ আসে ঘন ঘন। মাঝে মাঝে সূর্যদের বাড়ীতেও যায়। সিন্ধুবালার খুশির সীমা থাকে না। তাহাদের মাষ্টারবাবুর ভাইপো আসিয়াছে। আবার তাহার সঙ্গে যে দেখা হইবে গ্রামের কোনও মানুষের, একথা যেন সে এখন ভাবিতেও ভুলিয়া গিয়াছে। কতকাল দেখে না গ্রামের মানুষদের। তাড়াতাড়ি মাদুর বিছাইয়া দেয় বসিতে। কি ভাবে যে অভ্যর্থনা করিবে ভাবিয়া পায় না। কথা আর ফুরায় না তাহার। কেমন আছে মাষ্টার বাবু, বাবুর বৌ, দিদি, গ্রামের আর সকলে। পদ্মা এখানেই থাকে? এই কলিকাতায়ই? আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয় সুন্দরবৌয়ের মনে। এই কলিকাতায়ই আছে পদ্মা। অথচ কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নাই!

বিচিত্র দেশ এই কলিকাতা!

"পদ্মাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। জামাইবাবু কেমন হইছে দেখতে?"

"চল না একদিন। দেখে আসবে তাদের। রবিবারে যেও প্রতাপের সঙ্গে, সেদিন গেলে জামাইবাবুকেও দেখতে পাবে।"

সূর্য, প্রসাদ আর সমীরের খাটুনির আর বিরাম নাই। মিটিং-এর পর মিটিং। ঘরের আঙ্গিনায় ছোট ছোট বৈঠক, যাহারা বেশী একটু নিরাশাবাদী কিংবা অদৃষ্টবাদী—তাহাদের লইয়া। তারপর অসুখ-

বিসুখে ডাক্তার দেখান, চিকিৎসার ব্যবস্থা, ছুটি মঞ্জুর করান। কাজের অন্ত নাই।

ম্যানেজারেরও কানে যায় কথাটা। তাহাদেরই ফ্যাক্টরীর ইউনিয়ানে লালঝাণ্ডার তলায় একটা বড় সভা হইয়া গিয়াছে গত রবিবারে। প্রায় সব মজুরই যোগ দিয়াছে। প্রধান বক্তা নাকি তাহারই ছোট ভাই প্রসাদ। প্রকাশ একটু চিন্তিত হইয়া উঠে মনে মনে, কম্যুনিষ্টদের ব্যাপার সব। বলা যায় না কি করিয়া ফেলে এরা। আবার প্রসাদই এর আসল উদ্যোক্তা। ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে সে। "দেখা যাবে তোর বড় ভাইয়ের উপরে টেক্কা দেওয়া কদ্দুর হয়।"

প্রকাশ বেল টেপে। বেয়ারা আসিয়া সেলাম জানায়। ছোটবাবুকে ডাকাইয়া পাঠায়। কুটিল পরামর্শ দিয়া দেয় সিদ্ধেশ্বরকে। এ ইউনিয়ান ভাঙার উপযুক্ত লোক মদনই। মদনকে চেনে প্রকাশ বহুকাল ধরিয়া। তাহার এরোড্রামে কন্‌ট্রাক্ট নেওয়ার কাজের সময় হইতে মদন আছে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট।

তাছাড়া দালালের কাজে হাত পাকা তাহার। বিষ দিয়াই বিষের ক্ষয়।

প্রকাশ শ্লেষের সুরে উচ্চারণ করে, "প্রোলিটারিয়েট। কতকগুলি বুলি মুখস্ত করে হুজুগে মেতে, নিজের জীবনটিও যে নষ্ট করছে বেকুব, তা' কি বোঝে প্রসাদ। মাথা ছিল ছেলেটার। এখন ঐ কম্যুনিজম ঢুকেই সব গোল্লায় গেছে।'

মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল প্রকাশ, প্রসাদকে বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করাইয়া আনিবে। তারপর দুই ভাইয়ে একসাথে একটা বড় ফ্যাক্টরী খুলিবে।

প্রকাশ একলা ঘরেই আবার উচ্চারণ করে বিদ্রূপের সুরে-সর্বহারা-দল !

সূর্য একজোড়া জুতা কিনিয়া আনিয়াছে ভাইয়ের ছেলের জন্য। সস্তা দামের নূতন জুতা। সরু সরু রুগ্ন পায়ে জুতা পরিয়া কি খুশি ছেলে, তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে সূর্য।

সিন্ধুবালাও খুশিতে উপছাইয়া উঠে। প্রতাপকে ডাকিয়া বলে, "দেখো, আমাগো খোকাও জুতা পায়ে দিছে। এইবারকার মায়না পাইলে একটা লাল 'পিরান' কিন্যা দিও কোকারে।" অনুরোধ জানায় স্বামীর নিকট।

প্রতাপ একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাকায় ছেলের দিকে—গরীবের সন্তান ! একটা ভাল জামাও সে দিতে পারে নাই কোনদিন ছেলেকে।

ছেলের ওষুধ কিনিতে কিনিতেই ফতুর হইল তাহারা। অসুখই ছাড়ে না ছেলেটার। প্রতাপেরও শরীর এত খাটুনিতে আরও রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তবু সিন্ধুবালার স্বপ্ন মিলাইয়া যায় না।

একটা ভাঙা পেয়ালায় লাল ওষুধ ঢালিতে ঢালিতে ভাবে, এই ওষুধেই ভাল হইবে ছেলে, ভাল হইবে প্রতাপ। ধীরে ধীরে আয় বাড়িবে, তাহাদেরও দিন ফিরিবে। সুদিন আসিবে দেশের। পাশের ঘরের বৌয়ের কাছে শুনিয়াছে সে, শীগ্‌গীরই নাকি মায়না বাড়ানর জন্য ষ্ট্রাইক হইবে কারখানায়। কেহ কাজে যাইবে না। তারপর মায়না না বাড়াইয়া পারিবে না মালিকেরা।

পরের দিন হইতে ষ্ট্রাইক আরম্ভ হয়। কেহই কাজে যাইবে না। বাতাস কাঁপাইয়া 'ভোঁ' পড়ে। অভ্যাসমত ঘুমও ভাঙে সকলের।

উঠানে বসিয়া আলোচনা করে—। বেলা বাড়ে, খোলার চালে চালে রৌদ্র তাতিয়া উঠে। সন্ধ্যা হয়, রাত হয়। দিনের পর দিন যায়, কেহ কাজে যায় না।

প্রসাদ আসিয়া ঘুরিয়া যায়। তাহার মনে একটা খুশির রেশ ছুঁইয়া যায় ফ্যাক্টরীর এই ঘুমন্ত চেহারা দেখিয়া। আবার চিন্তা আর দায়িত্বের চাপে চাপা পড়িয়া যায় এ আনন্দ।

সূর্যেরও চোখেমুখে খুশির আমেজ চুয়াইয়া উঠে। একজনও কাজে যায় নাই—পূর্ণ হরতাল।

প্রসাদ আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে, "আমরা কিন্তু একজন ভাল 'ক্যাডার' পেয়ে গেলাম এই ফ্যাক্টরীতে এসে।"

সূর্য ঘরে গিয়া দেখে, প্রতাপের ছেলের ভীষণ জ্বর। সিন্ধুবালা বসিয়া কাঁদিতেছে। "এখনও যদি ডাক্তার না আন, তবে এ ছেলেরে কি যমের হাত থেইকা বাঁচান যাইবো।"

প্রতাপ উত্তর দেয়, "ডাক্তার যে আনুম তার ভিজিটের টাকা কি তুমি দিবা।"

সিন্ধুবালা ফুলিয়া উঠে, "আরও কামে যাইও না। তবেই টাকা আইবো গাছের থেইকা। ঘরে যার টাকা আছে, তারা কামে না গেল। আমাগো কাম না করলে খাওন আসবো কই থেইকা।"

এতক্ষণে সূর্য উত্তর দেয়, "টাকাই যদি ঘরে থাকবো, তবে আর ষ্ট্রাইক করুম ক্যান।"

সিন্ধুবালা জ্বলিয়া উঠে, "তোমারত আর পোলা না, তুমি বুঝবা কি।',

সূর্য ক্ষুব্ধ হয় ভাই-বৌয়ের কথায়। তবু উত্তর দেয় শান্ত ভাবেই, "আউজকা না হয় কামে গিয়া দুগা টাকা আনল, কিন্তু

কাউলকাই যে কাম থেইকা উঠাইয়া দিব না আমাগো, তার ঠিক কি। আর এই মায়নায় কদ্দিনই বা চালাইবা শুনি। মদনের কাছে কর্জ হইতাছে না প্রত্যেক মাসেই। মদন যদি আর কর্জ না দেয় তখন কি করবা ”

সিন্ধুবালা বোঝে সূর্যের কথা সবই ঠিক। তবু অশান্ত অবুঝ মাতৃহৃদয়ের দুঃখে; উত্তেজনায় গর্জিয়া উঠে স্বামীর উপর, “তুমি পুরুষ মানুষ হইয়া যদি ছেলেরে বাঁচাইতে না পার, তবে আমিই এর ব্যবস্থা করুম।” বলিয়া বাহির হইয়া যায় সে ঘর হইতে মদনের ঘরে।

মদনত ইহাই চাহিতেছিল। সে উত্তর দেয়, “আমার কাছেত টাকা নাই। তবে ছোটবাবুর মন বড় দরাজ। গরীবের প্রতি মায়া দয়া খুব, তার কাছে গিয়া চাইলেই টাকা পাইবা।”

সিন্ধুবালা চেনে ছোটবাবুকে। তাহাদেরই গ্রামের সেই সিদ্ধেশ্বর। থমকিয়া যায় সে। মনে মনে ব্যঙ্গ করে, “গরীবের প্রতি মায়া দয়া ছোটবাবুর !”

মদন বারে বারেই বলে, “চল একবার তার অফিসঘরে। খালি হাতে ফিরবা না।”

কিন্তু সিন্ধুবালা রাজী হয় না। মদনের ঘর হইতে কমলার ঘরে ঢোকে।” দিদি দুইটা টাকা ধার দিতে পারেন। এখন ডাক্তার না ডাকলে ছেলেরেত বাঁচানই যাইব না।” চোখ ভিজিয়া উঠে তাহার। কমলাও দেখিয়া আসিয়াছে সিন্ধুবালার ছেলের অবস্থা। বাঁচে কিনা সন্দেহ। মায়ের প্রাণ। মায়ের ব্যথা যে কি বোঝে, সেও। তাহার ঘরেও টাকা নাই। থাকিবেই বা কোথা হইতে, বোঝে সিন্ধুবালা। একইত অবস্থা সকলেরই। তার উপর ষ্ট্রাইক চলিতেছে।

তবু লক্ষ্মীর কৌটা খুলিয়া সিন্দুর মাখান পয়সাগুলি বাহির করে কমলা। গুণিয়া দেখে, দুই টাকা বারো আনা পয়সা জমিয়াছে। সুন্দর বৌর মনটা ইতস্তত করে—লক্ষ্মীর কৌটার পয়সা! কিন্তু উপায় নাই। অভিশপ্ত দারিদ্র্য। অভিমানের সুর ফুটিয়া উঠে, কণ্ঠে, "বাপ খুড়াত কাজ কামাই কইরা আছেন, এদিকে ঘরেত খাওন নাই।"

কমলা উত্তর দেয়, "বোন—কামাই না করলেও কি কোনও লাভ হ'তো। বড়লোকরা কেবল ফুলবেই, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা শুধু না খেয়েই মরবে! দুমূর্ল্যের বাজারে, মায়না বাড়াবে না, এ অন্যায় জিদত চিরকাল সওয়া যায় না। নিজেইত দেখছো, রোগে রোগে কেমন নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছে ছেলেটা, তাও এককোঁটা ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই তোমার।"

সিন্ধুবালার চোখ ভাঙিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। নিঃশব্দে আঁচলে চোখ মোছে। জ্বালাময়ী প্রতিহিংসার নীরব অভিশাপ গলিয়া গলিয়া পড়ে উষ্ণ অশ্রু মাঝে। "এরা এত ধনী, তাও এত অর্থের তৃষ্ণা! আমাগো সন্তানদের একটু বাঁচতেও দিবো না? এর বিচার কে করবে?"

দূরে প্রতিধ্বনি বলে, তোমরাই করবে, এর বিচার তোমরাই করবে।

সিন্ধুবালার ছেলের জ্বর ছাড়িয়াছে। তবে ডাক্তার বলিয়া দিয়াছে, খুব সাবধানে না রাখিলে, বেশী করিয়া দুধ না খাওয়াইতে পারিলে এ ছেলে বাঁচিবে না।

তাহারইত বরাৎ। এত বয়সে, কত মা মনসার দুয়ারে ধর্ণা দিয়া যাও বা একটি ছেলে হইল, তা'ও এমন হাড়-গিলা ছেলে, যে বাঁচিবে কিনা কে জানে? সবই অদৃষ্ট। না হইলে তাহাদের মত ঘরে আবার

ছেলেকে দুধ খাওয়ায় কে। চাউলবাটা সিদ্ধ কি বড়জোর সাবু-বার্লি খাইয়াইত বড় হইয়া উঠে সকলের সন্তান।

ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে মায়ের বুক হইতে।

সিন্ধুবালা ছেলেকে শোয়াইয়া স্নান করিতে যায়। কলতলায় যাইতে যাইতে চোখ পড়ে ছোট সিন্ধুর মুখের দিকে। মুখখানা বড় শুকনো লাগে যেন। সে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, "সিন্ধু, ভাত খাস নাই ?"

"না, আজ ত ভাত রান্না হয় নাই।" নিস্তেজ কণ্ঠে উত্তর দেয় সিন্ধু।

বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে সুন্দর বৌর। নিশ্চয়ই চাউল নাই ঘরে। নিজের ঘরের অবস্থা দিয়াই বোঝে অন্য পাঁচজনের ঘরের অবস্থা। প্রসাদরা চাঁদা তুলিয়া কিছু কিছু চাউল দিয়াছিল ঘরে ঘরে। কিন্তু উহাতে কয়দিন আর চলে।

একবেলা করিয়া ফেনা ভাত খাইতেছে তাহারা শুধু লবণ দিয়া। তবু স্বামীকে আর কাজে যাইতে বলে না সে। সত্যিইত বড়লোকের কিন্নু-দাঁত ভাঙা দরকার।

সিন্ধুবালা ডাকে কমলার মেয়েকে, "চল আমার সঙ্গে। আর তোর ভাইয়েরেও ডাইকা আন।"

ঘরে আসিয়া নিজেদের ফ্যানাভাতটুকু লবণ দিয়া মাখিয়া দেয় ভাই বোনকে। তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে, কি তৃপ্তির সঙ্গে আঙুল চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছে ফ্যানা-ভাতটুকু। মনে মনে ভাবে, "আহারে! এতটুকু পোলাপানরা কি আর না খাইয়া থাকতে পারে ?"

ভাত খাওয়া হইলে দুই ভাইবোন পরম আহ্লাদে মাকে জানায়, মা, "মাসী আমাদের খাইয়ে দিল।"

বুকের কাছে টানিয়া লয় কমলা ছেলেমেয়েকে, "কাল তোমাদের আমি ভাত রেঁধে দেব।"

মিথ্যা আশ্বাস। কমলার চোখ ভিজিয়া উঠে। সব ঘরেইত আজ এই অবস্থা। কে কাহার সাহায্য করিবে? বীরুর বৌর ছেলেপুলে হইবে—পূর্ণমাস। তাহারও পুরা একদিন উপোস গিয়াছে। তবু প্রসব ব্যথার মতই দাঁতমুখ চাপিয়া সহ্য করিতে হইবে এ কষ্ট।

ইউনিয়ানের শ্রমিকরা কেহ কেহ পিকেট করিতেছে ফ্যাক্টরীর দুয়ারে! প্রসাদ, সমীর আর তাহারই কলেজের ছাত্রী পার্বতী আসিয়াছে পিকেটারদের সঙ্গে।

মদন একটু দমিয়া যায় ভিতরে ভিতরে। মনে মনে ভাবে, এখন হইতেই টাল সামলান দরকার।

সন্ধ্যার পর কয়েকজন গুণ্ডা দোস্তকে ডাকিয়া কি পরামর্শ করে।

"কি ভাই পারবে ত?"

"এ সামান্য কাজ পারবো না? তবে আর জেলখানায় লালটুপী পরে ছিলাম কেন?" বুক ফুলাইয়া উত্তর দেয় দাগী আসামী তিনু।

তিনু এখন মদের আড্ডায় মদনের বড় দোস্ত। প্রাণ ভরিয়া মদ খায় দুইজনে। তারপর রাত্রি শেষে ঘরে ফেরে। ভোর বেলায় সূর্যের কাছে আসিয়া বসে। "কি আজও কাজে কামাই নাকি?" মুখ দিয়া তাহার মদের গন্ধ ভুর ভুর করে।

সূর্য কথা বলে না; তাহার চোখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠে।

দুপুরবেলা মদনের সাকরেদ ঢুকিতে চায় ফ্যাক্টরীতে। বাধা দেয় পিকেটারেরা। দুই চারটা কথা কাটাকাটি হইতেই সে এক

চড় বসায় একজন পিকেটারের গালে। সেও উত্তেজিত হইয়া উঠে। তিমু প্রস্তুতই ছিল।

কোথা হইতে আসিয়া সে একটা ইঁট তুলিয়া মারে। সূর্যের কপাল ফাটিয়া যায়।

ছোট্ট একটু সংঘর্ষও হয়। পার্বতীও আহত হয় সামান্য।

ইউনিয়ানে দারুণ উত্তেজনা দেখা দেয় এ লইয়া। মেয়ে মানুষেরও গায়ে হাত তোলা—দেখিয়া লইবে তাহারাও।

প্রসাদ আসিয়া বুঝায়—এ সবই দালালের চক্রান্ত।

অরুণাভের পত্রিকাতে একটা রিপোর্ট দিয়া আসে সে। অরুণাভই এখন নিউজ-এডিটার। অসুবিধা নাই তাই, সত্য রিপোর্টই ছাপা হয়।

প্রকাশের শ্বশুর বাড়ীর দেশের দত্তগুপ্তদের কাগজে কাজ করিতেছে এখন অরুণাভ।

উর্মিলা পত্রিকাটা পড়িয়া বলে, "দেখেছো, তোমাদের ফ্যাক্টরীর কথাও আছে। দালালের গুণ্ডা দিয়ে নাকি ষ্ট্রাইক ভাঙার চেষ্টা চলেছে।"

প্রকাশ পত্রিকাটায় চোখ বুলায়।

অফিসে গিয়াই ফোন করে দত্তগুপ্তকে।

"ইমার্‌সন ওষুধের কোম্পানীর অ্যাড্‌ভারটাইজমেণ্টের বিষয় আমি কথা বলেছি। হয়তো বছরে হাজার ইঞ্চ অ্যাড্‌ভারটাইজমেণ্ট পেতে পারেন আপনি। অবশ্য এখনও কথা পাকা হয়নি। আপনি আসবেন একদিন আমার এখানে। নমস্কার।

"ওঃ, আরেকটা কথা। আপনার পত্রিকায় দেখলাম আমাদের ফ্যাক্টরীর ষ্ট্রাইক সম্বন্ধে রিপোর্ট উঠেছে। কিন্তু ওটাত ভুল খবর। আসল সংবাদ—শ্রমিকে-শ্রমিকেই সংঘর্ষ হ'য়ে গিয়েছে কাল।

একদল শ্রমিক কাজ করতে চাইছিল—পিকেটাররা বাধা দেওয়ায় মারপিট হয়। আর সব কাগজেইত ঠিক বিবৃতি ছাপিয়েছে। কিন্তু আপনাদের রিপোর্টার সম্ভবতঃ নিজে রিপোর্ট দেয়নি।”

দত্তগুপ্ত চিন্তিত হয়। মিঃ চৌধুরীকে চটাইলে ইমারসন কোম্পানীর এত টাকার অ্যাডভারটাইজমেণ্টটা হাতছাড়া হইয়া যায়।

নিউজ এডিটারকে ফোন করে সে।

“মিঃ চৌধুরীদের গ্লাস-ফ্যাক্টরীর ঐ ষ্ট্রাইক সংক্রান্ত আজকের রিপোর্টটায় ভুল খবর বেরিয়েছে আমাদের কাগজে। ওটা আপনি একটু খোঁজ নেবেন।”

অরুণাভ বলে, “ভুল খবর ত নয়। আমি বিশেষ ভাবেই জানি, এ সংবাদ এতটুকু ভুল ছাপা হয়নি।”

“তা যা’ হোক। এর পরে এদের ফ্যাক্টরী সম্বন্ধে কিছু ছাপাতে আমার সাথে একটু কন্‌সাণ্ট্‌ করবেন।”

অরুণাভ অপমানিত বোধ করে।

মনে মনে ভাবে, ‘এইত বর্তমান গণতন্ত্রের রূপ। রুলিং ক্লাস জনমত প্রকাশের সব ইন্সট্রুমেণ্ট গুলিকে এভাবেই চেপে ধরে আছে। অ্যাডভারটাইজমেণ্ট দিয়ে কি ভাবে ধনিক-শ্রেণী সমস্ত পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করছে এদেশেও, তা’ তো চোখের উপরই আজ দেখছে সে।’ গণতন্ত্রের নামে কি প্রহসনই চলিতেছে দুনিয়াব্যাপী’!

বিপাশা আসিয়া বলে, “পদ্মা, একটা ভাল সোভিয়েট ফিল্ম এসেছে—‘গর্কীর বাল্যকাল’। চল, দেখে আসি।”

গর্কীর জীবনীর নামে পদ্মা এক-বাক্যে রাজী হয়। ‘লবিতে’ আসিয়া দেখে—কমরেডরা আর কেহ বাদ নাই। পদ্মাকে দেখিয়া পরিচিত এক

পুরাণো কমরেড বলে, "কই আপনাকেত আর আজকাল মিটিং-এ দেখি না।"

বিপাশাই হাসিয়া উত্তর দেয়, "উনি এখনও দোটানায় দুলছেন কিনা।"

পদ্মাও হাসে, কথা বলে না।

সে তাকাইয়া দেখে, ঊর্মিলাও আসিয়াছে। একজন প্রগতি-লেখকের কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছে ছবিটার।

"আমিত এবার নিয়ে তিনবার দেখছি। এমন চমৎকার বই। এ দেখে মনে হ'চ্ছে, আর্টের কত বড় একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে সামনে।"

লেখক বন্ধুটি খুশি হইয়া সমর্থন করে তাহার কথা।

ঊর্মিলাও খুশি হয় মনে মনে, যাক টিকিট কেনার টাকাটা সার্থক হইয়াছে। প্রগতি আর্টের সমঝদার না হইতে পারিলে যে বর্তমান দুনিয়ার চলিবার আবরণে ছিদ্র থাকিয়া যায় তাহা জানে উর্মিলা।

পদ্মার সঙ্গে চোখে চোখ মেলে। প্রসন্ন হাসি দিয়াই অভ্যর্থনা করে সে ভ্রাতৃবধূকে। "দাদা এলেন না?" "আমরা কাল একবার দেখে গেছি। এত চমৎকার বই তাই আজও আবার এলাম।"

ঊর্মিলা মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়। পদ্মাকে সে একটু ভয়ই করে যেন।

ঊর্মিলার সুদৃশ্য শাড়িখানায় চোখ বুলায় পদ্মা। একেবারেই সাজিয়া আসে নাই সে আজ।

মনে মনেই ভাবে পদ্মা, লেখক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখিতে আসিতে হইলে হয়তো চটকদার সাজে সাজিলে চলে না। বাঙালী লক্ষ্মী-শ্রী মূর্তিটি ধরানো চাইত লেখকের চোখে।

সঙ্গে আসিত যদি কোনও বিজনেসম্যান—উর্মিলাও দেখাইতে জানিত ত্রুটিহীন সাজ সজ্জায়, সেই ভাগ্যবানের কোম্পানীতে ছোট খাট একটা শেয়ার কিনিবার যোগ্যতা আছে কি নাই তাহার স্বামীর।

প্রেক্ষাগৃহের দুয়ার খুলিয়া যায়।

ছবি দেখিয়া দুই বন্ধু হাঁটে পাশাপাশি। কথা নাই পদ্মার মুখে। শিশু গর্কীর জীবন-চিত্রের ভাবাচ্ছন্ন রেশটুকু লাগিয়া আছে চোখে মুখে।

অপূর্ব সুন্দর। পদ্মা আচ্ছন্ন হইয়া আছে নিজের ভিতরে। আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীটের জন বিরল রাস্তা।

রাস্তার মৌনতা ভঙ্গ করিয়া বছর এগার-বারোর কয়েকটি বিড়ি হাতে অপরিচ্ছন্ন ছেলে পাশ কাটাইয়া যায়। মৃদু মন্তব্য কানে আসে, "একটা চুমা দিবি।"

বিপাশা হাসিয়া ফেলে, "আয়ত কাছে।" বলিয়া চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলে একটির হাত। বাকি সব পালাইয়া যায়।

ছেলেটির মুখ ভয়ে শুকাইয়া উঠে, "আমি না। ঐ ওরা বলছিল।" বলিয়া হাতটা টানিতে থাকে পালাইবার ইচ্ছায়।

"খবরদার হাত টানবি না। চল তোর বাড়ীতে।" বিপাশা গম্ভীর আদেশের সুরে বলে।

"আমার ত বাড়ী নাই।"

পদ্মা চুপ করিয়াছিল এতক্ষণ। তাহার ভিতরটা যেন হাহাকার করিয়া উঠে, "হায়! হায়! কি পরিণতিই হ'ল দেশের। এই কচি ছেলেগুলিও এত অমানুষ হ'য়ে উঠলো।"

ছেলেটির কথায় মন ভিজিয়া উঠে তাহার।

"তবে কোথায় থাকিস সারাদিন।"

ছেলেটি আর উত্তর দেয় না। একেবারে নিরুত্তর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিপাশা। জবাব নাই। বিপাশা বলে, "চল তবে আমাদের বাড়ীই। সেখানেই থাকবি।"

ছেলেটার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে, "ছেড়ে দিন আপনার পায়ে পড়ি।"

বিপাশা বলে, "ভয় কিরে। কিছু বলবে না তোকে কেউ। নাম কি তোর।"

"পচু।"

বাড়ী আসিয়া একটা পুরান কাপড় আর সাবান দিয়া বলে, "যা, কলতলা থেকে বেশ করে স্নান করে আয়। তারপর খাবি।"

পচুকে সারাসন্ধ্যা নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। তাহার ভয় কাটিয়া যায় আস্তে আস্তে। বহুদিন পর ভরা-পেট ভাল আহার মিলিয়াছে। খাওয়ার পরই ঘুমাইয়া পড়ে সে মেঝের উপরই।

পদ্মা আসিয়া একটা চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া যায় ঘুমন্ত পচুকে। মমতায় ভরিয়া উঠে মন। অনাথ বালক! থাকিয়া থাকিয়া শিশু-গর্কীর মুখখানা ভাসিয়া উঠে মনে।

পরের দিন গল্পে গল্পে পচুর পরিচয় বাহির করে পদ্মা।

পচুর বাবা জোগান খাটিত গ্রামে। তারপর গেল-আকালের বছর তাহারা শহরে আসে। তাহার বাবা ও আরও দুইটি ভাইবোন না খাইয়া মারা গিয়াছে। মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহাকে রাস্তায় একা ফেলিয়া। তারপর হইতে সে ঐ ছেলেদের সঙ্গে কখনও ভিক্ষা করিয়া, কখনও চুরি করিয়া কাটাইয়াছে এতকাল। রাত্রিতে বাড়ীর রোয়াকে রোয়াকেই ঘুমাইত তাহারা।

পদ্মা চমকিয়া উঠে, "এমন মাও হয়।"

বিপাশা উত্তর দেয়, "সভ্যতার উপর দিয়ে যুদ্ধের রোলার চলেছে, সভ্যতার হাড়-পাঁজর সব গুঁড়িয়ে যাবে না ?"

পদ্মা পচুর জন্য শ্লেট-পেনসিল বর্ণমালা কিনিয়া আনে।

অরুণাভ হাসিয়া বলে, "পদ্মা, তোমার ছাত্রের বিদ্যে যে সমস্ত দেওয়ালে দেওয়ালে ফুটে বের হ'চ্ছে। যেদিকে তাকাই শুধু আ-আ ক-খ-ই দেখি দেওয়ালের গায়ে গায়ে।"

পত্রিকা অফিসে বসিয়া একটা রিপোর্ট লিখিতেছে অরুণাভ। বেয়ারা আসিয়া জানায়, ফোনে কে ডাকিতেছে। অরুণাভ উঠিয়া গিয়া ফোন ধরে। বিশ্বরূপ ফোন করিতেছে—পদ্মার মেয়ে হইয়াছে হাসপাতালে। ভালই আছে সে।

অরুণাভ রিসিভারটা রাখিয়া আবার ঘরে আসিয়া বসে কলম লইয়া। একটা বিস্ময়ময় অজানা শিহরণ দোল দিয়া যায় মনে—পদ্মার মেয়ে হইয়াছে! এ মুহূর্ত হইতে নূতন পরিচয় লাভ করিয়াছে সে। পিতা হইয়াছে সে একটি শিশুকন্যার।

তাড়াতাড়িই বাড়ী ফেরে সে। বিশ্বরূপের চোখে খুশির অভিনন্দন! মৃদু তিরস্কারও করে, "কিছু আগে ব্যবস্থা করনি। ওদিকে কন্যাত আর বাইরের আলো না দেখে পারছিলেন না। সে ত আর জানতো না এমন ছেলেমানুষ বাপের কন্যা হ'য়ে জন্মেছে সে।"

অগত্যা 'ইমারজেন্সী কেস' হিসাবে দেওয়া হল হাসপাতালে।"

অরুণাভ লজ্জিত হয়।

বিশ্বরূপ জামা গায়ে দিয়া বলে, "চল এবার, চারটে ত বাজে। শ্রীমতীকে লাল সেলাম দিয়ে এসো।"

পচুও জুতা, জামা পরিয়া হাজির হয়—সেও যাইবে। তিনজনেই যায় একসঙ্গে প্রসূতি আগারে।

ছোট্ট শিশুর খাটে ঘুমাইতেছে নরম একটি তুলতুলে শিশু। তাহার ছোট্ট বুকটা উঠিতেছে নামিতেছে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে। অরুণাভ তাকাইয়া দেখে, স্নেহে কৌতুকে, পুলকে-ভেজা সে দৃষ্টি।

ঐ শিশুটি তাহাকে পিতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে আজ এক সুন্দর লগ্নে। তাহারই আত্মজা, তাহারই প্রাণশক্তির অংশ ঐ সুন্দর শিশুটি।

অপূর্ব এ সৃষ্টির রহস্য।

পদ্মা শুইয়া আছে পার্শ্ববর্তী লোহার খাটে। একটু কৃশ দেখাইতেছে তাহাকে। তবু একটা আনন্দের জ্যোতি চোখেমুখে।

অরুণাভ মৃদু হাতে ধরে তাহার হাতখানা, "খুব কষ্ট পেয়েছিলে?"

পদ্মার মুখে স্নিগ্ধ হাসির আভাস দেখা দেয়। অরুণাভের এ স্পর্শের গভীর অর্থ অনুভূত হয় অন্তরে। অমূল্য সম্পদ একটি অক্ষত-উপহার দিতে পারিয়াছে সে তাহার প্রিয়তমকে। নীরব অভিনন্দন স্বীকৃত হয় মনে মনে, প্রাণে প্রাণে।

বিশ্বরূপ দেখে উহাদের স্নেহ-ভরা চোখে।

স্বর্গীয় শিশুর প্রথম অভিনন্দন, পিতামাতার আশীর্বাদ-ভরা মধুর দৃষ্টিতে।

পচুও খুশিতে উপছাইয়া পড়ে যেন।

অরুনাভের হাতটা ধরিয়া আবদারের সুরে বলে। "দাদাবাবু আমি ওর নাম রাখলাম—পরী।"

বিশ্বরূপ হাসিয়া বলে, সারা দুপুর রোদে পুড়ে রাস্তায় লাট্টু ঘুরালে কি হ'বে; আমাদের পচুর কল্পনার মনটি কিন্তু ঠিক তাজা আছে।"

পচু আবার আবদার জানায়, "দাদাবাবু, দোকান থেকে রঙিন জামা কিনে আনি আর একটা লাল কাগজের রাঙা ফুল ?"

"দূর বোকা, ওকি এখনও দেখতে শিখেছে ?"

"ঐ যে দেখছে চোখ খুলে।"

বিশ্বরূপ হাসিয়া বলে, "নাও, বোঝাও এবার এই চোখ খুলে দেখা আর রাঙা ফুল দেখার তফাৎ, পচুকে।"

ভিজিটারদের যাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। বিশ্বরূপ উঠিয়া বলে, "চলি পদ্মা, ভালইত আছে। আবার কাল আসবো।"

হাসপাতাল হইতে বাড়ী আসিয়া দেখে পদ্মা, পচুর উন্নতি হইয়াছে প্রচুর। সারাদিনের মধ্যে একবারও বই ছোঁয় না, কাজেও ঘেঁষে না। খাতাপত্র সব উধাও। সম্ভবত খাতার পাতা দিয়া ঘুড়ি বানান হইয়াছে। সারাদিন রাস্তায় একপাল ছেলের সঙ্গে লাট্টু খেলা হয়। ধূলা মাখা শরীর, স্নান নাই, সময় মত খাওয়া নাই। নেশার মত পাইয়াছে যেন পচুকে লাট্টু খেলা। এদিকে ঘরময় বিশৃঙ্খলা। অরুণাভের টেবিলের উপর জুতার কালি, অ্যাস-ট্রেতে খুচরো পয়সা, পদ্মার একখানা ব্লাউজ দিয়াই ঘর মোছার কাজ চলিতেছে। সোপ কেসে গায়ে মাখার তেল, তরকারির ঝুড়িতে একরাশ ডিমের খোসা।

পদ্মা আর তাকাইতে পারে না। দুপুর বেলা রাগিয়া ডাকে পচুকে "বই নিয়ে আয় পচু।"

পরের দিনও বই লইয়া আসে না পচু! পদ্মা আগুন হইয়া উঠে, "আয়না দিয়ে দেখতো কি চেহারা হ'য়েছে। জামা কাপড়ে সাবান দিস না কতকাল বলত। এমন নোংরা অপদার্থ হ'য়ে থাকলে এখানে থাকা চলবে না।" বলিয়াই হঠাৎ চুপ হইয়া যায় পদ্মা। মনের ভিতরে একটা ব্যথার ঝিলিক খেলিয়া যায়—নিজের সন্তান হইলে কি আর বলিতে পারিত পচুকে, বাড়ীতে আর থাকা চলিবে না, তাহার অবাধ্য হইলে।

বিকালবেলা অরুণাভ ঘরে ফিরিতেই পচু এককাপ চা আনিয়া হাজির। অরুণাভ খুশি হইয়া বলে, "এত সুবুদ্ধি আবার তোর হোল কবে থেকে।"

পচু সে কথায় কান না দিয়াই বলে, "দাদাবাবু, আমাদের পরীর জন্য একটা ঠেলাগাড়ী কিনে দিন।"

"সর্বনাশ। তুই যে আমাকে ডুবাবি দেখছি। অত টাকা কোথায় পাবরে।"

"আপনার ব্যাগেত অনেক টাকা আছে, আমি দেখেছি।"

"ঐ টাকা দিয়ে পরীর গাড়ী কিনলে, খাব কি।" পচু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। পার্কে দেখিয়াছে সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্যারামবুলেটারে ঠেলিয়া লইয়া যায়। সেই হইতে তাহারও শখ—পরীকেও ওরকম একটা গাড়ীতে করিয়া ঠেলিবে সে।

সবাই তাহাদের পরীকেও একটু দেখুক—ইহাই চায় পচু।

সুপ্রিয় কমলেশদের কলেজে প্রফেসারী পাইয়াছে; কলেজ-হোষ্টেলে থাকে। পদ্মা অরুণাভের মুখে শুনিয়া সুপ্রিয়ের হোষ্টেলে যায় দেখা

করিতে। তেতলায় উপর আলোবাতাসভরা পরিচ্ছন্ন একখানা ঘর। কাচের জানালা দিয়া বহু দূরের আকাশ দেখা যায়। মেঘেভরা ভারী আকাশ।

সুপ্রিয় একটু আড়ষ্ট হইয়া যায়—পদ্মাকে দেখিয়া। পদ্মার দৃষ্টি এড়ায় না। তবু অভিযোগের সুরে বলে সে, "অদ্ভুত মানুষ ত তুমি। এদ্দিন ধরে এসেছো, আর এতদিন পরে এসেছো, তা'ও একবার গেলে না দেখা করতে?"

পদ্মা বসিয়া পড়ে তাহার বিছানার অবিন্যস্ত সুজনিটা একটু টান করিয়া লইয়া।

সুপ্রিয় কৈফিয়তের সুরে বলে, "এসেই এত কাজের চাপে পড়েছি—"

পদ্মা মুখের কথা কাড়িয়া ধমকের সুরে বলে, "ভীতু কোথাকার। সময় পাওনি বলে যাওনি তুমি; বললেই বিশ্বাস করবো? না হয় প্রেমেই একটু পড়েছিলে, সেজন্য এত কঠোর সাধনা? হোষ্টেলে থাকছো; কেন আমাদের বাড়ী কি অপরাধ করলো শুনি?"

সুপ্রিয় হাসিয়া ফেলে পদ্মার কথায়। সে আবার সহজ হইয়া উঠে বহুদিন পর। ঠাট্টার সুরে বলে, "এ স্বভাব কোথায় পেলে, পদ্মা?"

পদ্মা হাসিয়া বলে, "তোমার কাছেই।"

অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করে পদ্মা। পদ্মা লক্ষ্য করে সুপ্রিয় যেন ইচ্ছা করিয়াই একটু দূরত্বের পর্দা টানিয়া রাখিতে চাহিতেছে নিজের ভিতরে। পদ্মা ঠাট্টার সুরে বলে, "এমন কৃপণ ত আগে ছিলে না। এ স্বভাব কোথায় পেলে?"

সুপ্রিয়ও উত্তর দেয় ঠাট্টার সুরেই, "তোমার কাছেই।"

পদ্মা বলে, "তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু প্রথম দিনটিতে অন্তত একটু

আতিথ্য দেখাও। আমারও ত একটা মান সম্মান আছে। একটু না হয়, চা-ই খাওয়াও। যা শীত পড়েছে।"

সুপ্রিয় উঠে, চা আনিতে বলিতে। পদ্মা বাধা দিয়া বলে, "আরেক-দিন এসে চা খাব। আজ চলি। দু' ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছি। আমি গেলে বের হবেন তোমার অরুণদা।'

সুপ্রিয় হাসিয়া বলে, "তাই নাকি—ছুটি মঞ্জুর করিয়ে বের হ'তে হয় নাকি আজকাল পদ্মাবতীকে। স্বামীত্বের প্রতি এত মর্যাদা এল কবে থেকে।" "মর্যাদা না দিয়ে উপায় নেই যে। একজন নূতন প্রাণী এসেছেন আমাদের মাঝে, জান না তা'? মেয়েকেত আর ঘরে তালা দিয়ে রেখে আসা যায় না।"

সুপ্রিয় খুশিতে উপছাইয়া পড়ে, "তাই নাকি। এ মধুর সংবাদটা এতক্ষণ দাওনি? অরুণদাও কিছু বললো না সেদিন। এবারত মিষ্টিমুখ না করালেই নয় পদ্মাবতীকে, মিষ্টি সংবাদটা সেই যখন দিল আগে।"

খুশি হইয়া একটা জামা গায়ে দিয়া সেও বাহির হয় পদ্মার সঙ্গে, "চল আগে, অরুণদাকে পাকড়াও করি।"

রাস্তায় নামিয়া ট্রামলাইন পর্যন্ত আসিতেই বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে। জানালা বন্ধ একটা দক্ষিণমুখী, ট্রামের কাছে যাত্রীদের ভিড়।

বৃষ্টি ক্রমেই জোরে পড়িতে থাকে।

"মহা মুস্কিলে ফেললোত।" বলে সুপ্রিয়। তাহার চোখ পড়ে তাহারই এক বন্ধুর প্রতি। একটা শৌখীন বর্ষাতি গায়ে ট্রামে উঠিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে যাত্রীদের পিছনে। সুপ্রিয় বড় বড় পা চালাইয়া যায় বন্ধুটির কাছে, "এই বিমল, তোর ওয়াটার প্রুফটা দিয়ে যাত একটু। তুইত যাবি ট্রামে, তোর আর ওটাতে কি দরকার।"

বন্ধুটি হাসিয়া খুলিয়া দেয় ওয়াটার প্রুফটা। সে জানে, সুপ্রিয়কে। ট্রাম ছাড়িয়া দেয় যাত্রীদের তুলিয়া লইয়া। সুপ্রিয় বিনা দ্বিধায় নীল বর্ষাতিটা আনিয়া দেয় পদ্মাকে, "নাও এটা গায়ে জড়িয়ে ফেল। অত ভেজা সইবে না শরীরে।" পদ্মা অবাক হইয়া যায় সুপ্রিয়ের কাণ্ড দেখিয়া, "এভাবে চেয়ে আনলে একজনের গা থেকে খুলে এটা। ওঁরওত দরকার ছিল।"

সুপ্রিয় এতটুকু উদ্বিগ্ন না হইয়া বলে, "ও এস্‌প্লানেডে যেতে যেতে বৃষ্টি থেমে যাবে।"

"কিন্তু একটা ওয়াটার প্রুফে আর কি লাভ হ'ল। তুমিও ত ভিজছোই।"

"এভ্‌রিথিংপ্রুফ এ দেহ। এ সামান্য জলে কিছু আসে যাবে না।" বলিয়া নিজের বলিষ্ঠ কবজিখানা দেখায় একটু।

কথায় কথায় বাড়ী আসিয়া পড়ে। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, অরুণাভ জোড় আসন করিয়া বসিয়া আছে মেয়ে কোলে, আনাড়ী গোবেচারীর মত।

সুপ্রিয় হাসিয়া ফেলে, "পদ্মা, তুমিও যা পারনি, তোমার মেয়ে কিন্তু তাই করে ছাড়লো। অরুণদার মত বুনো হরিণকেও ঘরে আটকে ফেলেছে ও মেয়ে কি মায়ায়, দেখি আগে।"

অরুণাভ মেয়েকে পদ্মার কোলে তুলিয়া দেয়, "যা শয়তান তোমার মেয়ে; আমাকে দেখেই কান্না শুরু।"

সুপ্রিয় মন দিয়া দেখে পদ্মার মেয়েকে, "পরী নামটি দিয়েছেন যিনি, তাঁর দূরদৃষ্টি আছে ঠিকই। পদ্মাবতীকে ছাড়াবে এ মেয়ে।"

পদ্মা মিনতির সুরে বলে, "দয়া করে এ ভেজা সার্টটি বদলে এসত আগে।"

পদ্মা পচুকে চা করিতে বলে।

"উঁহু শুধু একটু গরম জলে চলবে না। এদিকে শুনে যাও পচু।"

সুপ্রিয় অরুণাভের ব্যাগ হইতে টাকা বাহির করিয়া বলে, "মাত্র একটাকা ?"

অরুণাভ হাসিয়া বলে, "দেখিস, বাসে যাওয়ার পয়সা একটু রাখিস।"

সুপ্রিয় ঠাট্টা করে "এই অবস্থা নাকি টাকার থলির। নিজের ব্যাগটিই তা'হলে খুলতে হ'ল। এখন থেকে মেয়ের বিয়ের পণের টাকা জমাতে থাক, অরুণদা।"

বাহিরে জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে।

পদ্মা লজ্জিত লইয়া বলে, "ভদ্রলোক নিশ্চয় তোমার সাতপুরুষ উদ্ধার করছেন এখন।" "সাতপুরুষের উদ্ধারইত করছে; আমারত আর নয়। কাজেই খুশি বা অখুশি হওয়ার কি আছে আমার ?"

অরুণাভ শুনিয়া বলে, "তোর আর স্বভাব কোনদিন শুধরাবে না।"

রাস্তার একটি ছেলে আসিয়া বলে অরুণাভকে "পচু আপনাদের ব্যাগ থেকে অনেক টাকা চুরি করছে কয়মাস ধরে। তা দিয়ে জুয়া খেলে।"

"তুমি কি করে জানলে ?" অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করে অরুণাভ। পচুকেও ডাকে। পচু চুপ করিয়া থাকে। অস্বীকারও করে না, কথার জবাবও দেয় না, রাগে গুম হইয়া থাকে। ঐ ছেলেটার ভাগে আজ কম পড়ায় সে যে এমন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিবে—পচু ইহা ভাবে নাই। অরুণাভ ঘরে ডাকিয়া গম্ভীর সুরে জিজ্ঞাসা করে "ও যা বললো, সব ঠিক কিনা বল।"

এতক্ষণে উত্তর দেয় পচু, "ঠিক।"

"কিন্তু কেন এমন কাজ করলি তুই, পচু। তুই পয়সা চেয়ে, পয়সা পাসনি আমার কাছে, এমনত কখনও হয়নি।" তাহার কথা বেদনায় ভারি হইয়া উঠে।

পচু নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে, কথা বলে না।

অরুণাভের মনটা বড় খারাপ হইয়া যায়। পচুকে সে ত স্নেহই করিত। ছোট ভাইয়ের মত স্নেহের বাঁধুনি পড়িয়া গিয়াছে মনে। কিন্তু সেই পচুও তাহার মণিব্যাগ হইতে টাকা চুরি করিল!

পদ্মার মনে বারে বারেই বিঁধিতে থাকে, কেন পচু এ কাজ করিল।

পদ্মা চুপ করিয়া চিন্তা করে, হয়তো সে নিজেই দায়ী এজন্য। পচুকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিলেও, সে যে তাহাদের দয়ায়ই আশ্রিত হইতেছে এ বাড়ীতে, একথাটা পূর্ণভাবেই সচেতন করা হইয়াছে তাহাকে নিজেদের অসাবধানী উত্তেজিত মুহূর্তে।

দয়া মানুষকে শুধু বঞ্চিত করারই একটা রূপ মাত্র, বিকাশ করার পথ ধরাইয়া দেয় না দয়া। তাই হয়তো পচু ভিতরের আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে ঠিকপথে বিকাশ করিতে না পারিয়া বিপথে পথ খুঁজিয়া লইয়াছে, তাহাদের অজ্ঞাতে। পদ্মা বসিয়া বসিয়া ভাবে, এ দেশের এই পথে-ঘোরা কচি শিশুরাও কবে মানুষ হইবার সুযোগ পাইবে। তাহাদের ভিতরের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণবিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইবে কবে এই পথভ্রষ্ট বালকেরা।

বিশ্বরূপ গল্প করে অরুণাভ, পদ্মার সঙ্গে। আলোচনা করে, রাজনীতি লইয়া, কারেন্ট পলিটিক্স লইয়া। ছোট্ট ঘরোয়া পরিবেশটুকু ঘন হইয়া উঠে তাহার বন্ধুত্বের ছোঁয়ায়। ভাল লাগে বিশ্বরূপের

দীর্ঘকাল পরে পাওয়া এই মধুর গৃহপরিবেশ। এ ভাল লাগার প্রতিচ্ছায়া পড়ে পদ্মার মনে। তাহারও ভাল লাগে প্রাণের স্পর্শে উর্বর এ মিঠা আলোচনা। একটা মৃদু রেশ রাখিয়া যায় তাহার এ দীর্ঘদিনের কঠিন বাস্তবের পুরু প্রলেপ-পড়া মনে।

মাঝে মাঝে মনে হইত পদ্মার, সে যেন প্রিয়জনের প্রতি প্রিয়জনের সহজাত ভালবাসাটুকুও হারাইয়া ফেলিতেছে সংসারের এ ঘূর্ণিটানে। কোন্ উত্তপ্ত বাহুর আড়ালে পড়িয়া আছে তাহার প্রেমের স্নিগ্ধ ফল্গুধারা, খুঁজিয়া পায় না পদ্মা। কিন্তু বিশ্বরূপ আবার তাহার মনকে চঞ্চল করিয়া দিতেছে যেন। আবার দীর্ঘবছর পর এক নূতন রোগ দেখা দিতেছে তাহার মনে, টের পাইতেছে সে। পদ্মা মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া যায়, নিজের মনের দর্পণে নিজেরই এ নূতন মূর্তি দেখিয়া।

বিশ্বরূপের উপস্থিতি কামনায় প্রতীক্ষ্যমাণ হইয়া থাকে মন। মন হইতে যতই ঝাড়িয়া ফেলিতে চায় সে এ চঞ্চলতা, ততই যেন আরও বেশী চাপিয়া ধরে তাহাকে এক অশান্ত উত্তেজনা!

পদ্মার সংস্কারের চেতনায় টান পড়ে, আত্মচেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নীতির আঘাত লাগে।

তবু এ সত্য সে অস্বীকার করিতে পারে না—বিশ্বরূপ আজ অনেকখানিই জুড়িয়া বসিয়া আছে মনে। পদ্মার বিবেক বুদ্ধিত ইহা চাহে না। সে তাহার স্বামী ও সন্তানকে লইয়া পরিপূর্ণ থাকিতে চায়।

তাহার অরুণাভ, সেত আজও জ্যোতির্ময় হইয়া আছে তাহার অন্তরে; তবু কেন এ তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে মনে। কেন এ উত্তেজনা! এ চাঞ্চল্য!

পদ্মা তাহার পিসীমার কথা ভাবে। কি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম। কোন অতীত যৌবনের স্মৃতিপূজায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া গেল সে।

কিন্তু পদ্মা তাহার স্বামীকে ভালবাসে, তবু কেন আচ্ছন্ন হয় মন এ নূতনের প্রখরতায়। তবু কেন এ অন্তর্জ্বালা।

বিশ্বরূপকে অনুভব করিতেছে সে অন্তরের গোপন স্তরে। অসহনীয় হইয়া উঠে তাহার প্রতীক্ষা কাতরতা। কিন্তু কেন?

সে ত চাহে না একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শকে ক্ষুন্ন করিতে।

মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরে পদ্মা শক্ত করিয়া। যদি ঐ কোমল স্পর্শে, এ রহস্যময় শিশুর হাসি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিতে পারে তাহার মনের এ অসহনীয়তা, এ অস্থিরতা।

কোনও কাজে উৎসাহ পায় না পদ্মা। মনের তলায় বহিতেছে অহর্নিশি এক অসহ্য দ্বন্দ্ব।

অসহ্য—অসহ্য এ কষ্ট।

পদ্মা আবার ভাবে, কেন এমন হইল? এ কি তাহার মনের স্বভাবজাত অ-স্থিরতারই পরিচয়। না তাহার জীবনের ব্যর্থতারই প্রতিক্রিয়া এ দ্বিচারিণী মন। সে নিজেই দায়ী? না তাহার রূঢ় পারিপার্শ্বিকতা দায়ী এ জন্য।

পদ্মা চাহিয়াছিল, বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কৃতি, সৌন্দর্যানুভূতির প্রেম-মধুর ছায়া প্রতিচ্ছায়ায় বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে তাহাদের দায়িত্ব-সুদৃঢ় জীবনকে। হৃদয়ের স্পর্শ পাইতে চাহিয়াছিল সে তাহার হৃদয়ের ব্যথায়। কিন্তু তাহার কামনা পূর্ণ হয় নাই। ভাস্কর রশ্মির প্রখরতায় হারাইয়া গিয়াছে মধু-রজনীর সেই ধ্রুবতারা—তাহার প্রিয় অরুণাভ। অরুণাভের দৃষ্টি আজ সম্পূর্ণভাবে কর্মনেশায় আচ্ছন্ন। এ নেশায় বিভোর তাহার অন্তরাত্মা।

সে যেন এক বিরাট সম্ভাবনার সোনালী ইঙ্গিতে ছুটিয়া চলিয়াছে—বহুদূরের আকর্ষণে, দূরে—বহুদূরে—পদ্মার ধরা-ছোঁয়ার বহু দূর পথে সে আজ।

বড় অসহায় বোধ করে পদ্মা এ নিঃসঙ্গ দিনের ভারে। বড় অবসন্ন সে আজ এই একলা পথ চলার শ্রান্তিতে।

প্রেম প্রীতি আর নীতির সংঘাতে দিন দিন নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে সে। পদ্মা ঠিক করে অরুণাভকে জানাইবে তাহার মনের এ নূতন পরিচয়। অরুণাভের মনে দুঃখ দিতে চায় না সে। প্রবঞ্চনা দিয়া বিশ্বাসকে মধুর করিয়া রাখিতে আনন্দ থাকে না, থাকে গ্লানি।

অরুণাভ লিখিতেছে একমনে। পদ্মা কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। গভীরভাবে কি চিন্তা করিতে করিতে প্রশ্ন করে, "আমি যদি আর কাউকে ভালবাসি, তুমি কষ্ট পাবে তা'তে?" একটু বিস্মিত হয় অরুণাভ এ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া। কলম না তুলিয়াই উত্তর দেয় সে শান্তস্বরে, "না, কষ্ট পাব না।"

তারপর লিখিতে লিখিতেই ঠাট্টার স্বরে বলে, "কেন, কাউকে সত্যি ভালবাসছো নাকি।"

পদ্মার ভিতরের মন যেন আর্তকণ্ঠে, বলিয়া উঠে "প্রিয়, তোমাকে যে কত আঘাত দিয়েছি আমি জীবনভরে তার পুরণ হ'বে কি দিয়ে।"

কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারে না। চোখ ভিজিয়া উঠে। অরুণাভ তাকাইয়া দেখে একটু। বিস্মিত হয় সে। পদ্মার হাতটা হাতের ভিতর লইয়া বলে, "এত কষ্ট পাচ্ছ কেন, পদ্মা? সত্যি যদি ভালবাসো কাউকে, তুমি কি ভাব, তা'তে আমি ব্যথিত হ'বো। আমাকে এখনও চেননি, পদ্মা।"

অরুণাভের কথা শুনিয়া আর কিছু বলিতে পারে না পদ্মা। তাহার হাতটা ধরে শক্ত করিয়া। মনে মনে ভাবে, তাহার বুকের ভিতরে

যে কি তীব্র অনুভূতির পীড়ন, আর নীতির দংশন চলিতেছে অনুক্ষণ, অরুণাভ তাহা টের পাইতেছে কি ?

অরুণাভ পদ্মার দিকে তাকাইয়া অবাক হইয়া বলে, "একি, কাঁদছো তুমি ? ভালবাসায় কোনদিন পাপ হয় না পদ্মা, পাপের সৃষ্টি হয় না ভালবাসা থেকে।"

অরুণাভ কয়মাস যাবৎ লক্ষ্য করিতেছে—পদ্মার ভিতরে একটা জীবনে অনাসক্ত ভাব। যেন জোর করিয়া টানিয়া চলিয়াছে সে নিজেকে। আজ স্পষ্ট হইয়া উঠে অরুণাভের চোখে। একটা স্নেহার্দ্র মমতায় ভরিয়া উঠে মন তাহারও পদ্মার জন্য।

পদ্মা শুইয়া শুইয়া ভাবে, মাত্র পাঁচ বছর। এরই ভিতর কি অসীম দুঃখ দিয়াছে সে অরুণাভের মনে। ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে সে তাহাকে। আবার সে ক্ষত মিলাইয়াও গিয়াছে। কিন্তু ক্ষতের দাগ ? সেত চিরদিনের মত আঁকা থাকিবে অরুণাভের মনে। কি যেন বিঁধিতে থাকে তাহার মনে কাঁটার মত অনুক্ষণ। বড় অপরাধী ভাবে সে নিজেকে।

বিশ্বরূপের প্রতি তাহার এ গোপন প্রেম, এও চিরস্থায়ী হইবে না, সে জানে।

শোভনকে ভালবাসিয়াছে সে, অনুপমকে ভালবাসিয়াছে, হয়তো বা সুপ্রিয়কেও ভালবাসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহারা এ জনাকীর্ণ পৃথিবীর মাঝে হারাইয়া গিয়াছে। হয়তো বিশ্বরূপও ধীরে ধীরে বহু মানুষের অন্তরালেই মিলাইয়া যাইবে।

কিন্তু তবুও ত এ মধুর বেদনা-ভরা মুহূর্তগুলিকে অস্বীকার করিতে পারে না সে।

পদ্মা বিনিদ্র রজনী ভরিয়া ভাবে, কেন এমন হয় ? কেন এত ক্ষণস্থির তাহার মন ?

বালুভূমিতে দাগ যেমন অতি সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে, আবার অতি অল্পক্ষণেই মিলাইয়া যায়, তাহার এ প্রেমও ঠিক ঐ বালুচরের মতই স্পর্শাতুর, আবার বালুতটরেখার মতই ক্ষণপ্রভ।

পদ্মা ভাবিয়া পায় না, তাহার এই চির-চঞ্চল, চির-মধুর প্রেমের রহস্য কোথায়। তাহার কল্যাণপিপাসু প্রশান্তিপ্রিয় মন গ্রহণ করিতে চায় না এ অস্থির প্রেমের তরঙ্গকে।

একটি রাগিণী দিয়াই বাঁধিয়া রাখিতে চায় সে তাহার সমস্ত জীবনকে। তবু তাহার মন এ সুর সপ্ত লহরীতে আছন্ন হইয়া উঠে কেন?

ষ্ট্রাইক মিটিয়া গিয়াছে, শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইয়াছে। সূর্যের চোখে জয়ের আনন্দ। জিতিয়াছে, তাহারা জিতিয়াছে। সবাই মনে মনে স্বীকার করে, এক জোট হওয়ার মূল্য আছে।

ইউনিয়নের কাজ পুরাদমেই চলিতেছে। এমন কি মদনও মেম্বার হইয়াছে ইউনিয়নের। একস্থানে যখন কাজ করিতেছে, সুখে দুঃখে বিপদে আপদে যখন একসাথেই আছে, লড়াইয়ের সময়ও একসাথেই থাকা উচিত, মদনও নাকি এ খাঁটি কথাটা টের পাইয়াছে এতদিনে। উপরওয়ালার এ নবাবী মেজাজ আর সইতে পারিতেছে না সে। তাহার উৎসাহ বরং একটু উগ্রই সকলের চাইতে।

একটা কুস্তির আখড়াও করিয়া ফেলে সে ইউনিয়ন ঘরের পাশেই। শরীরে জোর না করিলে, ঐ হাড়-সর্বস্ব দেহে কি লড়াই করা চলে বড় লোকের বিরুদ্ধে। অনেকেই মদনের ভক্ত হইয়া উঠে। মদনের মহাবীর আখড়ারও বেশ কিছু মেম্বার হইয়া যায়।

প্রসাদ মনে ম.ন প্রমাদ গণে—লক্ষণ ভাল নয়। কিন্তু মদনের পপুলারিটি যেরকম, তাহাতে তাহাকে ইউনিয়ন হইতে সরানও চলে না। সূর্যকে সতর্ক করিয়া দেয় সে—দেখো সাবধান।

কিন্তু অনেকের মধ্যেই মিটিং-এ বক্তৃতা শোনা অপেক্ষা শরীর চর্চায় আগ্রহ দেখা যায় বেশী। মিটিংয়ের শ্রোতাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে।

দিল্ খোলসা মদন, বিড়িটা, সিগারেটটা ছেলেদের অসুখে-বিশুখে বিলাতী দুধের গুঁড়া, বিপদে আপদে দু এক টাকা ধার হামেশাই দিতেছে ফ্যাক্টরীর মজুরদের। এতটুকু উপকার মানুষের করিতেই হয়—না হইলে আর মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছে কেন? কিন্তু এত টাকা পায় কোথায় মদন?

না পাওয়ার কি। মদনত শুধু ঐ ফ্যাক্টরীর আয়ের উপরই নির্ভর করে না। আজ কয়েক সের চিনি, কাল হয়তো টিন দুই কেরোসিন, পরশু গ্যালন খানিক পেট্রল আনিয়া চোরাকারবার করিতেছে সে এই বস্তির ঘরে বসিয়াই। কোথা হইতে যে এসব সংগ্রহ করে, সে সংবাদ অবশ্য অনেকেই জানে না।

তাছাড়া মদনের কোনও সংসার নাই। যদিও মদের খরচ তাহার একটা আছে, আর দু'চারজন মেয়েমানুষের মন রাখার খরচও আছে তাহার। তাহা হইলেও সুখেই দিন চলিয়া যাইতেছে মদনের।

এ লইয়া ঈর্ষান্বিত হয় না প্রতিবেশীরা। বরং যুদ্ধের পরের ছাঁটাইকরা বেকার ছেলেগুলি মদনেরই সাকরেদ। তাহাদের তাসের আড্ডায় মদনই প্রধান খেলোয়াড়।

কিন্তু মদনেরও এক দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গিয়াছে। সিন্ধুবালাকে চাই ই ছোটবাবুর। এজন্য আগাম পঞ্চাশটি টাকাও সে তাহার নিকট হইতে লইয়া উজাড় করিয়া বসিয়াছে মদ খাইয়া।

সিন্ধুবালা যে এমন তেজী-মেয়েমানুষ, সে জানিত না পূর্বে। তাহা হইলে আর এত করিয়া কাজ জুটায় সে প্রতাপ-সূর্যের।

একদিন একটু আভাস তুলিতেই তাহার সাত-পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়া দিয়াছে সুন্দরবৌ। কি ভীষণ অগ্নিমূর্তি তাহার। যেন একটি কেউটে। "আসে যেন একদিন তোমার ছোটবাবু, ঝাটা মারুম মুখে। ছোট লোক বইলা, আমাগো মান ইজ্জৎ খোয়ান অত সোজা না। কইও তোমার বাবুয়ে—এইটা বেশ্যাপাড়া না।"

কোনমতে মানে মানে সরিয়া আসিয়াছে সে সেদিন তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া। কিন্তু ছোটবাবুও ত না-ছোড় বান্দা কম না। এখন নূতন একটা মৎলব বাহির করিতে না পারিলেই নয়।

গ্লাসফ্যাক্টরীতে ষ্ট্রাইকের দাবী মানিয়া লওয়া হইবে এই শর্ত দেওয়া সত্ত্বেও কার্যত উহা আংশিক ভাবেই পূর্ণ করা হয়! অসুস্থ শ্রমিকদের ভিতরও কেহ কেহ মায়না পায়—কেহ আবার পায় না। মাগগিভাতার বেলায়ও এই একই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয়। শ্রমিকদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ফুটিয়া উঠে মালিকের বিরুদ্ধে কিছু কালের মধ্যেই।

আবার ষ্ট্রাইক করিতে চায় মদন। কিন্তু প্রসাদ বা সূর্য এত ঘন-ঘন ষ্ট্রাইক করার সমর্থন করে না।

মদন কিছুতেই প্রসাদের যুক্তি মানিয়া লয় না। মদনের দিকে বেশ অনেকেই সমর্থন করে।

অগত্যা আধ-ইচ্ছাতেই সূর্যও রাজী হয়—আবার ষ্ট্রাইক আরম্ভ করায়। সবাই যখন চাহিতেছে!

সিদ্ধেশ্বর চিন্তিত হইয়া উঠে—এই সেইদিন ওদের দাবী মানিয়া লওয়া হইল—আবার ষ্ট্রাইক!

কিন্তু প্রকাশকে উদ্বিগ্ন দেখায় না। মনেমনে সে জানে, তাহার দালালটি সেয়ানা।

তিনদিন চলিয়া যায়—পূর্ণ হরতাল। চতুর্থ দিনের দিন কিছু কিছু অসন্তোষ আরম্ভ হইয়া যায় নিজেদের ভিতর। বেশ কিছু শ্রমিক কাজে যোগ দেওয়াই ঠিক করে। "একবার মেনে নিয়েছে বলে, বার বারই যে মালিক তাদের দাবী মেনে নেবে—তার ঠিক কি।"

মদনকে এখন আর উহাদের ঠেকাইতে দেখা যায় না। সেও একটু চিন্তিত স্বরেই সায় দেয় "আমারও মনে হ'চ্ছে কাজটা ঠিক হয় নাই।"

কিন্তু আরেক দল কিছুতেই কাজে যোগ দিতে রাজী হয় না। "একবার যখন ষ্ট্রাইক করতে নেমেছি তখন যতক্ষণ না মালিক আমাদের দাবী মেনে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজে যাব না।"

দুই ভাগ হইয়া যায় শ্রমিকদের মধ্যে। একদল কাজে যোগ দেয়।

ষ্ট্রাইক ভাঙিয়া যায়। সূর্যও লক্ষ্য করে মদনের চাল। কিছুদিন চলিয়া যায়। মদনের স্বর পরিষ্কার হইয়া উঠে।

সে তাহার মহাবীর আখড়ায় জড়ো করিয়া বুঝায় তাহার দলের মজুরদের—

"আমরা বুঝি কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতারা যখন নিষেধ করছে, তখন কোম্পানীর বিরুদ্ধে ষ্ট্রাইক করার উচিৎ না আমাদের। আমাদের যা ব্যবস্থা করার তারাই করবে। ছেলের জন্য যা কিছু ভাবে, মা বাপেই। আমাদেরও মা বাপ এই নেতারাই। তারাই ত ভাববে আমাদের জন্য। সত্যি কিনা।"

শ্রোতারা ভাবে, মদনের কথাই ঠিক। মদনের বুদ্ধি তাহাদের চাইতে অনেক বেশী।

সত্যি কথাইত। নেতারা যখন আছে—বড় বড় জ্ঞানী মানুষ তারা, এতকাল জেল খাটছে সেত দেশের জন্য, দশের জন্যই। তারা নিশ্চয়ই একটা বিহিত করিবেই।

সূর্য দেখে—ক্রমেই তাহাদের ইউনিয়নের সভ্য কমিয়া যাইতেছে—। মদনের মহাবীর আখড়া চুম্বকের মত টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহাদের।

যাহারা বাকি থাকে তাহাদেরও মন ভাঙিয়া যায় গত ষ্ট্রাইক ব্যর্থ হওয়ায়। বুঝিয়া উঠে না কোন ইউনিয়ন সত্যিকারের বাঁচার পথ ধরাইয়া দিবে।

প্রসাদের চোখে স্বচ্ছ হইয়া ধরা দেয়—মদনের মহাবীর আখড়ার স্বরূপ। একমাত্র তাহাদের ইউনিয়ন ভাঙাই উহার উদ্দেশ্য।

মনটা দমিয়া যায় তাহার। ইউনিয়নকে বাঁচাইয়া রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় মরিয়া হইয়া উঠে সে। এইত তাহাদের জীবন।

এক একটি ইউনিয়ন তাহাদেরই দেহের রক্ত চলাচলের শিরা উপশিরা। তাহাদের প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়া গড়া এই ইউনিয়ন—আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এই ইউনিয়নগুলিকে; কিন্তু তাহার চোখের সামনেই উহাতে আজ ভাঙনের চিড় ধরিতেছে। অথচ এ গতিরোধ করাও যে কি ভীষণ ক্লেশসাধ্য জানে সে।

বিমর্ষ ছায়া পড়ে কচি মুখখানিতে। ইউনিয়নঘরে বসিয়া বসিয়া একটা রিপোর্ট লিখে। সূর্য আসিয়া বসে পাশে।

"কাগজে রিপোর্ট পাঠিয়েই বা কি—কাগজে ছাপলে ত? একটা কাগজেও তোলে আমাদের কথা দেখেছেন?"

প্রসাদ ম্লান হাসি হাসে একটু সূর্যের কথায়। "আর বেশিদিন নয়—এইত আমাদের কাগজও বের হ'ল বলে। এ অবিচারের জবাব খুঁজে পাবে সে কাগজে।"

আবার আশায় দীপ্ত হইয়া উঠে হতাশায় ম্লান চোখগুলি।

"আসবে, আসবে—তাহাদেরও দিন আসছে সম্মুখে।" একে একে জড়ো হয় আরও কয়জন মেম্বার। মদনের বক্তৃতার আলোচনা হয়।

পরেশ নিজ কানে শুনিয়া আসিয়াছে মদনের এই ইউনিয়ন ভাঙার ফন্দির কথা।

চোখে মুখে অদমিত উত্তেজনা।

"এদের একমাত্র শায়েস্তা করা যায় মার দিয়ে।" সূর্যেরও মনের ছাই চাপা আগুন জলিয়া উঠে ভিতরে ভিতরে। মদনের শয়তানী জন্মের মত ঘুচান দরকার। একা মদনই ত নয়। চোরা গলির আঁকা বাকা অন্ধকার মোড়ে মোড়ে অগণিত শয়তানের প্রহরী। প্রত্যেকটি শয়তানের জন্যই শান দেওয়া হইবে ছুরি।

বিশ্বরূপ আসে না আর দীর্ঘকাল। পদ্মা যেন আর সহিতে পারিতেছে না এ কষ্ট। ইহা কি ইচ্ছাকৃত দূরে সরিয়া থাকা? তাহারই কল্যাণ কামনায় কি এমন করিয়া কষ্ট দিতেছে বিশ্বরূপ তাহাকে?

কিন্তু কিছুইত প্রত্যাশা করে না সে তাহার নিকট। শুধু উপলব্ধি

করিতে চায় তাহার উপস্থিতি। কিন্তু সত্যি কি তাই। সত্যি কি সে একবারও চায় না, বিশ্বরূপও একটু ভালবাসুক তাহাকে নিঃশব্দ গোপনে। সেও অংশ গ্রহণ করুক এ অসহনীয় কষ্টের। নিজেকে চুলচেরা বিচার করে সে। কেন এত উত্তেজনা ?

পাশের বাড়ীতে রেডিওতে কীর্তন গাহিতেছে সুকণ্ঠী কোনও গায়িকা—"বঁধুরে দেখিতে সাধ লাগে।"

যেন তাহারই মনের কথা শ্রীরাধার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে সে কোন দূর অতীত বৈষ্ণব যুগে, বৈষ্ণব গীতি-কাব্যে।

অরুণাভ ঘরে ঢোকে। পদ্মার চোখের এ কাতর ছায়া লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া বলে, "কি, বঁধুরে দেখিতে সাধ লাগে ?"

"তা' ত লাগেই।" সলজ্জ হাসিয়া উত্তর দেয় পদ্মা। মনে মনে মুগ্ধ হয় সে অরুণাভের মনের এ বলিষ্ঠতা দেখিয়া।

অরুণাভ দুষ্টুমিভরা হাসি দিয়া বলে, "আচ্ছা, তার ব্যবস্থা করে আসি। আয়ানের কাজই করি একটু।"

পদ্মা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলে শক্ত করিয়া, "সর্বনাশ। ভুলেও যেন টের না পায়। তা' হ'লে কিন্তু লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবো না আমি।" ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠে পদ্মা।

পদ্মা যেন আজ নূতন করিয়া অনুভব করিতেছে অরুণাভকে। কি তীব্র বেদনাভরা এই প্রেম-গভীর উপলব্ধি! অরুণাভ, তাহার জীবনের পরম সুহৃদ, একমাত্র বান্ধব। তবু তাহারই মনে এত অমার্জনীয় আঘাত দিতেছে সে কেন? সহস্রকণ্ঠে আর্তনাদ করে যেন তাহার সমস্ত চেতনা। মনে মনে উচ্চারণ করে সে, "প্রিয়, এ দুঃখকে তুমি মনে ঠাঁই দিও না। তোমার মনের বলিষ্ঠতা তোমাকে সরিয়ে রাখুক আমার কাছ-থেকে পাওয়া সকল দুঃখ থেকে।"

পদ্মা স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে দূরের পৃথিবীকে। পাশের বাড়ীতে রেডিওতে গাহিতেছে—"রোদন ভরা এ বসন্ত।"

পদ্মার মনে হয়—সমস্ত পৃথিবীময় যেন কি গভীর বেদনানুভূতি। পদ্মা মৌন হইয়া ভাবে, তাহারই মনের ছায়া পড়িতেছে কি সমস্ত পৃথিবীতে।

রেডিওতে পরবর্তী গায়িকা গাহিতেছে—"আনন্দ, আনন্দ আনন্দরে··· ।"

পদ্মা ভাবিয়া চলে, সমস্ত পৃথিবী ভরা আনন্দের ছড়াছড়ি—এও ত মনেরই একটা রূপ।

কিন্তু এ মনকে সৃষ্টি করিতেছে কে? বাহিরের জগত—বাহিরের সমাজ ব্যবস্থাইত।

বাইরের সমাজের ঘাত প্রতিঘাতে কখনও কাঁদে, কখনও হাসে মন। কখনও আনন্দময়, কখনও রোদনময় এ পৃথিবী। কখনও চৈতন্যময়, কখনও চেতনহীন এ বসুন্ধরা।

বিশ্বরূপ কিছুদিনের জন্য আবার পশ্চিমে যাইতেছে। যাওয়ার পূর্বে অরুণাভ নিমন্ত্রণ করে তাহাকে। পদ্মা পরম আগ্রহে রান্না করে, পরিবেশন করে এক ব্যথাতুর মধুর আবেশ লইয়া।

বিশ্বরূপ কয়দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছে পদ্মাকে। তাহার অনুভূতি-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে পদ্মা। তবু বাহিরে কিছু প্রকাশ করে না সে। একটা দুঃখবোধ নাড়া দেয় মনের গভীরে: জীবনকে ঠিক মত কাজে লাগাইতে পারিতেছে না পদ্মা। তাই এত বিষন্ন হইয়া পড়িতেছে সে। অরুণাভ আর পদ্মার মনের মূল গঠনেরই পার্থক্য। হয়তো শুধু বিবেক বুদ্ধির জোরেই পদ্মাও টের পাইয়াছে আজ সমাজের পরিবর্তনশীলতার মূল রহস্য। তাই হয়তো আসিয়াছে সে অরুণাভের কাছে।

কিন্তু অরুণাভের কর্মসাথী হওয়ার মত—তার আদর্শে জীবন শক্তিকে ব্যয় করার মত, মনের বলিষ্ঠ প্রস্তুতি নাই। এইজন্য এত নিঃসঙ্গ ভাবিতেছে পদ্মা নিজেকে আজ। তাই ভিতরে মন খুঁজিয়া বেড়ায় সান্ত্বনা, সঙ্গী, সমব্যথী। ভালবাসে, ব্যথা পায়। হয়তো সংগ্রামও করে মনে মনে। তাই এত চিন্তাক্লিষ্ট দেখায় পদ্মাকে। একটা পথ-না-পাওয়া স্রোতধারার মত উদ্বেল হইয়া উঠিতে চায় ভিতরের প্রাণশক্তি।

ইজিচেয়ারটায় গা এলাইয়া সে গল্প করে অরুণাভের সঙ্গে। পদ্মাও আসিয়া বসে ঘরে।

একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলে বিশ্বরূপ "রাত হ'ল এবার যেতে হয়। না হ'লে ট্রাম পাব না। পদ্মার স্বপ্নালু চোখে কি গভীর আকুলতা! বিশ্বরূপ লক্ষ্য করে। কি একটু ভাবিয়া বলে সে আবার, "আচ্ছা, এ সিগারেটটা খেয়েই উঠি।"

অরুণাভ আপত্তি জানায়, "সিগারেটটা ছাড়ুন এবার বিশুদা, এত কষ্ট পান।"

বিশ্বরূপ হাসিয়া বলে; "ছেড়েইত প্রায় দিয়েছি। শুধু দুবেলা খাওয়ার পর দু'টো।"

পদ্মা কথা বলে না, কথা শোনেও না। বিশ্বরূপ আর অরুণাভের টুকরা টুকরা কথাগুলি কানে স্পর্শ করিয়া যায়। একমনে চিন্তা করিয়া যায় সে, এমন করিয়া ভাল বাসিতেছে সে কেন বিশ্বরূপকে। বিপাশা, তাহার আবাল্যের বান্ধবী, তাহার প্রিয় অরুণাভ, শিশু কন্যা সকলেরই স্নেহ প্রেমপ্রীতিমাখা স্পর্শ ছুঁইয়া যায় চিন্তার কুহেলীতে।

কিন্তু তবুও ত ভালবাসিতেছে সে বিশ্বরূপকে। তাহাকে, তাহার উপস্থিতিকে উপলব্ধি করিতে উদ্‌গ্রীব তাহার অন্তর। কিন্তু কেন?

বিশ্বরূপের হাতের সিগারেট পুড়িয়া যাইতেছে। আর কয়টি মুহূর্ত মাত্র। তারপর চলিয়া যাইবে সে, হয়তো দীর্ঘদিনের জন্যই। কিন্তু তাহার মনে আঁকিয়া রাখিয়া যাইতেছে একটি চিরন্তনী ব্যথার রক্তমঞ্জুরী।”

বিশ্বরূপ সিগারেটের ক্ষুদ্র টুকরাটা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। উহা নিঃশব্দে পুড়িতে থাকে মাটিতে পড়িয়া।

পদ্মা একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে জ্বলন্ত টুকরাটার দিকে। ঠিক জ্বলন্ত অগ্নিকণা-গুলির মতই কি সে নিজেকে পুড়িয়া নিঃশেষ করিতেছে আজ? ভাবে পদ্মা। করুণ হইয়া উঠে তাহার দৃষ্টি। বিশ্বরূপ তাকায় একবার পদ্মার দিকে। কি মনে করিয়া আবার একটা সিগারেট ধরায়। গভীর দুঃখবোধের সঙ্গে সেও অনুভব করে পদ্মার এ তীব্র আকুলতাকে। আবার কথা আরম্ভ হয়। পদ্মা শুনিতে চেষ্টা করে। অবাক হইয়া ভাবে সে, তাহাকেই যেন বিশ্লেষণ করিতেছে বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপ বলিয়া যায়, “ব্যক্তিস্বতন্ত্র মনগুলির বিপদ কম নয়। যা' করতে চায় তারা, তা' করার পথে এদের বিঘ্ন প্রচুর, নানাদিক থেকেই। এ সমাজে নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পায় না এরা। তার ফলে আসে ফ্রাস্ট্রেশন। তারপর এ আত্মনিপীড়ন থেকে, একদল—যাদের অহমিকার অন্ধ চশমা ভেদ করে সমাজের প্রাণশক্তি ধরা পড়ে না—তারা চোরা বালিতেই আটকে পড়ে। ধীরে ধীরে আত্মক্ষয়ী ধ্বংসের মুখেই পা বাড়ায় নিজেদের অজ্ঞাতে।

“আরেক দল ইণ্ডিভিজুয়ালিষ্ট যারা টেরও পেয়েছে, সমাজের প্রাণশ্বাস কোনদিকে বইছে তাদেরও বিপদ কম নয়। কারণ প্রতিকুল বায়ুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মত বৈপ্লবিক প্রস্তুতি থাকে না এত বেশী ব্যক্তি

স্বাতন্ত্রবাদী মনের। সমষ্টি চেতনার মাঝে তাদের ব্যক্তি-চেতনাকে লোপ করে দিতে পারে না এরা। তার ফলে ভিতরের উপচে পড়া সৃজন শক্তি কাজে লাগাতে পথ না পেয়ে আত্মনির্যাতন শুরু হয়। জনকল্যাণ চাইলেও ঠিক কল্যাণপ্রসূ পথে চলতে সক্ষম হয় না। অবশ্য এর জন্য দায়ী যে পরিবেশ থেকে বড় হয়ে এসেছে এরা, সেই পরিবেশই।

ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে বিপাশার চাকরির জীবন। পাহাড়ী আবেষ্টনীর মাঝে ছোট্ট এক অরফ্যানেইজ স্কুল। চারদিকে ঘিরিয়া আছে পর্বত-লহরী।

বিপাশার চিরচঞ্চল মনও যেন এই প্রাকৃতিক অশান্তির মাঝে অনেকখানি স্থির হইয়া আসিয়াছে। শালগাছের তলায় তলায় স্লেট্ পেনসিল লইয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে অশান্ত শিশুগুলি। স্নেহ-কাতর অনাথ শিশুদের মনে এক যাদুর জাল ফেলিয়াছে যেন বিপাশা—তাহাদের দুরন্তপনা থামিয়া গিয়াছে, গাছপালা, পশুপক্ষী, পর্বতচূড়ায় আঁকার আনন্দে! ভাইবোনদের সাথে রোদে বসিয়া পান্তা-খাওয়া সোনালী সকালগুলির অবসান হইয়াছে কবে দিদি ভাইয়ের কাছে বসিয়া গল্প সোনার আগ্রহে আর কৌতুহলে—তাহারা টেরও পায় নাই।

বিপাশাও হারাইয়া ফেলিয়াছে নিজেকে চির-দুরন্ত শিশুর প্রশ্ন জালে।

ছয়মাস আগের কথা।

বহুকাল ধরিয়া তেল না দেওয়া রুক্ষ জটপাকান চুলগুলিকে আয়ত্তে আনিতে হিমসিম খাইয়া যাইত বিপাশা। উকুনে কিলবিল করিত ছোট ছোট মাথাগুলি। গাভরা চুলকানি। কিছুই জানিত না তাহারা শুধু আহার্য অন্বেষণ করা ছাড়া। ক্ষুধাতুর জোড়া জোড়া প্রলুব্ধ চোখ শুধু চোখে পড়িত তীক্ষ্ণ কর্কশ মুখগুলির মাঝে। চুরি করিবার নিত্য নূতন কারসাজি আর অপরকে ঠকাইবার অদম্য ইচ্ছায় বিদ্রোহ করিত তাহারা মাঝে মাঝে। কামড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া, সর্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া সক্রোধে ঘোষণা করিত বিদ্রোহের পূর্বাভাস।

কিন্তু বিপাশা ধৈর্য হারায় নাই। তাহার শিশু শিক্ষার ট্রেনিং নেওয়াকে চটকদার একটি জ্ঞানের বাক্সে ভরিয়া ঢাকিয়া রাখে নাই সে।

গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া বেণী বাঁধিয়া দেয় বিপাশা—ছোট ছোট মেয়েদের চুলে লাল ফিতা দিয়া। জন্মগত বিলাসী মেয়ে মনগুলি চুপ করিয়া থাকে লাল ফিতা পাওয়ার আনন্দে। ছেলেরা বশ মানে না অত সহজে। চুল আঁচড়ানোর চাইতে বল খেলাটাই বেশী প্রিয় তাহাদের। কিন্তু বিপাশার আনাড়ী হাতের শেলাই করা দুই রংয়ের খেলার সার্ট পরিতে পরিতে তাহারাও কোন ফাঁকে যে শান্ত হইয়া যায়—টের পায় না নিজেরাই। বোর্ডিং-এর মেট্রন যামিনী। সেও দুর্ভিক্ষ-জোয়ারে ভাসিতে ভাসিতে থামিয়া গিয়াছে এই স্কুলে।

যামিনী খুশি হইয়া বলে, "দেখছেন ঐ হনুমান ছিটাটাও আজ দুদিন হ'ল কেমন বাধ্য হ'য়ে গিয়েছে। আর প্রথমদিন ঐ ছোঁড়া কি

কামড়ই না বসিয়ে ছিল আমার ডান হাতে।" দাগটা এখনও মিলায় নাই। যামিনী আবার লক্ষ্য করিয়া দেখে।

বিপাশা খেলার বাঁশি বাজায়। ছেলে-মেয়েরা সারি দিয়া দাঁড়ায়—চোখে মুখে আত্ম প্রতিষ্ঠার কৌতুকময় পিপাসা।

সুপ্রিয় আসিয়াছিল কতকগুলি জিনিস পৌঁছাইয়া দিতে বিপাশার স্কুলে। সে ফিরিয়া গিয়া গল্প করিয়াছে অরুণাভের কাছে, "কে বলবে এ মেয়ে মিটিংয়ে যাওয়া, ষ্টাডি সারকেল নেওয়া, প্রসেসন লিড করা সেই বিপাশা!

"রংবেরঙ্গের কাপড় জোড়া দিয়ে ছোট ছোট ফ্রকসার্ট বানান থেকে দুই বছরের ছেলেকে মাছের কাঁটা বেছে দেওয়া—কিছুই বাদ নেই।"

বিশ্বরূপ শোনে মন দিয়া। দীর্ঘ দিন পর বিশ্বরূপ চিঠি লিখে বিপাশাকে।

"কল্যাণী বিপাশা, পাহাড়ী শিলার শান্ত মৌন পরিবেষ্টনীর মাঝে তুমি তোমার জগৎকে খুঁজে নিয়েছো—রস-মন জীবনের মাধুরী দিয়ে ঘিরে রেখেছো মুহূর্তগুলিকে, খুশিই হয়েছি শুনে। ছোট্ট নদী, বালুর চর, পাহাড়ী বন আর শান্ত সন্ধ্যার বুকে তোমার মমতাভরা জীবনের জোয়ার এসেছে। তোমার শিশু দোসরদের সাথে লুকোচুরি খেলার দুরন্ত ছবিগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় আমার এই লেখনীর বন্ধনে বাঁধা জীবনের ফাঁকে ফাঁকে।

"তবু হুশিয়ারি জানাই সাহসী মেয়ে। ভুলে যেও না, সংগ্রামের দীর্ঘ যাত্রার সবে মাত্র শুরু। দীর্ঘতম জটিল বন্ধুর পথ ভেঙেই এগিয়ে যেতে হবে সামনে।

"না, সন্দেহ আমি করছি না। তোমার ঐ সুন্দর শুভ্র হাত দুখানার

অনমনীয় শক্তির পরিচয় আমি পাচ্ছি আমার এই অক্লান্ত শয্যায় শুয়ে শুয়ে।

"তাই কৃপণ স্বাস্থ্যের অভিশাপ আমাকে ক্লান্ত করতে পারেনি। আমাকে দ্বিগুণ শক্তিমান করে তুলেছে এক নির্ভীক মেয়ে।

"আমার চতুষ্পার্শ্বে ছড়ান রয়েছে দৃঢ় লেখনী আর লেখার বলিষ্ঠ সরঞ্জাম। অনলস লেখনীতে বাঁধভাঙা বন্যার গতি ফিরে এসেছে। আমি অনুভব করছি তোমার আশা-নিবিড় উজ্জ্বল সন্ধ্যাগুলিকে।

"সৃজনমধুর শ্যামল বসুন্ধরার প্রতীক্ষায় প্রাণের বীজ বুনে চলেছো, স্রোতস্বিনী কন্যা! কিন্তু তার আগে সন্ধ্যার আকাশের রক্তমেঘের দিকেও তাকিও, ভীরু চোখে নয়—ঝড়ের পূর্বাভাসকে ভয় পাবে না তুমি, আমি জানি—প্রস্তুতির সঙ্কেত আঁকা সাবধানী দৃঢ় চোখে তাকিয়ে দেখো মাঝে মাঝে ঈশান কোণের কুটিল মেঘকে।"

চার পাচটি ছোট ছেলেমেয়ে ছুটিতে ছুটিতে আসে পিয়নের হাত হইতে চিঠি লইয়া। দিদি ভাইয়ের চিঠি! এও যেন একটা আনন্দের ব্যাপার তাহাদেরও। ছোটরা ঘিরিয়া দাঁড়ায়, "আমাদের কথা কি আছে চিঠিতে পড়ে শুনাও।"

বিপাশা ছোট ছোট চিঠি লেখা শিখায় ছাত্রছাত্রীদের। সত্যি সত্যি চিঠি লিখিয়া ও লেখাইয়া। নিজেই সে চিঠি লিখিয়া ডাকে দিয়া আসে ছোটদের জন্য, কোনও অজ্ঞাত বন্ধুর নামে। ছেলে-মেয়েদের আনন্দ উপছাইয়া উঠে চিঠি পাইয়া। নির্দিষ্ট গৃহকোণের বাহিরেও অদৃশ্য দূরে বসিয়া কেহ কাহারও কথা স্মরণ করে, কল্যাণ কামনা করে, ইহা মানুষের মনের অন্তর্নিহিত একটি কামনা।

আজ দিদি-ভাইয়ের চিঠির ভিতরে সেই কল্যাণময়ী রহস্যকে টানিয়া বাহির করিতে চায় শিশুরাও।

এনভেলাপের উপর প্রিয় হস্তাক্ষরে লেখা তাহারই নাম—বিপাশা একটু আরক্তিম হইয়া উঠে, লক্ষ্য করে যামিনী। ফিসফিস করিয়া বলে সে কানে কানে, "দিদিমণির বরের চিঠি বুঝি।" বিপাশা এনভেলাপটা খুলিয়া চোখ বুলাইয়া যায় চিঠিখানায়। তাহার রক্তে এক মধুর উত্তেজনা মিশাইয়া দিয়া যায়। বিশ্বরূপের অন্তরে উজ্জ্বল হইয়া আছে সে আজও। বারে বারে উচ্চারণ করে মনে মনে, না, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই সে।

বিপাশা নূতন প্রেরণা লইয়া নামিয়া আসে শিশুর জগতে; গল্প শোনানর ছলে শিশু মনকে আয়ত্তে আনার আগ্রহে।

"বন্ধু কি লিখেছে তোমাদের কথা শুনবে নাকি। পিণ্টু সুন্দর পেনসিলটি হারিয়ে ফেলেছে বলে, রাগ করেছে সে। মধু তার জামা কাচতে শিখেছে, তাই খুশি হ'য়েছে বন্ধু। এক শো পর্যন্ত এক দুই গুণতে শিখেছে যারা, তাদের নামে চিঠি আসবে শীগ্‌গীরই।"

শনের রান্নাঘরের বারান্দায় বিকালের খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। ছেলেমেয়েরা চলিয়া যায়; নিজেদের চিহ্নিত বাটি লইয়া বসে চাটাইয়ের উপর।

বিপাশা এই ফাঁকে আরেকবার খুলিয়া পড়ে চিঠিখানা। দূর মহা সঙ্গীতের মত ভাসিয়া আসে যেন এক গম্ভীর সুর—বিপাশার দৃষ্টি স্থির হইয়া যায়। সম্মুখে প্রশান্ত, সুপ্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে রৌদ্রে-নাওয়া পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। আরও বহুদূরে দেখা যায় অটল গম্ভীর পর্বত লহরী।

বিপাশাও আজ চুপ করিয়া ভাবিতে চায়।

গমভুট্টার ক্ষেতের গা-ছোঁওয়া আদিম বাসিন্দাদের মাটির উঠানে ধুঁয়া দেখা যায়। দিন ভরিয়া বুড়ীরা শুকনো ঝরা পাতা ঝাড় দিয়া লইয়া যায়—শীতের সন্ধ্যার আশংকায়। শীতের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—লাউ সীমের লতায় ঘেরা উঠানে উঠানে। শীতার্ত উলঙ্গ শিশুরা গোল হইয়া বসিয়া গিয়াছে হয়তো এতক্ষণে আগুনের চার ধারে।

বিপাশার দৃষ্টি চলিয়া যায় আরও দূরে—আরও সম্মুখে। স্কুলবাড়ীর ছোট্ট ময়দানের বুকে বসিয়া বসিয়া ভাবে বিপাশা—ঐ পাহাড়তলীর শিশুদের এই অশ্রুঝরা জীবনই শেষ যবনিকা নয়। ইতিহাসের পাতার আরও বহু পৃষ্ঠাই বাকি আছে এখনও। আরও বহু বহু আগুনেরই প্রয়োজন উলঙ্গ শিশুদের এ শীত মিটাইতে। ঐ শুকনো-পাতার আগুনের উত্তাপটুকুই শেষ উত্তাপ নয়।···

বিপাসার চমক ভাঙে। ছোট্ট একটি নরম দেহের আলিঙ্গনে। ছয় বছরের একটি মেয়ে—পিছন দিয়া ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, "আমার কথা নেই কিছু চিঠিতে।"

বিপাশা তাহাকে কাছে টানিয়া, জামার বোতামটা লাগাইয়া দিতে দিতে বলে, "আছে রে আছে। ক লিখতে শিখেছে তিনু, তাই খুশি হ'য়েছে সে। আর জামার বোতাম খুলে রাখে তাই রাগ করেছে।"

রাত্রি নামিয়া আসে। ছোট ছোট খাটিয়ার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অশান্ত শিশুরা। বিপাশা শোওয়ার ঘরটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া যায় পা-টিপিয়া টিপিয়া। একটি দুষ্টু ছেলে ঘুমায় নাই তখনও—চোখ পিট পিট করিতেছে। ছেলেটি পালাইয়া গিয়াছিল একবার। তাই অতি সাবধানে, তাহার অজ্ঞাতে পাহারা দিতে হয় তাহাকে।

বিপাশা নিজের ঘরে বসিয়া অপেক্ষা করে। আধঘণ্টা পড়ে আবার দেখিয়া যায়—ঘুমাইয়া পড়িয়াছে দুরন্ত ছেলেটিও। কিন্তু বিপাশা ঘুমায় না। চিঠির জবাব লেখে।

ভোর হয়, বেলা বাড়ে। রৌদ্র প্রখর পাহাড়ী পথ ভাঙিয়া হাঁটে বিপাশা চিঠি পোষ্ট করিতে। উঁচুনীচু ঢেউ খেলান দীর্ঘ পথ। একাই হাঁটে বিপাশা। মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য। রৌদ্রে ডুব দিয়া উঠিয়াছে পাহাড়ী শহরটুকু। বিপাশা মাথায় কাপড়টা টানিয়া দেয় পেছনের সূর্যকে আড়াল করিতে। সম্মুখে লাল কাঁকর-বিছান পথে তাহারই দেহভঙ্গির ছায়া পড়ে। একলা পথচারী একটি নারী মূর্তির কায়াহীন ছায়ায় এক হারানো সুরের বেদনা জাগায়—বিপাশার মনের গভীরে। এক অপরিচিত অনুভূতি নাড়া দেয় আজ এ অনিন্দ্য-সুন্দর দেহছায়া।

রূপসী কন্যা বিপাশা। কিন্তু রূপের চেতনায় মন আটকাইয়া যায় নাই তাহার কোনদিনই।

বিপাশা একমনে দেখে আজ, নিজেরই দেহছায়া। সঙ্গীহীন এ পথ শ্রান্তিকে সজাগ করাইয়া দিতে চায় উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন। পাশ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যায়, কোলের উলঙ্গ কালো শিশুদের স্তন দিতে দিতে সাঁওতাল রমণীযুগল। মসৃণ আবরণচ্যুত যৌবনপুষ্ট স্কন্ধ, খোঁপায় গোঁজা মহুয়াফুল।

হাস্য-মুখরা সাঁওতালিনীর দৃষ্টিতে কটাক্ষ মধুর স্বামীসোহাগেরই কুহেলী।

নারীচিত্তের রহস্যময়ী সুপ্ত চেতনাগুলি নড়িয়া চড়িয়া উঠিতে চায় ঘুমন্ত মনের তলদেশ হইতে।

ধীরে ধীরে হাঁটে বিপাশা। সম্মুখের পাহাড়শ্রেণী ঝাপসা হইয়া

যায় স্বপ্নাতুর দৃষ্টির আড়ালে। চোখের সামনে ভাসিয়া আসে—রোগশয্যায় শায়িত একটি প্রশান্ত মূর্তি। অরুণাভ জানাইয়াছে,—বিশ্বরূপের অসুখ বাড়িয়াছে।

ম্লান হইয়া আসে চোখের অতি উজ্জ্বল তারা দুটি। আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া উঁকি মারে বিশ্বরূপের চিঠির দীপ্ত ছত্রগুলি—"হুঁশিয়ারী জানাই সাহসী মেয়ে।"

পদ্মার শিশুকন্যার মুখে বুলি ফুটিয়াছে, লিখিয়াছে অরুণাভ। খুশিতে আর কৌতুকে জ্বল জ্বল করিয়া উঠে আবার চোখ দুটি। চোখের সামনে ভাসিয়া আসে দোলনায় শোয়ান ছোট্ট একটি তুলতুলে নরম শিশু।

অরুণাভ-পদ্মার সন্তান! কেমন হইয়াছে দেখিতে, মনে মনে একটু কল্পনা করিতে চেষ্টা করে।

দূরে স্কুলবাড়ীতে ঘণ্টা শোনা যায়। দ্রুত পা চালায় বিপাশা।

গভীর রাত্রি। পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিপাশা বাতির সলতেটা একটু চড়াইয়া দিয়া, খুলিয়া বসে অসমাপ্ত বইখানা। সোভিয়েট প্রাচ্যের বোরখা পরা লক্ষ লক্ষ মেয়ের মুক্তির ইতিহাস—সমরখন্দের নব প্রভাত।

চোখের সামনে ভাসে অসংখ্য বিপ্লব।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলি। বিপাশা পড়িয়া যায়।

"…ব্যাণ্ডে আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা পারাঞ্জা, বোরখা, চাদর খুলে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে পারাঞ্জা চাদরের পাহাড় জমে উঠলো। তা'তে প্যারাফিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল। হাজার বছরের গোলামির নিদর্শন ধূ ধূ করে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো…"

বিপাশা চিন্তামগ্ন হইয়া ভাবে, "এ দেশেও জ্বলবে ওরকমই লক্ষ ফণার আগুন। মেয়েদের দাসত্বের লৌহশিবির এখানেও পুড়ে ছাই হ'বে।"

পাশের ঘরে একটি ছোট্ট মেয়ে স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিয়া উঠে তীব্র আর্তনাদ করিয়া।

বিপাশা দ্রুত ছুটিয়া যায়—"কি হয়েছে রে আহ্লাদী।" সস্নেহে ডাকে বিপাশা।

"মাকে শিয়ালে খেয়ে ফেলছে।" স্বপ্নের ঘোরেই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে পাঁচ বছরের মেয়েটি। বিপাশার বুকের ভিতরে মোচড় দিয়া উঠে এ কান্নায়। শিশুটিরই মত অসংখ্য ক্রন্দন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে তাহারও ভিতরে। দুর্ভিক্ষে না খাইতে পাইয়া মারা গিয়াছে আহ্লাদীর মা, জানে তাহা বিপাশা। হয়তো তাহার চোখের সামনেই শিয়াল শকুনে ছিঁড়িয়া খাইয়াছিল আহ্লাদীর সব চাইতে প্রিয়তমার গলিত দেহ।

অবিস্মরণীয় সেই স্মৃতি দুস্বপ্নময় করিয়া তুলিতেছে প্রতি রাত্রিতে শিশুর সুন্দর নিদ্রালু চোখের পর্দাকে। বিপাশা টানিয়া লয় শিশুটিকে বুকের কাছে। মায়ের স্পর্শের মত উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করে বুঝি সে দিদি ভাইয়ের বুকের তলায়, আস্তে আস্তে হাত বুলায় মাথায় বিপাশা। ধীরে ধীরে তাহারই বুকের কাছে নিবিড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে আহ্লাদী।

বিপাশা পরম স্নেহে মনে মনে উচ্চারণ করে একবার "আহ্লাদী।" হয়তো কত আদর করিয়া এ নাম রাখিয়াছিল মা বাবা। কিন্তু কি ভয়ংকর আর কি ভীষণ পরিণতি স্নেহশীলা পরিবারের। মাতৃপিতৃহীন দুর্ভিক্ষের অনাথ শিশুর উষ্ণ নিঃশ্বাস বুকের কাছে; আর চোখের সামনে—লক্ষ লক্ষ পারাঙ্গা আর বোরখার ধূমায়মান আগুন। কি অনির্বাণ উত্তেজনা মস্তিষ্কের স্নায়ুতে।

দূরের জমিদার বাড়ীতে প্রহরের ঘোষণা জানায় এক-তুই। বিপাশার নিদ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে আবার—ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লেখা "হুঁশিয়ারী জানাই—সাহসী মেয়ে।"

বিশ্বরূপের রোগ যন্ত্রণা বাড়িয়াছে কয়দিন যাবৎ। পদ্মা ব্যস্ত হইয়া বলে অরুণাভকে, "বিপাশাকে টেলী কর।"

বিশ্বরূপ অরুণাভের বিশেষ অনুরোধে তাহাদের বাড়ীতেই থাকে অসুখের জন্য।

অরুণাভ পদ্মার কথায় উত্তর দেয়, "এ রোগে ভয়ের কিছু নেই, তবে ভোগের আছে। বিপাশাত আসছেই তুদিন বাদে—অত উতলা হওয়ার কিছু নেই।"

পদ্মা প্রাণ ঢালিয়া সেবা করে বিশ্বরূপের। বিপাশার যাওয়ার সময় ভেজা-কথাগুলি কানে বাজে, "পদ্মা, তোমার উপরই সব ভার রইল।"

পদ্মার ভিতর হইতে আর্তকণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠে মনে মনে, "ভাল মানুষের উপরই ভার দিয়ে গিয়েছো, বিপাশা। তুমিত জান না, আমি তোমার বন্ধুত্বের কত অযোগ্য!"

কিন্তু সেবার ত্রুটি নাই পদ্মার। বেহুঁশের মত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বিশ্বরূপ। শ্বাসনালী যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে মনে হয়। মাঝে মাঝে তাকাইয়া দেখে, পদ্মা তখনও বসিয়া আছে পায়ের কাছে গরম জলের ব্যাগ লইয়া। অস্পষ্ট স্বরে বিশ্বরূপ বলে, "যাও শোও গিয়ে, পদ্মা। কত রাত হ'ল।"

পদ্মা মনে মনে বলে, "আমার মনের তলায় যে কি ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হ'য়েছে তা' ত আপনি জানেন না। তাই এত উতলা হ'চ্ছেন। তাই শুধু আমার সেবাটাই চোখে পড়ছে।" চুম্বকের

মত কিসে যেন ধরিয়া রাখে পদ্মাকে। নীচে শিশু কণ্ঠের কান্না শোনা যায়।

বিশ্বরূপ চোখ মেলিয়া বলে, "যাও লক্ষ্মীটি, আমার কোনও কষ্ট হ'বে না।"

পদ্মা নীচে চলিয়া যায়।

বিশ্বরূপ ভাবে পদ্মার কথা। পদ্মা তাহাকে এমন করিয়া ভালবাসিতেছে কেন এ জীবন-সন্ধ্যায়। বিশ্বরূপ অনুভব করে, পদ্মার মনের অবস্থা—ভালবাসিয়া দুঃখ পাইতেছে, আবার ভালবাসিতেছে বলিয়া দুঃখ পাইতেছে।

একটা অসহায় বেদনানুভূতিতে আবিষ্ট হইয়া থাকে বিশ্বরূপের রোগক্লিষ্ট মন। ধীরে ধীরে উপশম হয় শ্বাসের কষ্ট। দূরের স্নিগ্ধ আকাশে ভোরের সূর্য দেখা দেয়, জ্যোতির্ময় দেবতার আবির্ভাবের মত। রৌদ্রের মৃদু উত্তাপ লাগে রক্তহীন দেহে। পদ্মা দুধ লইয়া আসে। বিশ্বরূপ তাকাইয়া দেখে পদ্মার মুখে তীব্র চিন্তাক্লেশের ছায়া পড়িয়াছে। কচি মুখখানি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে কি এক দুঃসহ দুঃখের তাপে।

বিশ্বরূপ অরুণাভকে বলে, "পদ্মার শরীরটাত ভেঙে পড়েছে—ওকে নিয়ে দেশে গিয়ে থাক না কিছুদিন।"

মনে মনে ভাবে সে, দূরে গেলে হয়তো ভুলিতে পারে পদ্মা তাহাকে ধীরে ধীরে।

বিশ্বরূপ একটু অবাক হইয়া দেখে, পদ্মাও আজ তাহার অনেকখানি চিন্তাই জুড়িয়া বসিয়াছে। পদ্মার কথা ভাবিলে মনটা ভিজিয়া উঠিতে চায় যেন। একটু বিস্মিত হয় সে।

বিশ্বরূপ ভাবে, এ কি দুঃসহ পরিহাস? জীবনের দিগন্ত রেখায় পৌঁছিয়াও নিষ্কৃতি নাই মানবমনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে।

এক বিপাশার সমস্যাতেই ভারাক্রান্ত সে আজ। কোন বিগত যৌবনের সুন্দর তিথিতে বিপাশাকে গ্রহণ করিয়াছিল সে মনের একান্তে। পুলিশের কৃপাদৃষ্টি না পড়িলে তাহাদের বিবাহও হইয়া যাইত বহু আগেই। কিন্তু কালের কুটিল ইঙ্গিতে তাহা হয় নাই। তবু সে বিশেষ ভাবেই আজ জড়িত বিপাশার জীবনের সঙ্গে। চঞ্চল বিপাশাও অটল, স্থির তাহার অতীত অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষায়।

বিশ্বরূপ তাই বড় বিব্রত আজ নিজেকে লইয়া, নিজের পঙ্গুজীবনের ভার লইয়া।

তাহার উপর আবার পদ্মা এক বিরাট পর্বত প্রমাণ সমস্যা লইয়া দেখা দিয়াছে তাহার দুয়ারে। এ ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত পৃথিবীকে সহ্য করার পক্ষে বড় বেশী কোমল, বড় বেশী ভাবপ্রবণ মন ওর। বিপাশার মত প্রাণের সজীবতা দিয়া দুঃখকে উড়াইয়া দিতে জানে না পদ্মা।

বিশ্বরূপ ভাবিয়া যায় একমনে—

বহুল সমস্যাভরা এ প্রেম-পরীক্ষার মীমাংসার প্রয়াস চলিতেছে পৃথিবীর একাংশে। কিন্তু উহার সমাধান মিলিয়াছে কি সেখানে? পদ্মা আজ তাহাকে ভালবাসিতেছে বলিয়া কাঁদিতেছে কেন? জটিল প্রশ্ন জালে ঘেরা পৃথিবীর প্রেম ইতিহাস।

সাতদিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছে বিপাশা। বিশ্বরূপ ভাল আছে অনেকটা। একটা গরম চাদর গায়ে দিয়া শুইয়া শুইয়া পত্রিকাটা উল্টায়।

বিপাশা ঘরে ঢোকে ভাইঝিকে কোলে লইয়া। তাহার অনভ্যস্ত হাতে জড়াইয়া লয় শিশুটিকে একটা কল্কা আঁকা নরম কাঁথার ভিতরে।

"উঃ! এত বেশী সুন্দর হ'য়েছে মেয়েটা, আমাকে শুদ্ধ মায়ায় ফেলেছে এ দুদিনেই।"

বিশ্বরূপ তাকাইয়া দেখে—বিপাশারই মত হইয়াছে দেখিতে। বিপাশারই শিশুমুখখানা কাড়িয়াছে যেন শিশুটি। আশ্চর্য সাদৃশ্য।

বিপাশা অজস্র আদরে অস্থির করিয়া তোলে শিশুটিকে। বিশ্বরূপ অপলক চোখে দেখে।

কি অপরূপ স্নিগ্ধ মূর্তিতে আসিয়াছে বিপাশা আজ তাহার ঘরে। সে ভাবে, এই জন্যইত এ মূর্তির এত আদর যুগযুগ ধরিয়া শিল্পীর মনে।

শিশুটি কাঁদিতে আরম্ভ করে। কিছুতেই শান্ত করিতে পারে না বিপাশা তাহাকে। হয়রান হইয়া যায় সে।

বিশ্বরূপ মৃদু হাসিয়া বলে, "ওর ক্ষিধে পেয়েছে—পদ্মার কাছে দিয়ে এসো।"

বিশ্বরূপ কি যেন চিন্তা করে এক মনে। ধীরে ধীরে ব্যথার ছায়া নামিয়া আসে তাহার মনে। গভীর চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া পড়ে সে। বিপাশার জীবনকে পরিপূর্ণতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিল নাকি সে। অবুঝ বিপাশা।

নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যকে এমন করিয়া অভিশাপের মূর্তিতে দেখে নাই আর কখনও বিশ্বরূপ।

বিপাশা পদ্মার মেয়েকে রাখিয়া আবার আসিয়া বসে। গভীর আবেগে হাতখানা ধরে বিশ্বরূপ নিজের রোগ-দুর্বল হাতের মুঠিতে—"পাশা।"

বিপাশা বিস্মিত হইয়া দেখে ঐ বলিষ্ঠ মানুষটির চোখের পাতায় কি ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে। অনুমানেই বোঝে সে সব। তাহার জন্যইত এ কষ্ট ভোগ করিতেছে বিশ্বরূপ।

বিপাশা তাহার চুলে হাত বুলাইয়া বলে কোমল স্বরে, "মিছি মিছি কষ্ট পাচ্ছেন?" তারপর একটু সস্নেহ শাসনের সুরে বলে "লেখকের দৃষ্টিত অত স্থুল হওয়া উচিৎ নয়।"

বিশ্বরূপের আজ যেন মনে হয়, শুধু লেখনীই মানুষকে পূর্ণ করিতে পারে না। ভিতরের মন আরও কিছু চায়। আরও কিছু খোঁজে।

পদ্মাই তাহার এ অবলুপ্ত মনকে আবার জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। বিপাশা আজ দীর্ঘ বছর পরে উপলব্ধি করে আবার, বিশ্বরূপের মন আজও ভালবাসিতে ভুলিয়া যায় নাই। বয়স আর রুগ্ন স্বাস্থ্যের প্রখর সচেতনতার আড়ালে চাপা ছিল যে গভীর সত্যের উপলব্ধি, তাহার আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে কোন্ যাদুর স্পর্শে!

পদ্মা এ কয়দিন খুব কম আসে বিশ্বরূপের ঘরে। সব সময়ই একটা আতঙ্ক চাপা থাকে তাহার মনে—বিপাশা যদি টের পাইয়া যায় তাহার মনের এ গোপন চঞ্চলতা।

বিপাশা, তাহার জীবনের পরম বন্ধু, তাহার কাছে যে সে আজ কত অপরাধী সে সংবাদ সযত্নে, সক্লেশে গোপন রাখে পদ্মা।

বিশ্বরূপও টের পাইয়াছে পদ্মার এ মনের সংশয়। পদ্মা মেয়ের পরিচর্যা করে, বাকি সময় রান্নাঘরে নানা কাজে ব্যস্ত রাখে নিজেকে। বিশ্বরূপ লক্ষ্য করে পদ্মার এ দূরে সরিয়া থাকা।

বিপাশাও লক্ষ্য করে। মনে মনে ভাবে সে, পদ্মা হয়তো বিশ্বরূপকে একান্তে পাওয়ার সুযোগ দিতেছে তাহাকে। মনে মনেই লজ্জা পায় একটু। তবু ডাকে পদ্মাকে, "মাত্র সাতদিনের জন্য এলাম, কত কথা জমা আছে। রান্নাবান্না রেখে একটু সুস্থির হয়ে বসত পদ্মা, গল্প করি।"

পদ্মা হাসে, মমতামাখা করুণ হাসি। তাহার মনে যে কি দ্বন্দ্ব চলিতেছে অহর্নিশি বিপাশাকে শোনায় সে কেমন করিয়া!

মুখে বলে, "শুধু কথার বুনানিতে মন ভরলেও, পেটত ভরবে না। সে-দিকেও একটু নজর দিতে হয়। তুমি বস, আমার হ'য়ে যাবে আধঘণ্টায়ই।"

কিন্তু আধঘণ্টার স্থানে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যায়, পদ্মা আর ফেরে না।

বিপাশার চোখে ঘন-দুষ্টুমীর হাসি ফুটিয়া উঠে। মনে মনে বলে, "দেখো পদ্মার কাণ্ড। আমাকে যেন ছেলেমানুষ পেয়েছে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

বিশ্বরূপ হাসে, মৃদু, নম্র হাসি। মনের ভিতরে তাহারও একটা মমতামিশ্রিত সমব্যথার কাঁটা বিঁধিতেছে অনুক্ষণ।

এমনভাবে সকলের অজান্তে আর কতকাল এ কষ্টভার বহিবে পদ্মা।

এরই মধ্যে বিপাশার নামে আঁকাবাঁকা হাতে লেখা বহু চিঠি আসিয়া হাজির।

অরুণাভ জোরে জোরে পড়িয়া শুনায় নরম-হাতে লেখা কাটা-ছেঁড়ায় ভরা অসংলগ্ন অক্ষরের লিপিকা।

"দিদি ভাই, পিলু আমার খাতায় কালি ঢেলে দিয়েছে। তুমি কবে আসবে।"

কিংবা, "কুকুরের বাচ্চা হ'য়েছে—তুমি শীগ্‌গীর চলে এসো।"

অরুণাভ হাসে। "বুচির খাতায় কালি ঢেলেছে পিলু, কুকুরের বাচ্চা হ'য়েছে, লাউ গাছে লাউ ধরেছে, তারপর কি আর আমরা বিপাশাকে ধরে রাখতে পারি? বিশ্বদাকে এবার ছুটি মঞ্জুর না করে কিন্তু উপায় নেই।"

অরুণাভ খুশি হয়; বিপাশা তাহার জীবনের মাধুরী হারায় নাই। কৃপণ বিধাতার নিষ্ঠুরতাকে হার মানাইয়াছে এ মেয়ে।

অরুণাভের মন চলিয়া যায় দূরে। চোখের সামনে ভাসে—ছোট ছোট লাল নীল ফ্রক পরা, সার্ট পরা দুরন্ত ছেলেমেয়ে বেষ্টিতা বিপাশা। চোখেমুখে নামিয়া আসিয়াছে স্বপ্তির উন্মাদনা।

সুপ্রিয়ের একদিন ঘুম ভাঙিয়াই মনে হয়, ট্রামে বাসের ঘর-ঘর শব্দ শুনিয়া ঘুম ভাঙার চাইতে গ্রামের বাড়ীর পাখীর ডাক শুনিতে শুনিতে ঘুম ভাঙার মধুরতা অনেক বেশী। চরের এক মাতব্বর মুসলমানের বাড়ীতে বেশ কিছুকাল কাটাইয়াছিল সে গোপন যুগে। ভোর রাত্রি হইতে মুরগীর ডাক শুরু হইত। ঘুম জড়ান মনের মধ্যে সেই কুক্কুরু কু—ডাক বেশ একটা অলস রেশ বুলাইয়া দিয়া যাইত। আর এখানে ঘুম ভাঙিয়াই মনে পড়ে কলেজের রুটিন।

কি মনে করিয়া সুপ্রিয় চা খাইয়াই বাহির হইয়া যায়। এবং বেশ বেলা করিয়া বাড়ী ফেরে—দুই হাতে দুইটা হৃষ্টপুষ্ট মুরগী লইয়া। মুরগী দুইটাকে সে তাহার লোহার খাটের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া কিছু চাউল খাইতে দেয়। তারপর বিছানায় শুইয়া সিগারেট টানিতে টানিতে মনে মনেই কল্পনা করিতে থাকে—কি জাতীয় প্যাষ্টোরাল আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে আগামী ভোর হইতে তাহার খাটের তলায়। খুশি মনেই সে বাহির হইয়া যায় বিকেলে।

সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরিয়া দেখে, ঘরে মুরগী দুইটার একটাও নাই। চাকরের নিকট খোঁজ লইয়া শোনে, সেই মুরগী দিয়া কোরমা রান্না হইতেছে পাশের ঘরে। পাশের ঘরে গিয়া একটু করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে, ষ্টোভের উপর এলুমিনিয়ামের পাত্রে ফুটিতেছে তাহার শখের প্রাণী দুইটি। সারাটা সকাল সে নষ্ট করিয়াছে এইজন্য!

"কলিগ" বন্ধুটি খুশির সুরে বলে, পাকা দুইসের মাংস দুইটা মুরগীতে। ডিমও ছিল। খুব টেষ্টফুল হ'বে।"

সুপ্রিয় মনে মনে ভাবে, "এত আর খাঁচায় ভরা চালানী মুরগী নয়; দস্তরমত ট্রেনে করে গিয়ে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা সদ্য টাট্‌কা গ্রাম্য মুরগী।"

সুপ্রিয় চুপ করিয়াই থাকে বন্ধুটির রান্নার উৎসাহ ও আয়োজন দেখিয়া।

তাহার কলিকাতার তিন তলার ঘরে শুইয়া শুইয়া যমুনার চরের আবহাওয়া উপভোগ করার এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কথাটা গোপনই রাখে সে। নিজের ঘরে আসিয়া আবার এক মনে সিগারেট পোড়াইয়া চলে সুপ্রিয়। মনে মনে ভাবে, এখানে আর খাপ খাইতেছে না মন। এর চাইতে দেশে গিয়া স্কুলের মাষ্টারী লইলে কেমন হয়।

বিপাশা বলে, এবার একটা বিয়ে দিতে হয়। নাহ'লে তোমার পাগলামী ছাড়বে না।"

সুপ্রিয়ের মন্দ লাগে না ভাবিতে, সর্বক্ষণের জন্য একটি সঙ্গিনী পাওয়া!

সে জানায়, "যদি পনের দিনের মধ্যে মেয়ে ঠিক করে দিতে পারিস তবে বিয়ে করতে পারি।"

বিপাশা বলে, "পনের দিন বড় কম সময় দিলে।"

"আচ্ছা তবে দুইমাস সময় দিলাম।"

দুইমাস পরে বিপাশা সতি সত্যি সুপ্রিয়ের জন্য মেয়ে ঠিক করিয়া ফেলে তাহারই এক কলেজ বান্ধবীর ছোট বোন।

পদ্মা বলে, "তাহলে একদিন তাকে নিমন্ত্রণ কর আমাদের বাড়ীতে। শুভ-পরিচয়টা হ'য়ে যাক।"

স্বপ্রিয় ঘাবড়াইয়া যায় উহাদের কাণ্ড দেখিয়া।

বিপাশা বলে, "তোমার মত কি বল এবার। নিমন্ত্রণ করবো তাহ'লে।"

স্বপ্রিয় ভীত কণ্ঠে উত্তর দেয়, "নারে বিপাশা, বিয়ে টিয়ে আমার পোষাবে না। ও ভাবতেই কেমন ভয় ভয় করছে। এই বেশ আরামে আছি।" বিপাশা চটিয়া বলে, "তাহলে সেদিন কেন বল্লে?"

স্বপ্রিয় অনুরোধের স্বরে বলে, "লক্ষীটি বোন, রাগ করিস না। তুই একটা কিছু ছুতো দিয়ে এ প্রস্তাব ভেঙে দিয়ে আয়। আগে অতটা ভাবিনি। বিয়েটিয়ে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার রে।"

পদ্মা একটু ফোড়ন কাটে, "তার চাইতে প্রেমটা অনেক সহজ ব্যাপার, না?"

স্বপ্রিয় হাসে "না, সেটাও এমন কিছু সহজ না পদ্মা। সব চাইতে সোজা হ'চ্ছে—সিগারেট আর রেস্তোরাঁ; কিংবা কফি হাউস।"

গম্ভীর স্বভাব পদ্মা স্বপ্রিয়ের নিকটেই শিখিয়াছে পৃথিবীকে একটু হালকা ভাবেও গ্রহণ করিতে মাঝে মাঝে। নীতি আর রাজনীতিতে দম আটকান নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের হৃদয়যন্ত্রটা যেন স্বপ্রিয়ের নিকট আসিয়া একটু শ্বাস ফেলিবার স্বযোগ পায়। শুধু গম্ভীর প্রশান্তিময়ই নয় এ বিশাল জীবন-সমুদ্র, তাহারও আছে উপভোগ্য ফেনিল-তরঙ্গ, এ সংবাদ ত স্বপ্রিয়ই ধরাইয়া দিয়াছে তাহাকে।

স্বপ্রিয় অবাক হইয়া দেখে, তাহার নিজেরই মূর্তির প্রতিচ্ছবি পদ্মার ভিতরে।

স্বপ্রিয় জোর করিয়া একটা গাম্ভীর্য চাপাইয়া রাখিয়াছিল তাহার নিজস্ব স্বভাবের উপর বছর ধরিয়া। আজ পদ্মার সহজ দুষ্টুমিমাখা ব্যবহারে তুলিয়া যায় সে তাহার কৃত্রিম গাম্ভীর্য। আবার সহজ

ভাবেই যাতায়াত শুরু করে সে পদ্মা-অরুণাভের কাছে। রহস্য প্রবণতায় আবার অফুরন্ত হইয়া উঠে।

পদ্মা ঠাট্টা করিয়া মাঝে মাঝে হুঁশিয়ার করে, "একটু চিন্তা ভাবনা করে চলতে শেখ, সুপ্রিয়। ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। *না হ'লে তপস্যার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করা, একি তোমার ধাতে সইবে?"*

সুপ্রিয় অবাক হয় মনে মনের, পদ্মার মনে সে পিউরিটান মূর্তিটি আর নাই। যুক্তিদ্বারা অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিলেও পদ্মার মনের গঠনে রক্ষণশীলতার ছাপ স্পষ্টই ছিল। একটা রোমান্টিক চির-শাশ্বত, পবিত্রতার উপাসক ছিল সে।

সুপ্রিয় হাসিয়া বলে, "পদ্মা, কালের প্রবহমানতার সঙ্গে মানব-মনেরও যে প্রবহমানতা আছে, এ কথাটা বুঝতে পেরেছো তবে এতকালে।"

পদ্মা উত্তর দেয়, "হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে না বোঝার কি? মানুষইত আমি। মানুষের অনুভূতি আর বুদ্ধিও চিরকালই বুঝবার জন্যই উদ্‌গ্রীব। অবশ্য, শুধু লেকচার শুনে বুঝবার মত মেয়ে আমি নই।"

"তা হ'লে এতদিন এ শুভবুদ্ধিটা কোথায় ছিল?"

"এজন্য তোমরাই দায়ী—কমরেডরাই। তোমাদের মধ্যে দেখেছি একটা নিষ্প্রাণ উগ্র চঞ্চলতা। গতিশীলতার মাঝেও যে প্রাণ আছে, এ শুধু স্প্রীংয়ে চাবী দেওয়া চলনশীলতা নয়, তা'ত বোঝাতে পারনি তোমরা এতকাল। আমার চোখে তাই তোমাদের চালচলন সবই আর্টিফিসিয়াল বলে মনে হত। ঠিক প্রাণরসপুষ্ট-পায়ে চলা বলে' মনে হয়নি। কিন্তু আজ এমন একটি মানুষের সন্ধান পেয়েছি, যিনি আমার

দৃষ্টিদান করতে পেরেছেন। তাঁর কাছেই বুঝেছি, শুধু শাশ্বতের উপাসক নয়, চিরসজীব, চিরনবীনেরও উপাসক হ'তে হ'বে।"

সুপ্রিয় ঠাট্টা করে, "আলোক দেবতাটি কে? যিনি তোমার ঐ চক্ষুদান করলেন। অরুণদাই কি?"

পদ্মা ম্লান হইয়া যায়। "না সুপ্রিয়, তোমার অরুণদার চলার গতি বড় বেশী দ্রুত। তার সাথে চলতে পারিনি সমান তালে আমার এ সংস্কারের আর অতীতের লৌহপাদুকা পরে। তাই দূরত্ব অনেক হ'য়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই মাঝখানে। আর আজ লোহার জুতো খুলে ফেললেও, অনভ্যস্ত রক্তমাংসের পায়ে হাটতে চাইলেও প্রতিপদেই ব্যথা লাগছে। চলার পথটাও ত আজ কঠিন হ'য়ে উঠেছে কম নয়! কাজেই অত দ্রুত হাটতে পারবো কেন? আমায় আলোকদান করেছেন যিনি, তিনি আমার চির নমস্য।"

পদ্মা হাসে—মলিন হাসি। সুপ্রিয় লক্ষ্য করে পদ্মার এ ম্লান হাসি। আধ-ঠাট্টার স্বরে বলে সে, "দেখো, তোমাদের মত মানুষের কিন্তু শুধু জালে আটকে পড়াই চিরন্তনী স্বভাব। অন্ধদৃষ্টি খুলেই সামনে চোখ পড়ে দৃষ্টিদাতাকে, পৃথিবীর আলোক নয়। তার ফলে দৃষ্টি পেয়ে আলো দেখে না তারা, দেখে শুধু আলোকদাতাকে। তারপর শুরু হয় শুধু সেই দেবতারই পূজা। আলোর যাত্রা আর হয় না।

পদ্মা চুপ হইয়া যায়। মনে মনে ভাবে, সত্যিই ত তাই। চিরকাল সে ত শুধু ব্যক্তিরই পূজা করিয়া আসিয়াছে। প্রখর ব্যক্তিত্বের ধূমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে বারে বারে সত্যের উপলব্ধি। আজও তাই এই বিশ্বরূপেতে হারাইয়া ফেলিতেছে সে বিশ্বের রূপকে। কিন্তু কেন এত তীব্র হয় ভ্রান্তির উন্মাদনা? বাস্তবের চেতনাকেও ছায়াময় করিয়া তোলে, এ কি নিদারুণ ব্যাধি।

সুপ্রিয় ঠাট্টার সুরে আবার বলে, "দেখ না—বুদ্ধ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ থেকে গান্ধী সুভাষ সবাইত বসেছেন দেবতার আসনে। আর কৃষ্ণের ত কথাই নেই। একেবারে শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে দিব্যি গোপলীলা করছেন।"

পদ্মা আপত্তি জানায়, "ও ভাবে বলো না সুপ্রিয়। এদের ত্যাগকে বড় বেশী খাটো করে দেখছো।"

সুপ্রিয়ের চোখ জলিয়া উঠে "ত্যাগ কৃষাণ মজুররা করছে না? তোমার চার পাশের সংগ্রামী ছেলেরা কি কম ত্যাগ স্বীকার করছে? তাদের ত পূজো তোমরা কর না। অবশ্য পূজো তারা চায়ও না। তারা চায় সফলতা। তোমাদের অবিস্মরণীয় মহাপুরুষরা গড়েন অবতার। আর এরা গড়ে সমাজ। ঘুমভাঙা মানুষেরই সমাজ। ঘুমপাড়ানী স্বর্গের দেবতা নয়। তফাৎ অনেকটা।"

পদ্মা মৌন হইয়া পড়ে। ভাবে, যুগে যুগেই বা কেন এত আত্মপ্রবঞ্চনা। সত্য চেতনাকে বারে বারে কেন হারাইয়া ফেলে বিভ্রান্ত মানুষ, অলৌকিকের মোহে।

পৃথিবীর পিপাসা মিটাইতে চায় স্বর্গের স্বাদ দিয়া। পদ্মা আবার ভাবে, জীবনের পাওনা হইতে বঞ্চিত হইলেই কি মানুষ আঁকড়াইয়া ধরে পাওয়ার উর্ধের আশ্রয়কে?

না-পাওয়ার সর্বনাশ যে কি জানে তাহা সে নিজেও। জীবনের প্রশস্ত রাজপথে চলিতে-না-পাওয়া মানুষেরাই চলে অন্ধকার অলি গলি পথে।

অরুণাভের শরীরটা অসুস্থ লাগে, মনে হয় যেন জ্বর আসিতেছে। বাড়ী ফিরিয়া শুইয়া পড়ে সে একটা চাদর গায়ে দিয়া। পদ্মা পাশের ঘরে বসিয়া বিশ্বরূপের বইখানার প্রুফ দেখিতেছে। অরুণাভকে অসময়ে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হয় সে।

"এত শীগ্‌গীর ফিরলে যে?"

"শরীরটা ভাল লাগছে না, মাথায় বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে—তাই চলে এলাম।"

পদ্মা উঠিয়া আসিয়া পাশে বসে, "মাথাটা টিপে দেই একটু—তুমি ঘুমুতে চেষ্টা কর।"

অরুণাভ ব্যস্ত হইয়া উঠে, "কিছু করতে হ'বে না। ও এমনি সেরে যাবে। তুমি যা' করছিলে কর। সেটাই দরকার বেশী। বইটা এমাসের ভিতরেই বের করা চাই।"

অরুণাভ অভ্যস্ত নয় কাহারও সেবা গ্রহণ করিতে, পদ্মার নিকট হইতেও না।

পদ্মার অভিমানী মন ব্যথিত হয়। তবু সে কখনও জানায় না অরুণাভকে তাহার আহত ক্ষতের সংবাদ। মনের কোনও দুর্বলতা প্রকাশ করিতে চায় না সে। কিন্তু আজকাল বড় বেশী করুণ হইয়া ধরা দেয় অরুণাভের এই নিঃসঙ্গ মূর্তিটি। কিছুকাল যাবৎ এক নূতন পরিবর্তন আসিয়াছে পদ্মার মনে।

সে উঠে না। প্রীতিমাখা স্নেহের হাতে কপালটা চাপিয়া ধরে। "জ্বরও ত হ'য়েছে।"

অরুণাভ বিস্মিত হয় পদ্মার এই কোমল আচরণে। দীর্ঘ অতীতের পর্দা ভেদ করিয়া এক মধুর স্মৃতির ছোঁয়া লাগে অনুভূতিতে।

পদ্মার হাতটা আরও একটু চাপিয়া ধরে সে কপালে। গভীর আবেগে যেন কোন দূর অন্তস্থল হইতে ডাকে অরুণাভ, "পদ্মা।"

পদ্মার চোখেও প্রেম ঝরে—হাতের স্পর্শে ধরা দেয় গভীর মমতা। তবু কি একটা ব্যথার ইঙ্গিত যেন রাত্রির অন্ধকারে।

দূরে কোন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে অবুঝ শিশুর ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে একটানা সুরে।

রাত্রি হইয়া আসে। অরুণাভ চিন্তিত হইয়া উঠে, "বিপাশা এখনও ফিরছে না কেন?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপাশা ঘরে ঢোকে উৎকণ্ঠা-জাগানো ত্রস্ত পায়ে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লইয়া আসিয়াছে সে—ছাত্ররা সত্যাগ্রহ করিয়া বসিয়া আছে পথে। প্রসাদও আছে সেখানে। বিপাশা বলে, "মনে হ'চ্ছে কিছু একটা ঘটবে আজ। গুলি টুলিই চলবে হয়তো। পুলিশ, সার্জেণ্টে ঘিরে আছে যে ভাবে, মনে হল তারা প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে।"

অস্পষ্ট চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে সব কয়টি মন।

অরুণাভ উঠিয়া পড়ে—জামাটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া যায়। একসঙ্গে।

পদ্মা দুয়ার বন্ধ করিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ঘুমন্ত কন্যার পাশে। অজানা স্তব্ধতা জমাট বাঁধিতে চায় বুকের ভিতরে। স্নেহ কাতর শংকায় আর উদ্বেগে আকুল হইয়া উঠে সমস্ত চিন্তাধারা।

ক্ষুদ্র শিশুটির দিকে আশীর্বাদ-কামী নিবিড় চোখে তাকাইয়া থাকে। তাহার কল্যাণময়ী চোখ দুইটির সামনে ভাসিয়া ওঠে প্রসাদের বন্ধুদের দৃঢ়তাব্যঞ্জক কচি মুখগুলি। প্রসাদের বন্ধুরা এখনও সাবালকত্বে পৌঁছায় নাই, তবু তাহাদের দৃষ্টি সাবালকত্বের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

পদ্মা বসিয়া বসিয়া ভাবে, এই শীতের রাতে ঐ কচি কচি ছেলেরা খোলা রাস্তার বুকে বসিয়া আছে হিম-ঝরা আকাশের তলায়!

জানালা দিয়া দেখা যায় দূরের স্তব্ধ আকাশ। বুকের ভিতরে এক অবুঝ আকুলতা নিঙরাইয়া উঠে। বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস বহিয়া আনিতেছে যেন কি এক শংকিত সংবাদ।

রাত গভীর। পদ্মা অধীর চিত্তে প্রতীক্ষা করে। নীচে রাস্তা দিয়া একটি ভারী জুতাপরা মানুষের পদশব্দ মিলাইয়া যায় দূরের নিস্তব্ধতায়।

গ্যাসবাতির আলোর তলায় ঘন ঘন দীর্ঘ ছায়া পড়ে আবছা কাল। পদ্মা কান পাতিয়া থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ্বরূপ ফিরিয়া আসিয়া জানায়, "অরুণাভ আজ আর ফিরতে পারবে না। বিপাশা একটা ফোন করে আস্‌ছে সামনের বাড়ী থেকে।"

গভীর চিন্তায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে পদ্মা কচি মেয়েটাকে বুকের কাছে লইয়া। প্রসাদের বন্ধুদের রৌদ্র-রুক্ষ দীপ্ত মুখগুলিই ঘুরিয়া ফিরিয়া ভাসে চোখের সামনে।

জ্যোতির্ময়, সমীর, বিপ্লব—আরও অনেকে। নামও জানে না সে সকলের।

কতদিন আসে না প্রসাদ। সেই একদিন কয়জন ছাত্রবন্ধুদের লইয়া ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ঘরে। নবাগত

ভাগ্নিটিকে দেখার সে কি সমারোহ! মিনিট কয়েক দোলনাটায় দোল দিয়া, শিস দিয়া, তুলতুলে গাল টিপিয়া অবাক চোখে দেখিল সবাই মিলিয়া ক্ষুদ্র শিশুটিকে।

তারপর পাশের ঘরে গিয়া আবার তুমুল তর্কে ডুবিয়া গেল। বন্ধু তাহারা সকলেই। তবু অ-বন্ধু হইয়া উঠিতেছে রাজনীতির মতান্তরে।

জ্যোতির্ময় কিছুতেই মানিয়া লইতে রাজী নয় কম্যুনিষ্টদের এই 'অ-বিপ্লবী' "বড় বেশী কংগ্রেসঘেঁষা", "খিচুড়িবিলান নরনারায়ণ সেবার" নীতিগুলিকে।

বিদ্রূপ করে আরও একটি ছেলে। "তোমাদের ত দৃষ্টি ঐ পশ্চিমের খোলা দুয়ারে।"

একটু সুর করিয়া ব্যঙ্গ করে সে, "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার। তাই না। পশ্চিম থেকে ধার-করা বুলি দিয়ে কতকাল আর চালাবে তোমরা।"

প্রসাদের পক্ষও মানিতে রাজী নয় এ মিথ্যা অপবাদ। সেও উত্তেজিত হইয়া জবাব দেয়, কাগজে আর কাজে মিলিয়ে দেখ, কাজের রীতি আর নীতিতে মিল বেশী কাদের। তোমাদেরও যা কিছু শুধু ঐ কাগজের গরম গরম থিসিসেই সীমাবদ্ধ।"

কি ভীষণ তর্ক করিতে পারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ ছোট ছোট ছেলেরাও—পদ্মা অবাক হইয়া দেখে। চোখে মুখে ঠিকরাইয়া পড়ে বারুদের কণা।

পদ্মা পচুকে দিয়া গরম সিঙ্গারা আনায় ঠোঙা ভর্তি। চা আনে।

"এইবার তর্কটায় একটু জিরানী পড়ুক।" হাসিয়া বলে পদ্মা।

জ্যোতির্ময় আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠে আন্তরিকতায়, "থ্রি চিয়ারস ফর্ আওয়ার লিট্‌ল কমরেড।"...

পদ্মা বসিয়া বসিয়া ভাবে—কি চমৎকার ছেলেরা সব।

বিপাশা সংবাদ লইয়া আসে—ছাত্রদের উপর গুলি চলিয়াছে। "একটি ছাত্র মারা গিয়াছে।" জানায় সে আর্দ্রকণ্ঠে। পদ্মার দৃষ্টি স্থির হইয়া যায় বেদনায় আর শ্রদ্ধায়। চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে রক্তে ভেজা সার্টের আড়ালে হিমশীতল প্রাণহীন কচি একটি নির্ভীক চেহারা। কার মায়ের দুলাল। মরণকে বরণ করিল কে এই তরুণ প্রাণ! পদ্মা যেন আর ভাবিতে পারিতেছে না—কি ঘটিতেছে এখন ঐ জনবিরল রাজপথে।

প্রসাদও ত আছে সেখানে।

ঘুমাইতে পারে না কেহই। বিনিদ্র রাত্রিশেষে নিথর স্তব্ধতা ভেদ করিয়া ভোরের আভাস দেখা দেয় আকাশে। উৎকণ্ঠিত চিত্তে পত্রিকার অপেক্ষা করে সবাই। কিছুক্ষণের ভিতরেই পত্রিকা দিয়া যায়। আহতদের নামের তালিকায়—উত্তেজিত চোখ ঘুরাইয়া আনে। পরিচিত নাম সব।

প্রসাদের সঙ্গে বহুবার আসিয়াছে তাহারা এ বাড়ীতে। বিভিন্ন দলের, বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

মতামতের অসহিষ্ণুতা যতই থাক—দলের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকুক—তবু তাহাদের আরও একটি পরিচয় আছে, তাহারা ছাত্র। মুক্তি-যুদ্ধের ঐতিহ্যের ধ্বজাধারী অগ্রদূত।

স্বাধীনতা যুগের ছাত্রদের ত্যাগ অবিস্মরণীয়। নির্ভীক তরুণ প্রাণ।

বিপাশা ও বিশ্বরূপ্ বাহির হইয়া যায়—ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটা জনসভা ডাকা হইয়াছে।

পদ্মার বাহির হওয়ার উপায় নাই—ঐ কোলের শিশুটির অর্থহীন করুণ দৃষ্টির মতই অসহায় লাগে নিজের এ বন্দী অবস্থাকে ।

প্রসাদ প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না। অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে সে, 'পরী, পরী আমার।' ঐ ক্ষুদ্র শিশুটির বুকখানিই যেন তাহার শক্তির উৎস।

স্তব্ধ হইয়া ভাবে পদ্মা সারাদিন—ছাত্রদের উপর গুলি চলিল কি অপরাধে। অন্যায়ত করে নাই তাহারা।

কি ভীষণ এ অন্যায়, কি অসহ্য এ অন্যায় শাসন। অস্থির মনে সমস্ত দিন বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকে পদ্মা। জীবনে এমন একটি দিনেরও সাক্ষাৎ মেলে নাই তাহার।

সংগ্রাম পিপাসু দিবসের বিক্ষুব্ধ চেতনায় অধীর হইয়া আছে যেন মুহূর্তগুলিও।

দূর হইতে মিছিলগামী জনতার চিৎকার ভাসিয়া আসে থাকিয়া থাকিয়া—"নেতাজী জিন্দাবাদ। আজাদহিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই।"

রৌদ্র-দীপ্ত রাজপথে সহস্র পদধ্বনি জানায় বিপ্লবের দৃঢ় ঘোষণা।

পদ্মা ভাবে, সেও ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। এ তরঙ্গায়িত জন-সমুদ্রে হারাইয়া ফেলে নিজেকে, প্রিয় অপ্রিয় সকলের মাঝে। প্রসাদ, অরুণাভ, বিপাশা, বিশ্বরূপ আরও বহু অগণিতের মাঝে মিলিয়া যায় সেও রাজপথে। দূরে বড় রাস্তা দিয়া মিছিলের পর মিছিল চলিয়াছে।

লাল, সবুজ, তেরঙ্গা পতাকার মিলিত প্রতিবাদ। লোভী দৃষ্টি ঝরে মানুষের চোখে। বিচিত্র রংয়ের পতাকাগুলির অপূর্ব মিলনে পুরাতন আবরণ খসিয়া পড়ে ইতিহাসের।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ চেতনার আত্মপ্রকাশ। সমস্ত মানুষ—কলিকাতার প্রতিটি মানুষের মনে বুঝি জাগিয়া উঠিয়াছে আজ বিপ্লব-পিপাসা।

সাত আট বছরের ছেলেরাও নামিয়া পড়িয়াছে খোলা রাস্তায়। বিদ্রোহ জানাইতে চায় তাহারাও।

"চলো, চলো দিল্লী চলো" কচিকণ্ঠে বিপ্লবের আহ্বান।

ঘন ঘন গুলির শব্দ শোনা যায়। ভয়ের লেশ নাই কোথাও। মানুষের চোখে চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। প্রতিহিংসার চাপা আগুন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে ধুমায়িত পথে ঘাটে রাজপথে গলিতে গলিতে।—

যতদূর চোখে পড়ে, তাকাইয়া দেখে পদ্মা, প্রতিটি দোকানে, গলির মোড়ে মোড়ে, বাড়ীর ছাদে-ছাদে নেতাজীর ছবি সাজান, ফুলের মালা আর পতাকার লহরী দিয়া।

পদ্মা অবাক হইয়া ভাবে, জনসাধারণের এই বিপুল শ্রদ্ধাকেও কি কম্যুনিষ্টরা লক্ষ্য করিতেছে না। সাধারণ মানুষের এই অপূর্ব সাড়াকে উপেক্ষা করিবে কি করিয়া? অন্ধ-শ্রদ্ধা বলিয়া উড়াইয়া দিবে কি ভাবে? কিন্তু আজ ত ঘরে বসিয়া নাই কেহই। প্রসাদ, অরুণাভ, বিশ্বরূপ, বিপাশা—তাহাদের সবাইত আজ এ জলস্রোতের সাথেই উন্মুক্ত রাস্তায়। গুলির মুখেই বাহির হইয়াছে তবে কেন তাহারা? বোঝে না পদ্মা। জনগণের সাথেই থাকুক তাহারা, পদ্মা প্রাণ ভরিয়াই চায় আজ ইহা। দেশের মানুষের এ জীবন-সাড়াকে হৃদয় দিয়াই গ্রহণ করুক সাম্যবাদীরাও—তাহার প্রিয়তমেরা। চির মিলন হইয়া যাক এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে।

উদ্বিগ্ন মনে বাড়ী ফেরে অরুণাভ।

"প্রসাদ আহত হ'য়েছে। কারমাইকেলে আছে সে।" জানায় পদ্মাকে চিন্তিত কণ্ঠে।

"আর কে কে আহত হ'য়েছে? প্রসাদের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে তোমার?" এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পদ্মা। বিপাশাও

ফিরিয়া আসে হাসপাতাল হইতে সংবাদ লইয়া। তাহাদের চেনাশুনা কাহারও প্রাণের ভয় নাই। তবে দুইটি ছাত্র ও একটি রিক্সাওয়ালার অবস্থা খারাপ।

পদ্মা তাকাইয়া দেখে, বড় চিন্তাক্লিষ্ট দেখাইতেছে যেন অরুণাভকে! পথ-না-পাওয়া শ্রান্ত পথিকের ম্লান অবসন্নতা তাহার চোখের গভীরে।

রাত্রিতে অরুণাভের এক সাংবাদিক বন্ধু আসে। পত্রিকার রিপোর্টার সে। সারাদিন ঘুরিয়াছে সে জনস্রোতের পিছু, ঘটনা-মুখর পিচঢালা পথে পথে, নেতাদের দ্বিতল ত্রিতল প্রাসাদে।

পদ্মা আসিয়া বলে, "এখানেই খেয়ে যান।"

"আপত্তি নেই একবিন্দুও।" বলে বন্ধুটি। খাইতে বসিয়া আলাপ হয়—রিপোর্টারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিখুঁত বর্ণনা।

বন্ধুটি মৃদু হাসিয়া বলে, "শুনে রাখ, তোমাদের কাজে লাগবে। তোমাদের কাগজেই একমাত্র এসব ছাপা হ'তে পারে। আমাদের ঘুরেই বা লাভ কি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্থান কতটুকুই বা এসব 'সো-কলড্' জাতীয়তাবাদী কাগজগুলিতে। চাকরি করি পেটের দায়ে। উপায় নেই তাই যা লেখায় লিখি। না হ'লে চাকরি থাকবে না। কিংবা হয়তো সারাদিনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে রিপোর্ট লিখি। ভোরের কাগজ খুলে অবাক হই। নিজেরই রিপোর্টের এত নির্ভুল বিকৃতি দেখে। অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শীর নাম করেই এসব ছাপা হয়—বেমালুম মিথ্যা বিকৃতিসব। আমাদেরও গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছে। পর পর কয়টা কাগজেইত চাকরি নিলাম। প্রথম প্রথম অসুবিধা হ'ত। এতটা মিথ্যাকে বরদাস্ত করে তোলা মনের

প্রাচীন নীতিজ্ঞানে আটকাতো। এখন দেখছি না করে উপায় নেই। সর্বত্রই ঐ একই দশা—দিনকে রাত, রাতকে দিন।"

পদ্মার যেন এ এক নূতন জন্মলাভ। এতকাল জানত পত্রিকায় যা লেখা হয় সবই সত্যি। পত্রিকা পড়িয়া অবাক হইয়া যায় পদ্মা। পাতায় পাতায় শুধু দলগত স্বার্থের চোখ-রাঙানি। বেদনায় আর বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া যায় সে।

প্রসাদের গুলিবিদ্ধ পা-টা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। কাঠের পা দিয়া চলাফেরা করে, সুন্দর বলিষ্ঠ যৌবনপুষ্ট একহারা ছেলেটি। পদ্মা যেন আর তাকাইতে পারে না।

অথচ পত্রিকার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে শুধু দেখিয়াছে ক্ষমতার রাজনীতি। তাহার এতকালের অন্ধ-শ্রদ্ধা অপসারিত হইয়া ভীষণভাবে ধাক্কা খায় তাহার বীরের-পূজারী মন।

এক নূতন সংশয় দেখা দিয়াছে মনে। নূতনদৃষ্টি দিয়া দেখিতে আরম্ভ করে সে আজ রাজনীতির খেলা। এ রাজনীতি জনগণের কল্যাণপ্রসূ রাজনীতি নয়। এ শুধু ক্ষমতা লোলুপ নেতৃত্বের মারামারি।

অথচ এই নেতাদের একটু দর্শন পাওয়ার জন্য উত্তপ্ত রৌদ্র মাথায় কত বিপুল আগ্রহ লইয়া হাঁটিয়াছে পদ্মা ক্রোশাধিক পথ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াছে সভামঞ্চের ধারে।…

মাত্র কয়টি দিন। কিন্তু পদ্মার মনের গঠনকেই ভীষণভাবে ঝাঁকুনি দিয়া গিয়াছে এই কয়েকটি দিন। তাহার জীবনারম্ভ হইতে সযত্নে প্রতিপালিত অন্ধ-শ্রদ্ধা, অন্ধ-বিশ্বাস, ভীরু-মমতা, সবই এক নূতন ছোঁয়া লাগা বিস্ময়ে ও সংশয়ে গুঁড়াইয়া যাইতে চায়। অজানা

বেদনার নিঃশব্দ ক্রন্দন ভাসিয়া আসে দূর মহাসুপ্তির অবগুণ্ঠন হইতে।

তবু পদ্মা আজ আর উপেক্ষা করিতে পারে না এ ঘুমভাঙা চেতনার প্রথম আলোর তীব্রতাকে।

কল্যাণী আসিয়াছে বহুদিন পর। পদ্মাকে ঠাট্টা করে, "একি তুই দেখি এক মোসলাই কাপড় পরে আছিস। কম্যুনিষ্টরা লীগকে সমর্থন করছে, সাজসজ্জায়ও তার প্রমাণ দেখাতে চাস নাকি ?"

পদ্মা উত্তর দেয়, "কেন। মুসলমানদের সাজসজ্জা কি এতই কু-দৃশ্য ?"

বিপাশা যোগ দেয়, "এত যে বিলাসিতা শিখেছ, এত সাজের বাহার, এসব কাদের কাছ থেকে শিখেছ ? বিবিদের কাছ থেকেই ত। তাদের কাছ থেকে কিছুই কি ধার করিনি আমরা। নিমন্ত্রণে এত কোরমা, কালিয়া, কোপ্তা আমদানী করলো কারা ?"

কল্যাণী বলে, "বাপরে, তোর লেকচার থামাত বিপাশা, মেনে নিলাম, সবই ঐ মিঞাদের কাছ থেকেই ধার-করা আমাদের। ওরা আসার আগে একেবারেই গেঁয়ো ভূত ছিলাম আমরা। কিন্তু পদ্মা, দোহাই—তুই এই বিদঘুটে রংয়ের শাড়িটা ছেড়ে আয় আগে।"

বিপাশা চলিয়া যায়, "চলি ভাই। একটা মিটিং আছে। না গেলেই চলবে না। তোর বাড়ীতে যাব একদিন।" পদ্মা চা তৈয়ার করে।

চা খাইতে খাইতে কল্যাণী বলে, "সেদিনের পার্কের তার কাটার খবর জানিস ত। একেবারে মুখ ডুবাল তোর কর্তারা।"

পদ্মা গম্ভীর হইয়া যায়। সে জানে, কল্যাণী মন হইতেই বিশ্বাস করিতেছে এ অপবাদ। তাহাকে বলাও বৃথা, যে এ সবই দলগত কারসাজি।

দুঃখ হয় পদ্মার এ জাতীয় মেয়েদের জন্য। কিছুই ত জানে না উহারা। সে নিজেও কি জানিত এতকাল দলগত প্রচার কতদূর জঘন্য হইতে পারে?

সরলভাবেই বিশ্বাস করে এরা, যা কিছু উঠে পত্রিকায়। সততার বুকে এ অবিশ্বাসের ছুরিকা বসানোর তীব্র যাতনা যে কি, জানে পদ্মা। একটা পাণ্ডুর ছায়া নামে তাহার মুখে।

প্রসাদের সঙ্গে দেখা হয় রূপকের হেদোতে। একলা বেঞ্চির উপর বসিয়া আছে চুপ করিয়া সে। "এখানে বসে যে।" প্রশ্ন করে প্রসাদ। তাকাইয়া দেখে, রক্তাভ চোখে তাহার তখনও লাগিয়া আছে অবসন্ন বিজড়িমা। রূপক হাসিয়া বলে, "গিয়েছিলাম শ্মশানে, স্বর্ণলতার চিতায় একটু ফুল দিয়ে এলাম।" বিস্মিত হয় প্রসাদ। বিস্ময় ভাঙে রূপকই। মদখাওয়ার কথা গোপন করে না সে। মদ যখন খায়ই, তখন আর ভালমানুষের কাছে ভালমানুষ থাকিয়া সুনাম লইতে যায় কেন?

রূপক তাহার ক্লাব হইতে বাহির হইয়া দেখে, তাহার এক বন্ধু মদের ঘোরে পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে ফুলিয়া ফুলিয়া তাহার

স্ত্রীর শোকে। রূপকের তখন মনে পড়িয়া যায় তাহারও ত বৌ মরিয়াছে। সেও তাই বন্ধুর পাশে কাঁদিতে আরম্ভ করে একই ভঙ্গিতে। খানিকক্ষণ কান্নার পর কি ভাবিয়া বন্ধুটি উঠিয়া যায় ফুল কিনিতে। তাহার বৌয়ের শ্মশানে দিতে। বন্ধুকে দেখিয়া রূপকও যায় ফুল কিনিয়া শ্মশানে। তারপর এতক্ষণে সে ফিরিয়াছে শ্মশান হইতে।

প্রসাদ বলে, "চল্লাম। কাজ আছে।" প্রসাদ হাঁটিতে আরম্ভ করে।

রূপক ডাকিয়া বলে, "প্রসাদ, একটা কথা মনে পডলো। দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে ভালই হ'ল।"

প্রসাদ বসে বেঞ্চির উপর। মদের গন্ধে গা বমি-বমি করে। রূপক বলিতে আরম্ভ করে মৃদুস্বরে, "ইলেকসন আসছেত। সাবধানে একটু চলো। আমাদের মদের আড্ডায় গুণ্ডাদের যাতায়াত আছে জানত। আমার নিজের হাতেও আছে কয়টি ভাল গুণ্ডা। তাই টাকার 'অফার' পেয়েছিলাম আমি—বেশ মোটা অঙ্কই। তোমাদের মারার জন্য আমার হাতের গুণ্ডাদের লাগিয়ে দিতে।

" 'আমি রাজী হইনি। বলে দিয়েছি—'ওসব হ'বে টবে না। মদ খাই—কিন্তু তার বেশী পাপ করতে রাজী নই। কিন্তু যা' মনে হ'চ্ছে একটু সতর্ক হ'য়েই চলো। ওরা বেশ প্রস্তুত এসব এলাকায়।"

রূপক একটা ট্যাক্সী ডাকিয়া উঠিয়া পড়ে।

"চল, তোমায়ও নামিয়ে দিয়ে যাই। একপা নিয়ে চলতে ফিরতেও অসুবিধা কম নয় তোমার।"

প্রসাদ বলে, "অভ্যেস হ'য়ে গিয়েছে এখন।" একটু করুণ দৃষ্টিতে চোখ বুলাইয়া লয় কাঠের পা-খানার উপর।

"তাছাড়া, আমাকে এখন ঘুরতে হ'বে অনেক জায়গায়।"

রূপক হাসিয়া বলে, "আচ্ছা থাক। মাতালের সঙ্গে ঘুরতে দেখলে তোমাদের দুর্নাম রটাতে ছাড়বে না লোকে। মদ খাই বলে যত না দোষ দেবে আমাকে, মদ না খেয়েও আমার সাথে এক ট্যাক্সীতে দেখলে তার চার গুণ দোষ দেবে তোমাদের।"

ট্যাক্সীটা চলিয়া যায়। প্রসাদ ভাবে, সবই বোঝে তবু মদ খায় কেন?

অরুণাভের সঙ্গে দেখা হয় বাস ষ্টপের ধারে।

অরুণাভ শোনে প্রসাদের মুখে সব।

"এত নূতন কথা নয়। গুণ্ডা যে লাগানো হ'বে, তা জানা কথাই।" বলে অরুণাভ।

প্রসাদ আপসোস করে রূপকের জন্য, "মনটা ভাল ছিল, ঐ মদ ধরেই সর্বনাশ।"

অরুণাভ বলে, "এজন্য কমরেডরাও দায়ী কিছু। রূপক ব্যানার্জীকে দেখেছি আমরা আগেও। এতটুকু 'সিনসিয়ারীটির' অভাব ছিল না ওর মধ্যে, কাজ যখন করতো। আবার এখনও সিনসিয়ারলীই মদ ধরেছে। একবিন্দু কনফ্লিক্ট নেই মনে। অবশ্য এখনও সে কোনদিন পার্টির বিরুদ্ধে কিছু বলে না। বলে, উপকার না করি, অপকারও করবো না।"

প্রসাদ চলিয়া যায় জিলা অফিসে।

অরুণাভ বাসের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে। ট্রামে ষ্ট্রাইক চলিতেছে। অসম্ভব ভিড় বাসে।

লোকে বলাবলি করে, "দেখাল বটে ট্রাম ওয়ারকাররা।" "ট্রাম লাইনে যে মরচে ধরে উঠলো।"

কেহ আবার মন্তব্য করে," কম্যুনিষ্টরা আছে পেছনে। ট্রাম-ইউনিয়নত তাদেরই হাতে।"

অরুণাভ শোনে খুশি মনে।

প্রসাদ দুঃসংবাদ লইয়া আসে, সূর্য মারা গিয়াছে হাসপাতালে ঘণ্টাখানিক আগে। রসিদ আলি দিবসের তৃতীয় দিনে গুলিতে আহত হইয়া হাসপাতালে গিয়াছিল সূর্য।

পদ্মার রক্ত চলা যেন থামিয়া যায় এ সংবাদে। একটা প্রশ্নও আর জিজ্ঞাসা করিতে পারে না সে।

সূর্য—তাহাদের সেই রূপসীগ্রামের সূর্য মরিয়া গেল! জনাকীর্ণ রাজধানীর হাসপাতালে, গুলিবিদ্ধ আহতদের মাঝে মৃত্যু হইল আজ রূপসী স্কুলের সেই মালির! আশ্চর্য এ অদৃশ্য শক্তির চক্রান্ত।

তৃণ-সবুজ, বনবনানী ঘেরা স্নিগ্ধ শান্ত গ্রামের গৃহস্থ সন্তান সূর্য, কি দুর্নিবার শক্তির আকর্ষণে এ জঙ্গীবাহিনীর হাতে মরণকে বরণ করিয়া লইল!

বিক্ষুব্ধ উদ্বেলিত জনতার মাঝে, প্রতিহিংসাকাতর রাজপথে নামিয়া আসিয়াছিল সূর্য—ফুলবাগিচায় রক্ত-জবার চারায় নিড়ান দেওয়া সেই সূর্য।

পদ্মার চোখের সামনে ভাসিয়া যায় অ-কুটিল অতীতের দূর

ছবিগুলি। একটা ঝুমকো লতার ফুলের জন্য কত খোসামুদ করিয়াছে সে তাহাকে।

ঘর্মসিক্ত মসৃণ তামাটে রংয়ের বলিষ্ঠ একটি সুপুরুষ মূর্তির আড়ালে, পদ্মার স্তব্ধ দৃষ্টির গভীর হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায় মলিন-বসনা, অনবগুণ্ঠিতা একটি রোদনময়ী রমণী মূর্তি—যমুনা।

তাহার খেলার সাথী সেই উদ্ধত যমুনা। তাহার আশাপুষ্ট মন এ নিদারুণ সংবাদ কিভাবে গ্রহণ করিবে!

যমুনা ভালবাসিত সূর্যকে। তাহার শেষ-আশা, সূর্য দেশে ফিরিয়া যাইবে,দুর্দিন কাটিয়া গেলেই।

তাহার জীবনের সুদিন আসিবে এ পোড়ার যুদ্ধ থামিয়া গেলেই। মৃদু আশায় সিঞ্চিত নারী-মনের এ বেদনা যে কত গভীর, জানে তাহা পদ্মা। সহজাত নারী মন দিয়া আজ বুঝিতেছে যমুনার অবস্থাটা। সূর্যকে ভালবাসিবার অধিকার নাই—তবু সে ভালবাসিয়াছে। তাহার অফুরন্ত প্রেমভরা নারীমনের ঐশ্বর্যকে নিজের ভিতরে গুটাইয়া রাখিতে পারে নাই সে।

পদ্মা ভাবিতে পারে না যমুনার কথা। সূর্যের মৃত্যুতে প্রাণভরিয়া কাঁদারও অধিকার নাই যমুনার, সমব্যথী স্বজন ব্যক্তির কাছে, তাহার সমাজের কাছে। তবু সে না কাঁদিয়া পারিবে না, জানে পদ্মা।

যমুনা কাঁদিবে। নিঃশব্দ মাঠের গোধূলি অন্ধকারে বসিয়া কাঁদিবে যমুনা। কেহ জানিবে না, কেহ শুনিবে না সে নিঃশব্দ ক্রন্দন।

তবু সূর্য, যমুনার সূর্য আর গ্রামে ফিরিবে না। পদ্মার চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

অরুণাভ কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। পদ্মার মাথায় মৃদু হাত রাখে। ক্রন্দনময়ী পৃথিবী। পদ্মার এ চোখের জলে ধরা দিয়াছে যেন রোদনরতা বিরাট পৃথিবীরই তামসী মূর্তিটি।

অরুণাভও চিনিত সূর্যকে। প্রসাদের সঙ্গে দেখিয়াছে সে তাহাকে বহুবার। একসঙ্গেই ছিল তাহারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষুব্ধ জনতরঙ্গের মাঝে। শেষ-দেখা সূর্যের গুলিবিদ্ধ রক্তে-ভেজা দৃঢ় মুখখানা চোখের সামনে ভাসে। অরুণাভ চলিয়া যায় প্রসাদের সঙ্গে।

নিমতলা ঘাটে সূর্যের চিতা জ্বলিতেছে। অরুণাভ চুপ করিয়া বসিয়া দেখে জ্বলন্ত চিতার আগুন। চোখ জলে ভরিয়া উঠে। চোখের সামনে ভাসিয়া যায় বিক্ষুব্ধ কলিকাতার চেহারাটা।

"...ক্ষুধার্ত সন্ধ্যা। ট্রাম বাস ট্যাক্সী রিকসা সব একে একে থামিয়া যায়। হুকারের চিৎকারে আর্তনাদ করিয়া উঠে পথ-প্রান্তর :— ডালহৌসী স্কোয়ারে আবার ছাত্র ও জনতার উপর লাঠি, গুলি, গ্যাস। হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের একত্রিত বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ।..."

রাতের অন্ধকার বিক্ষুব্ধ চঞ্চল কলিকাতাকে আরও রোমাঞ্চময়, আরও রহস্যময় করিয়া তোলে। অলিতে গলিতে রেস্তোরাঁয়, রোয়াকে সর্বত্র আবার নভেম্বরের ইঙ্গিত জানায়।

উদ্বিগ্ন রাত্রির অবসানে আসে দিনের আভাস। কিন্তু সারারাত্রির উত্তেজনা জড়াইয়া আছে যেন ভোরের চোখেমুখে। তারপর ধীরে ধীরে লোক বাহির হয় রাস্তায়। জনতার সৃষ্টি হয়। পত্রিকাওয়ালাকে ঘিরিয়া ধরে। পত্রিকার গাড়ী লুঠ করে। এই উন্মত্ততা যেন জীবনেরই উন্মত্ততা।

রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের জিপ্ দ্রুত ছুটিয়া যায় ঘন ঘন। বেলা বাড়ে। ওয়েলিংটনে কলিকাতার লোক ভাঙিয়া পড়ে। জনতার বন্যা রাজ পথে-পথে। যেন বাঁধভাঙা প্রাণের বন্যা ছুটিয়া চলিয়াছে বিক্ষুব্ধ বাহিরের ডাকে।

পতাকার লহরী—লাল, সবুজ, তেরঙ্গা আরও বহু রকমের। সাধারণ হইয়া উঠে অসাধারণ। অপদার্থ গুণ্ডা, চোর—তাহারাও আজ অসাধারণের সীমায় পৌছায়। ডালহৌসী ঘুরিয়া লালবাজারের দিকে চলে কাতারে কাতারে জনস্রোত।

হাজার হাজার নাগরিকের চোখে অভিনন্দন ঝরে। কাঁদুনে গ্যাসের উপর জল ঢালে অবিশ্রান্ত, গবাক্ষ হইতে। তারপর আবার সন্ধ্যা নামিয়া আসে—যেন রক্তস্নাত এক অভাবনীয় সন্ধ্যা।

রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ, ভাঙা গাড়ী আর জলন্ত মিলিটারী ট্রাক। মিনিটে মিনিটে হাত বোমার আওয়াজ।

মিলিটারী লরী ছোটে বিদ্যুৎ গতিতে। তারও বেশী দ্রুত গতি হিংসায় উন্মত্ত জনতার। হতাহতের সংখ্যার হিসাব রাখা যায় না আর।

ট্রাক পুড়িতেছে চতুর্দিকে, একটি গোরা সৈন্য পড়িয়া আছে দগ্ধ অবস্থায়।

মোড় ঘুরিয়া চলে অরুণাভ। কাছেই একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে—একটা বাড়ীর বসিবার ঘরে লোক জমা হইয়াছে বিস্তর। সাংবাদিকের চোখ খোঁজে জীবন্ত সংবাদ। উঁকি মারিয়া দেখে সে—সূর্য পড়িয়া আছে।

গুলিতে আহত সূর্য। বুক কাঁপিয়া উঠে অরুণাভের। তখনও প্রাণ আছে। জামার পকেট হইতে বাহির করে একখানা রক্তরাঙ্গা 'স্বাধীনতা' কাগজ আর গ্লাস-ওয়ারকারদের ষ্ট্রাইকের আবেদন।

হাসপাতালে লইয়া আসে সূর্যকে। একবার একটু জ্ঞান হইয়াছিল। কি যেন বলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বলিতে পারে নাই। সে কথা না-বলাই রহিল মহাকালের বুকে।···

জলভরা চোখে দেখে অরুণাভ, ঊর্ধমুখী চিতার আগুনে জ্বলিতেছে সূর্যের শেষ চিহ্ন। কত অগণিত শহীদের চিতাভস্মের সাথে মিশিয়া যাইতেছে সূর্যের দেহাবশেষ।

গভীর আবেগে মনে মনে বলে অরুণাভ, "মহাকালের মানুষের পবিত্র মন্দিরে তোমার স্থান অক্ষয় হ'য়ে রইল। সবদেশের ও সকলের শ্রদ্ধেয় হ'য়ে থাকবে তুমি।"

স্থকল্যাণ মুক্তি পাইয়া দেশে যাইতেছে; পদ্মাকেও লইয়া যায় সাথে। পদ্মার আবেগ অফুরন্ত হইয়া উঠে চোখে মুখে। কতকাল পর সে ছোড়দার সাথে চলিয়াছে রূপসী গ্রামে। আবার কতকাল পরে পদ্মার উপরে!

ষ্টীমার চলে ধীরে ধীরে, চরায় আটকাইয়া যাইবার ভয় আছে। শীতের নিস্তেজ পদ্মা। স্থানে স্থানে চর পড়িয়াছে, চরের বুকে চক্রাকারে উড়িতেছে সাদা হাঁসগুলি, ঠিক একটি শ্বেত পদ্মের মালার মত। সূর্যাস্তের লাল আভা পড়িয়াছে ধান-ক্ষেতের উপর। পদ্মা তন্ময় হইয়া দেখে নদীমাতৃকাভূমির এ অপরূপ দৃশ্য।

কলাগাছের আড়ালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শণের ঘর চরের গায়ে, বহুদূরে গ্রামের সীমারেখা সেই তালগাছের সারি।

পাঁচবছর আগের সেই একই দৃশ্য।

স্থির হইয়া যায় পদ্মার দৃষ্টি। থাকিয়া থাকিয়া একটা বিষণ্ণতা ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায় ভিতরে। এই সেই গ্রাম তবু এই সেই গ্রাম নয়।

ষ্টীমার লেট্ আজ, উল্টাস্রোতে আসিতে হইতেছে। ষ্টীমারের ভিতরে অর্ধেকাংশ জুড়িয়া আছে মিলিটারী সৈন্য। দেশী, বিদেশী সবরকম সৈন্যই আছে। তিলার্ধ স্থান নাই ষ্টীমারে। যাত্রীদের কষ্টের শেষ নাই—যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে তবু।

পদ্মা বারে বারে তাকাইয়া দেখে সুকল্যাণকে, অনেকখানি রোগা হইয়া আসিয়াছে।

"বড় রোগা হ'য়ে গিয়েছ, ছোড়দা।"

"তা একটু হ'বো না।" হাসিয়া বলে সুকল্যাণ, "অত্যাচার ত আর কম জোটেনি ভাগ্যে।"

শশাংকশেখর ও আরও অনেকে আসিয়াছে ষ্টীমার ঘাটে।

পদ্মা ও সুকল্যাণ প্রণাম করে ষ্টীমার হইতে নামিয়া। কাঠের পুলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে নগেন্দ্রশেখর ও তারাসুন্দরী। কুসুমলতা কাশীতে চলিয়া গিয়াছে কিছুদিন আগে। অল্পের জন্য দেখা হইল না কল্যাণের সাথে, আপসোস করে তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরী পদ্মার মেয়েকে কোলে তুলিয়া চুমা খায়, "এ কোন আকাশের চাঁদ নেমে এল আমাদের মরা-গাঙে।"

মরা গাঙই বটে। পদ্মা তাকাইয়া দেখে। রাস্তার দুই ধারে বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালের নিষ্প্রাণ বাড়ীগুলি। বিষণ্ণ মূর্তি সর্বত্র।

সৌদামিনী ছুটিয়া আসে মাষ্টারবাবুর বাড়ীর উঠানে। সুকল্যাণকে ডাকিয়া বলে, "আস দেখি একটু কাছে দেখি ভাল কইরা; আমরা ত আশা ছাইড়াই দিছিলাম।" পদ্মাকেও ডাকিয়া মেয়ে দেখে, "আমাগো সেই পদ্মার কোলে মাইয়া দেইখা যাইতে পারুম এত ভাবিই নাই। আজ এই বাড়ীর উঠানে কত নাচ তামাসা হওনের কথা। কে কয়বো, কেউ কি আর বাইচা আছে।" চোখের পাতা ভিজিয়া উঠে

বৃদ্ধার। তাহার হারাধনের মুখখানা চোখের সামনে ভাসে। শেষ দেখা কঙ্কালের মত চেহারাটা।

তারাসুন্দরী ছেলেকে দেখে কাজের ফাঁকে ফাঁকে। গায়ে মাথায় হাত বুলায়। থাকিয়া থাকিয়া চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিতে চায় যেন। আবার যদি চলিয়া যাইতে হয় কল্যাণকে।

সুকল্যাণ হাসে একটু। "এত ভয় কিসের ?"

আবার চলিয়া যাইবে সুকল্যাণ কলিকাতায়। পদ্মাও যাইবে। ছাড়িয়া দিতে চা'য় না মন। সুকল্যাণ ও পদ্মাকে একসঙ্গে পাইবে এ যেন কল্পনায়ও পৌঁছায় নাই দীর্ঘকাল।

সন্ধ্যার সময় যমুনার সঙ্গে দেখা হয় পদ্মার দীঘির ঘাটলায়। কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া লয় যমুনা কাঁখে। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করে, "সুন্দর খুড়ি, প্রতাপ কাকা, ভাল আছে ? তাগো লগে দেখা হয় ! সুন্দর খুড়ির পোলা কত বড় হইছে ?"

পদ্মা উত্তর দেয় গোণা কথায়। বুকটা ভারী হইয়া উঠে, আরও কিছু জানিবার আছে নাকি যমুনার ?

মুহূর্তগুলিও যেন থামিয়া গিয়াছে যমুনার এ ভাষাহীন জিজ্ঞাসার অপেক্ষায়।

একটু চুপ থাকিয়া যমুনা জিজ্ঞাসা করে ম্লান কণ্ঠে, "সত্যিই কি প্রতাপ কাকার ভাইয়েরে গুলি কইরা মারছে। ক্যান ? কোনও অন্যায়ত করছিল না সে। খামকা-খামকাই গুলি কইরা মারলো পুলিশে ?"

কি উত্তর দিবে পদ্মা ! কি করিয়া বুঝায় সে, মানুষকে হত্যা করিবার এ অধিকার কে দিল মানুষকে।

যমুনার এ নীরব জিজ্ঞাসার উত্তর আসিবেই একদিন। কিন্তু আজ জবাব খুঁজিয়া পায় না পদ্মা। শুধু উপলব্ধি করে সর্বহারা নারী-হৃদয়ের শোকার্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসগুলি।

কোমল হাতে ধরে পদ্মা পুরান বান্ধবীর হাতখানা। যমুনা চলিয়া যায় ধীর পায়ে। হয়তো আর আসিবে না সে। কি আর জানিতে আসিবে সে পদ্মার কাছে!

অন্ধকার পথে ঝিঁ ঝি ডাকিতেছে। জোনাকী জ্বলিতেছে ঠিক আগেরই মত ছায়াময় দীঘির বুকে। সেই কাঠালী চাপা, অশোক, দেবদারু সবই আছে। তবু সূর্যত আর ফিরিবে না এ রূপসী গ্রামে।

পদ্মা দেখে, নগেন্দ্রশেখরের শেল্‌ফ্‌ ভর্তি সোভিয়েটের বই। লাল পেনসিল দিয়া দাগ কাটিয়া পড়ে নগেন্দ্রশেখর গভীর মন দিয়া সোভিয়েট সমাজের নূতন কাঠামোর কথা।

পদ্মা অবাক হইয়া শোনে, ষ্টালিনের উচ্ছসিত প্রশংসা, সেই অধ্যাত্মবাদী জ্যেঠামণির মুখে।

নগেন্দ্রশেখর বলে, "রাশিয়া মুখে বললেই হ'ল, সে জড়বাদী। রাশিয়ার লোকেরা জানেও না, তারা কত বড় ধার্মিক। ধর্ম কি শুধু মন্ত্র জপলেই হয়। বেদের বাণীকে রূপ দিতে পারেনি আমাদের দেশ, পারছে রাশিয়া। "ঈশাবাস্যমিদম সর্বম" একথা আমরা শুধু মুখেই বলি, কিন্তু কার্যত এটা পালন করছে সোভিয়েট।"

"স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন," নগেন্দ্রশেখর চশমা খুলিয়া একটি দাগান অংশ পড়িয়া শুনায় পদ্মাকে, "যতদিন পর্যন্ত এই কোটি কোটি লোক বুভুক্ষায়, ও অজ্ঞতায় দেহ ধারণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত যাহারা ইহাদেরই অর্থে শিক্ষা লাভ করিয়া,

ইহাদের উন্নতির প্রতি সামান্য মনোযোগও প্রদর্শন করে না, তাহাদের প্রত্যেককে আমি এক বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিব।"

নগেন্দ্রশেখরের কণ্ঠে বেদনার সুর ফুটিয়া উঠে। একটু চুপ থাকিয়া বলে, "একখানা বই পড়লাম সেদিন—'রাশিয়া ইজ আওয়ার জয় এ্যাণ্ড আওয়ার লিবার্টি, আওয়ার পাষ্ট এ্যাণ্ড আওয়ার ফিউচার, আওয়ার হার্ট এণ্ড সোল—এ প'ড়ে আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের যুবকেরাও আবার একদিন স্বামীজীর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলবে—"মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবর্ষ আমার প্রাণ, ভারত আমার যৌবনের উপবন, বার্দ্ধক্যের বারাণসী"—ভারতবর্ষ "আওয়ার পাষ্ট এ্যাণ্ড আওয়ার ফিউচার।"

ইলেকসন আসিতেছে। ট্রামে বাসে, পথে পথে, সর্বত্র চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে মানুষের মন—ইলেকসন আসিতেছে; তিরানব্বই ধারার অবসান হইবে এতদিনে। আবার জাতীয় মন্ত্রীদের হাতে আসিবে দেশ-কল্যাণের ভার। সুখ সুবিধা কিছু হয়তো হইবে এতদিন পরে।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টারের পর পোষ্টার—ভোটপ্রার্থীর গুণগান আঁকা।

স্লোগানের পর স্লোগান। লরী বোঝাই স্বেচ্ছাসেবকরা সংসারী, অফিস ফেরতা বাবুদের সতর্ক করিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া যায়, ভোট দানের গুরু সমস্যা সম্বন্ধে। "ভোট দিন—" "ভোট দিন"—চিৎকারে মুখরিত হয় আধ-অন্ধকার অলিগলিও।

মেয়েরাও ভোটাধিকার পাইয়াছে এইবার। মেয়ে মহলে ঘোরে স্বেচ্ছাসেবিকারা।

কংগ্রেস, লীগ, মহাসভা, তপশীল, কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট সব দলেই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, প্রতি অঞ্চলে।

ইরা, বিপাশা ঘোরে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ায় পাড়ায় অন্দর মহলে, উঠানে ও ঘরে ঘরে।

ইরা আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যায় পদ্মাকে, "একা, একা ঘুরতে ভাল লাগে না—চল একটু সাথে।"

পদ্মা যায় ইরার সঙ্গে সঙ্গে। গোলক ধাঁধাঁর মত গলির পর গলি—কোথা হইতে যে আরম্ভ, আর কোথায় শেষ বোঝা দুষ্কর। নোংরা আবর্জনার স্তূপের পাশ কাটাইয়া সন্তর্পণে হাঁটে পদ্মা। পচা চিংড়ি মাছের খোসার দুর্গন্ধে পেটে মোচর দিয়া উঠিতে চায়। তাড়াতাড়ি উঠানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে দুই জনে।

আধাবয়সী বিধবা একজন অবাক হইয়া বাহির হইয়া আসে ঘরের ভিতর হইতে। বিস্ময় ফুটিয়া উঠে চোখে, কথা বলিবার অবসর দেয় না আর এ বিষম-খাওয়া বিস্ময়।

ইরাই পরিচয় দেয় নিজেদের, জানায় কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে তাহারা। এবার ত ভোটের অধিকার পেয়েছেন আপনারাও।"

বিধবাটির কথা আসে মুখে এতক্ষণে।

"ভোট ? ভোট কাকে বলে আবার ?"

ইরা ধীরে সুস্থে বুঝায়, ভোট কাহাকে বলে।

পদ্মা হাসে মনে মনে ইরার অবস্থা দেখিয়া। মনে মনেই হিসাব করে, ভোট কাহাকে বলে হইতে ভোট কাহাকে দেবে এ বুঝাইতে কত সময় লাগিবে ইরার। "কোথায় আছি আমরা—" ভাবে পদ্মা, "আর এখনই সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—রব উঠিয়াছে—গেল গেল দেশটা, মেয়েদের স্বাধীন করিয়া দেওয়ায়—"

ইরা বুঝাইয়াই চলিতেছে।

অবিবাহিত কয়েকটি বয়স্ক মেয়েও আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায়। মনোযোগ তাহাদের যত না ইরার কথায়, তার চাইতে দ্বিগুণ মনোযোগ ইরাকে দেখায়।

হাতে ঘড়ি পরিয়াছে মেয়ে মানুষেও! প্রতিটি চোখই একবার করিয়া ঘুরিয়া যায় তাহার হাত ঘড়িটার উপর। একজন বয়স্ক মহিলা প্রশ্ন করে "সঙ্গে পুরুষ নাই কেউ?"

ইরা উত্তর দেয়, "না আমরা একাই বেড়িয়েছি।" মহিলাটি একটু সিঁথির দিকে তাকাইয়া দেখে—আর কোনও কথা বলে না।

এদিকে ইরার পুরোপুরি একঘণ্টা বুঝাইবার পর উত্তর দেয় ঘরের সধবা গৃহিণী আসিয়া, "কিন্তু, বাবু না এলে ত আমরা কিছু বলতে পারবো না।"

পদ্মা মনে মনে বলে, "হায় হতোস্মি।"

মুখে বলে, "আচ্ছা বাবুকেই জিজ্ঞেস করে রাখবেন। আমরা আবার আসবো।"

আরেকটা গলিতে ঢোকে তাহারা। একই দৃশ্য প্রতি উঠানে। উঠানের চতুর্দিক ঘিরিয়া জীর্ণ দালান। চুনকামহীন, কিংবা চল্লিশ বছর আগে চুনকামকরা ছোট ছোট আধ-অন্ধকার ঘর। ঘরের ভিতরে

জায়গার চাইতে জিনিস বেশী—পুরান আমলের ষ্টীলের ট্রাঙ্কের উপর ট্রাঙ্ক, কেরোসিন কাঠের তক্তাপোষের উপর স্তূপীকৃত মলিন শয্যা। কোন কোন ঘরে একটা ময়লা চটের পুরু পর্দা দিয়া পৃথক করা—নববধূর সাথে মধুরাত্রি যাপনের ঐকান্তিক ব্যবস্থা।

দড়ির উপর ঝুলান ছেঁড়া, ধুতি, সার্ট, ময়লা লুকাইয়া রাখার জন্য রঞ্জন সাবানে রং-করা রঙ্গিন শাড়ি, ছোট ছোট ফ্রক, জাঙ্গিয়া।

কুলুঙ্গীতে নারিকেলের সুবাস তেল, সিন্দুরের কৌটা, ফিতাকাঁটা চিরুণী। দারিদ্র্য যতই থাকুক, একটু প্রসাধন না করিয়া পারে না মেয়েরা।

কোণায় মাটির হাঁড়িতে সপ্তাহের রেশন। তাকের উপরে তেল-সিঁদুরে লেপা লক্ষ্মীর ছবি, কড়ি, শঙ্খ, তেলের প্রদীপ।

মনে মনেই হাসে পদ্মা, এমন শ্রীহীনতায়ও হাঁপাইয়া উঠেন না লক্ষ্মীদেবী! যুগের হাওয়া বুঝিয়া চলিতে জানেন বুঝি দেবতারাও! তাই ভাঙা ঘরেই বাঁধা পড়িয়াছেন তিনি আপন মহিমায়।

লক্ষ্মীহীন ঘর একখানাও চোখে পড়িল না পদ্মার। কিন্তু দেবতারা হাঁপাইয়া না উঠিলেও, পদ্মার মন হাঁপাইয়া উঠে—ভারতের সম্পদ, শ্রী—সীতাসাবিত্রীর দেশ এইত? এইত আমাদের অহংকার।

পদ্মা স্থির দৃষ্টিতে দেখে ঘরের বাসিন্দাদের। আদরও একটু করে ঘিরিয়া দাঁড়ান উলঙ্গ শিশুদের। কিন্তু মনের তলায় কাতার দিয়া চলিয়াছে অনন্ত প্রশ্ন।

বিকেলের দিকে যায় আবার তাহারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলাকায়। পদ্মাকে ছাড়ে না ইরা, "এসব কাজও একটু শেখ।" অগত্যা যায় সেও। তেলসিঁদুরে লেপা লক্ষ্মীদেবীকে জোর করিয়া আটকাইয়া না ফেলিলেও

শ্রী আছে ঘরে ঘরে। প্রাচুর্য না থাকিলেও পরিচ্ছন্নতা আছে। দৃষ্টির রুচিবোধও ফুটিয়া উঠিয়াছে কোন কোন গৃহে।

সকালের মত বিব্রত বোধ করে না পদ্মা নিজেদের পরিচ্ছন্ন বেশভূষা লইয়া।

আপ্যায়ন করিয়া বসায়, চলিয়া আসার সময় অকুণ্ঠিত নমস্কার জানায়। পরিচিত বাড়ীতে চা-ও খাওয়ায়! পদ্মা এ বেলায় একটু নিশ্চিন্ত হয়, না, ভারতবর্ষ ভোলে নাই এখনও আতিথ্যের মর্যাদা।

কিন্তু ইরার সমস্যা কাটে না। সেই একই উত্তর প্রফেসারের পত্নীর কাছেও আশা করে নাই সে।

রেবা তার নূতন সাজান বসিবার ঘরে শেলফের উপর স্বামীর প্রগতি-সাহিত্যগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে জবাব দেয় "কিন্তু উনি না এলেত বলতে পারব না কাকে ভোট দেওয়া হ'বে।"

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া আসে। পিচ ঢালা রাস্তার দুপাশে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে বসন্তের লাল আর্শীবাদ ঝরিয়া পড়িতেছে, আমেজ-মাখান দখিন হাওয়া বহিয়া আসিতেছে দূর সমুদ্র হইতে। রাস্তার ধারে একটা মন্দিরে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইয়াছে। মন্দিরের শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে স্তরে স্তরে ভক্তবৃন্দের দেবানুভূতি!

অজ্ঞানতার তমসায় ঢাকা থাক গৃহগুলি—তবু দেবতার মন্দিরে মন্দিরে জ্বলিতেছে শত সহস্র দীপশিখা, জ্বলিবে আরও বহুকাল। পরমব্রহ্মের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত মন্দির-চূড়া। অনন্ত জিজ্ঞাসা-ভরা মানব ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়া যাক্ এ জ্যোতি দেবতার বেদীতলে—।

অর্বুদ কোটি গৃহ থাকুক অন্ধকার, চির অন্ধকারে—ক্ষতি নাই।

কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে খোল করতালের তালে তালে। এইত ভারতবর্ষ। পদ্মার মন আজ বিরূপ হইয়া উঠে। সূক্ষ্ম শ্লেষ উঁকি মারিয়া যায় মনের অন্তরালে।

পদ্মা তাকায় আবার সম্মুখে, রাজপথে। একটা যাত্রী-বোঝাই ট্রাম চলিয়া যায়—বিদ্যুতে বিদ্যুতে চমক লাগাইয়া। ভিতরে ভোট-প্রার্থী স্বেচ্ছাসেবকের কণ্ঠনালী চিড়িয়া-যাঁওয়া চিৎকার—ভোট দিন।

ইরা ও বিপাশার ঘোরার আর বিরাম নাই। তবু শ্রান্তি নাই। এই ভোটের উপরই নির্ভর করিতেছে তাহাদের ভাগ্য। অ-দূরে পৃথিবীতে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে আবার এক ভয়ংকর দানব। তাহার কুদৃশ্য কেশরাশি দেখা যাইতেছে মাটির তলা হইতে। এখনই তীক্ষ্ণ অসি বসাইয়া দিতে হইবে ঐ ভীষণ দর্শন মস্তকে।

ভিতর হইতে কে যেন সতর্ক করে বারে বারে—"চলো, চলো, দ্রুত চলো।"

কপালে ঘাম ঝরে, তেষ্টায় গলা শুকাইয়া আসে, বারে বারে। উত্তপ্ত পিচে পায়ের চটি গরম হইয়া উঠে—রাস্তার লোকের গালাগালিও কানে আসে—তবু অক্ষতই বাড়ী ফেরে তাহারা। কিন্তু সমীর, কল্যাণ, বিপ্লব—মার খাইয়া আসে গ্লাস-ফ্যাক্টরী হইতে। কল্যাণের কপাল ফাটিয়া গিয়াছে—পদ্মা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেয় নিজহাতে। আয়োডিনে জ্বলিয়া উঠে ক্ষত, কিন্তু তারও বেশী জ্বলিয়া উঠে মনের ক্ষত।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াই তারা আবার নামিয়া পড়ে রাস্তায়। পদ্মা ব্যালকনিতে দাঁড়াইয়া দেখে শুভাকাঙ্খাভরা চোখে তাহাদের পথ চলা। মনে মনে ভাবে, এ সংগ্রাম জয়যুক্ত হইবে কবে?

ইলেকসনের দিন আসিয়া পড়ে। অরুণাভ পোলিং এজেণ্ট হইয়া যায়।

খদ্দর পরিহিত সৌম্যদর্শন সাংবাদিক অরুণাভকে আপ্যায়ন করিয়া বসায় পোলিং অফিসার। মৃদুগলায় আশ্বাস দেয়, "আপনার যা কিছু প্রয়োজন জানাবেন—আমরাত আছিই।"

মনে মনে স্বরূপ চিনিয়া রাখে অরুণাভ পোলিং অফিসারের; মুখে কিছু বলে না।

দারোগাবাবু আসিয়া পান খায়, সিগারেট খায় একসঙ্গে, অরুণাভকেও সাধে সিগারেট একটা। অরুণাভ ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে উহা। তারপর মৃদুস্বরে কথাবার্তা হয় দারোগাবাবুর সঙ্গে পোলিং অফিসারের। চলিয়া যায় দারোগা।

নির্দিষ্ট সময়ে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়। পোলিং অফিসার বিস্মিত হইয়া দেখে অরুণাভ আসিয়াছে কম্যুনিষ্টদের এজেণ্ট হইয়া।

হতবাক হইয়া যায় সে মুহূর্তের জন্য। তারপর ধীরে ধীরে চোখে মুখে নামিয়া আসে কঠোর আক্রোষ।

দত্তগুপ্ত আবার অরুণাভকে ডাকাইয়া কৈফিয়ৎ চায়, তাহার কাগজে কেন কংগ্রেসবিরোধী রিপোর্ট ছাপান হইয়াছে।

অরুণাভ উত্তর দেয়, কংগ্রেসবিরোধী হ'তে পারে—কিন্তু রিপোর্ট যা ছাপা হ'য়েছে, সম্পূর্ণ সত্য।

মিঃ গুপ্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে একটু—"সত্য-মিথ্যা বুঝি না। আমাদের কাগজের নীতি অনুসারেই সংবাদ ছাপান হয়, এই আমি চাই।"—ব্যস্ত পদক্ষেপে চলিয়া যায় দত্তগুপ্ত। অরুণাভ চুপ করিয়া

ভাবে এর চাইতে অপমান আর কি সাংবাদিকের জীবনে। সাংবাদিক হইয়াও সত্য সংবাদ ছাপাইতে পারিবে না।

চাকরি ছাড়িয়া দিবে নাকি, ভাবে একবার; আবার ভাবে, চাকরি ছাড়িয়াই বা কি হইবে। ইহার বিরুদ্ধেই ত সংগ্রাম তাহাদের। সংগ্রাম, সংগ্রাম, চতুর্দিকে সংগ্রাম। আরেকজন সাব-এডিটার লক্ষ্য করে অরুণাভের দ্বিধাগ্রস্ত মৌনভাব। সে বলে, "কেন অনর্থক গোলমাল সৃষ্টি করেন ওসব কম্যুনিজমের কথা ছাপিয়ে।"

কিছুদিনের মধ্যেই অরুণাভকে জানান হয় তাহাকে রবিবাসরীয় সম্পাদকের পদে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। অরুণাভ বোঝে, নিউজ এডিটারের পদে আর তাহাকে রাখা চলিবে না। এখানে যে আর বেশী দিন টে'কা যাইবে না তাহাও বোঝে মনে মনে।

ইরা ও পদ্মা বাহির হইয়াছে তাহাদের কাগজের জন্য চাঁদা তুলিতে।

পথে দুইজন কমরেডের সঙ্গে দেখা হয়। ইরা পরিচয় করাইয়া দেয় পদ্মার, "আমাদের একজন সিম্প্যাথাইজার। কমরেড অরুণাভের—" চশমাপরা ভদ্রলোকটি ঠাট্টার সুরে বলে, "পদ্মাকেত চিনি আমি, কিন্তু কথা হ'চ্ছে, এখনও দরদীর চৌকাঠ ডিঙ্গাতে পারলে না, দরদ আছে প্রচুরই তবে, বুঝতে হ'চ্ছে?" পদ্মা হাসে।

কিন্তু মনটা একটু বিষণ্ণ হইয়া যায়। চলিয়া যায় ভদ্রলোক দুইটি। "মিটিং-এ যাচ্ছেন ত।" ইরা ও পদ্মা আগাইয়া যায় মহম্মদ আলি পার্কের দিকে। একটা মিছিল চলিয়াছে শ্রমিকদের। লাল ঝাণ্ডা হাতে হাতে। ছাত্ররাও চলিয়াছে পেছনে।

ইরা উৎসাহী চোখে দেখে, মৃদুস্বরে বলে, "মস্ত বড় প্রসেসন কিন্তু।"

পদ্মা চোখ বুলায় মজুরদের হাতের ফেষ্টুনগুলির উপর।

সুপ্রিয়ের সঙ্গে দেখা হয়। পদ্মা লক্ষ্য করে, ইরার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল সুপ্রিয়কে দেখিয়া। পদ্মা কি একটু আন্দাজ করে মনে মনে।

ইরার আর কথা ফুরায় না। প্রতি পনের মিনিটেই কমরেডদের সঙ্গে জরুরি কথা বলিতে যায় সে।

ওদিকে সভামঞ্চের উপর মাইক পরীক্ষা চলিয়াছে "হ্যালো-হ্যালো হ্যালো। এক দুই তিন—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।…"

ছাত্র ছাত্রীরা ফুটা বাক্সে চাঁদা তুলিতেছে রেড্ হাসপাতালের সাহায্যে।

সভা আরম্ভ হয়। মাইকে গর্জিয়া উঠে বক্তাদের ওজস্বিনী বাণী। কে একজন বক্তা বলিয়া যাইতেছেন, চেনে না পদ্মা। উত্তেজনা-পূর্ণ দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

পদ্মার আর দেরি করা চলে না। মেয়েকে খাওয়াইতে হইবে। সে উঠিয়া পড়ে।

সভামঞ্চে বক্তৃতা চলিতেছে—অগ্নিবীজ ছড়াইয়া পড়ে নীরব শ্রোতাদের মনে। পদ্মা একটু একপাশে দাঁড়াইয়া শোনে; "…রাজপথে একাধিক জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি করেও কলিকাতার বিপ্লবী যুবশক্তিকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পথ হতে ফিরানো যায় না, এটাই ঐতিহাসিক সত্য।"

পদ্মার আর দাঁড়াইবার উপায় নাই। ব্লাউজ ভিজিয়া উঠিয়াছে বুকের দুধে, ক্ষুধায় কাঁদিতেছে হয়তো মেয়েটা। পদ্মা তাড়াতাড়ি পা চালায়। দূর হইতে কানে আসে মাইকের গুরু গর্জন "অসংখ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের যে চোখ খুলছে, হীন প্রচারকের কোনও বক্তৃতাই সে চোখে ঘুম নামাতে পারবে না।…

জ্যোতির্ময় আসিয়াছে সুকল্যাণের কাছে।

প্রসাদও আছে ঘরে। সে ও সুকল্যাণ এখন একসঙ্গেই থাকে। সুকল্যাণ কিছুতেই কমিউনে থাকিতে দেয় না প্রসাদকে। বলে, "মতটা না হ'য় আলাদা, একই বাড়ীতে জন্মেছি আমরা, সেটাত ভুললে চলবে না। রূপসী গেলে তুই কি আলাদা হাঁড়ি নিয়ে বসবি ভাত ফুটাতে?" আসলে সুকল্যাণও সহিতে পারে না প্রসাদের এই কাটা-পায়ের দৃশ্য। ট্রাম-বাসভরা রাস্তায় ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলে প্রসাদ কাঠের পা লইয়া—সুকল্যাণ দেখে, আর চুপ হইয়া যায় স্নেহমাখা আতঙ্কে। ভাবে, কোন বিপদ আবার না ঘটে।

সতর্ক করিয়া দেয়, "একটু সাবধানে চলিস ফিরিস। ঘোরাঘুরিটা একটু কমালে চলে না।"

প্রসাদ বলে, "ঘোরাঘুরি কমাব কি। গ্লাসফাক্টরীর ইউনিয়নটি যেতে বসেছে। তবু শেষ চেষ্টাত দেখতে হ'বে।"

সুকল্যাণ চুপ করিয়া থাকে, সেও ত জানে, এই এক একটি ইউনিয়ন ভাঙা গড়ার ব্যথা ও আনন্দ কি ভাবে দাগ কাটে আশাপুষ্ট তরুণ মনগুলিতে। এইত দেশসেবকের জীবন, এইত তাহাদের জীবন-

রোমাঞ্চ। জ্যোতির্ময় বলে, "গ্লাসফ্যাক্টরীর ইউনিয়নকে রাখা সোজা নয়। যা কংগ্রেসভক্ত হ'য়ে উঠেছে আজকাল প্রকাশদা।" হাসে জ্যোতির্ময়।

একই পাড়ায় থাকে তাহারা। জ্যোতির্ময়ের কাকা ঐ পাড়ার কংগ্রেস সেক্রেটারী। জ্যোতির্ময় বলিয়া যায়, "ইলেকসনের আগে এসেছিলেন প্রকাশদা আমাদের বাড়ীতে কাকার কাছে।

"দুই হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন। বল্লেন, "কি আপনারা একটাকা, দুই টাকা ক'রে চাঁদা তোলেন। এ ভাবে কি আর ফাইটিং ফাণ্ড পুষ্ট হ'তে পারে।" দুই হাজার টাকার সঙ্গে মস্ত একটা ফলস্ 'চার আনার মেম্বারের' লিষ্টও ছিল আঙ্গুলের ছাপ সহ। এ সংবাদটা অবশ্য গোপন সংবাদ। কাকার মেয়ের কাছ থেকে শোনা। খুব সম্ভব কর্পোরেশনের ট্যাক্স নেওয়ার লিষ্ট থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন নামের লিষ্টটা। প্রকাশদার যাতায়াত আছে বড় বড় হোমরা-চোমরাদের আড্ডায়। প্রায়ইত দেখি বড়নেতাদের সঙ্গে এক মোটরে।

"উর্মিলাদেবীও খুব সভাসমিতি করছেন আজকাল। কংগ্রেসের ব্যাজ লাগিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করেন দেখি বস্তিতে বস্তিতে।"

সুকল্যাণ কথা বলে না। চুপ করিয়া ভাবে, "সেই পাঁচমিশালী দেশভক্তদের ভিতর হইতে ভেজাল ছাঁকিয়া লওয়াটাও সোজা নয়।

সত্যিকারের দেশভক্তরা আজ আড়াল হইয়া যাইতেছে এই মেকী দেশভক্তদের ভিড়ের তলায়।

কত আত্মত্যাগ, লাঞ্ছনা দিয়া, বুকের রক্ত দিয়া গড়িয়া তোলা জাতীয় আন্দোলনকে চতুর্দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছে মুখোশধারী কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা। গলা টিপিয়া ধরিতেছে জনগণের কল্যাণকে।

জ্যোতির্ময় আবার একটু ঠাট্টা করে প্রসাদকে, "পিসফুল ট্রান্স-ফারেন্স অফ পাওয়ার-এর নমুনা দেখছোত। তোমাদের ত রসিদ-আলি দিবস পর্যন্তও পিপলস্ ওয়ার-এর ফেজ গিয়াছে। এত বড় একটা অবিস্মরণীয় দিন গেল কোলকাতায়। কি করলে তোমরা? শান্তি প্রচার। কিসের জন্য শান্তি।"

প্রসাদ উত্তর দেয় না। রাস্তায় 'নামিয়া আসে। শান্তিবাহিনী করিয়া জনতাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেও। তবু এ সংশয় মাঝে মাঝে দৃঢ় হইয়া উঠিত তাহারও মনে—নভেম্বর দিবস আর রসিদ-আলি দিবসে ঠিক পথই লইয়াছিল কি তাহারা?

বিপাশার সঙ্গে দেখা হয় রাস্তায়। প্রসাদ অভিযোগ জানায়, ইরা সম্বন্ধে, "গত শনিবারে ইরাদি গেলেন না কেন মিটিং-এ? তাঁর ত সেখানে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কত দূর দূর থেকে মেয়েরা সব এসেছিল। অগত্যা কি আর করি। বানিয়েই বলতে হ'ল বাধ্য হ'য়ে —"জ্বর হ'য়েছে—তাই আসতে পারে নি।"

বিপাশা বলে, "হয় তো জরুরী কাজ ছিল।"

প্রসাদ একটু উষ্ণতা প্রকাশ করে, "আর ওখানে যাওয়াটা জরুরী নয়? ফাঁকি দিয়ে খাঁটি কাজ কোনদিন হয় না।"

প্রসাদ চলিয়া আসে বড় রাস্তায়। মাথার উপরে রৌদ্র-তপ্ত আকাশের মধ্যাহ্ন-উত্তাপ। ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে গায়ের সার্টটা।

রাস্তার মোড়ের একটা বড় বাড়ী হইতে রেডিওর খবর ভাসিয়া আসিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের দাম্ভিক ঘোষণা। রাস্তায় চলিতে চলিতে প্রসাদের কানে আসে স্পষ্ট উচ্চারিত দিনের সংবাদ। সংবাদত নয়, যেন রক্তপিপাসু এক সেনাবাহিনীর লালসা-

উন্মত্ত পদধ্বনিই ভাসিয়া আসিতেছে এ শব্দগম্ভীর বায়ু তরঙ্গে তরঙ্গে।

কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছে সুপ্রিয়, ইরার ব্যবহারটা যেন একটু বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে। প্রায়ই আসে ইরা তাহার খোঁজে এ কাজ সে কাজ লইয়া। সুপ্রিয় হিসাব করিয়া দেখে, তাহার মধ্যে অ-কাজেই বেশী।

অহেতুক বসিয়া থাকে কিছুক্ষণ, একটু গল্প জমাইতে চায়। সুপ্রিয়ও কথা বলিতে জানে, সেও কথা বলিয়া যায়—কাজের, অকাজের বহু কথাই।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে একটু অস্বস্তি বোধ করে। অপ্রত্যাশিত গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে চাহে প্রতিমুহূর্তে ইরার কথার রহস্যে, ধরা দিতে চায় যেন মনের অশান্ত চপলতাগুলি। সুপ্রিয় লক্ষ্য করে।

ইরা আসিয়াছে অনেকক্ষণ। আধা-অন্যমনস্ক ভাবে পত্রিকাটা উল্টাইতে উল্টাইতে বলে সে, "একটা ভাল ছবি এসেছে, দেখবে নাকি?"

সুপ্রিয় রাজী হয়। একটু যেন উজ্জ্বল দেখায় ইরাকে, তাহাও লক্ষ্য করে সে। আবার একটা অস্বস্তিকর ছায়া ফেলিয়া যায় তাহার মনের পর্দায়। তবু সার্টটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া যায়।

সিনেমা দেখিয়া ফেরার পথে বৃষ্টি নামে। সুপ্রিয় বলে, "বৃষ্টিটা থামুক। ততক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভেজার চাইতে আমার ওখানেই

অপেক্ষা করে যাও।" ইরার চোখদুটি অনাবশ্যক আনন্দে ছলকিয়া উঠে। ঘরে গিয়া বলে সুপ্রিয়, "বোস, চা আনাই।"

ইজিচেয়ারটায় আরামে দেহ এলাইয়া দেয় ইরা। কথা বলে না আর।

সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে, "কি, অত চুপ হ'য়ে গেলে কেন ?"

ইরা উত্তর দেয়। আশা-মধুর কণ্ঠস্বর।

"একটা কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা সুপ্রিয়, তুমি আমায় বোনের মতই দেখছো ত।"

সুপ্রিয় বিস্মিত হয় না এ প্রশ্নে, তবু একটু স্তম্ভিত হইয়া যায়। চা রাখিয়া যায় হোষ্টেলের ছোকরা চাকরটি। ইরা চা ঢালিতে থাকে।

সুপ্রিয় জানে, কি শুনিতে চাহিতেছে ইরা। তবু উত্তর দেয় —নির্লিপ্ত সুরেই, "বোনের মত না, তবে দিদির মত দেখি তোমাকে।"

সুপ্রিয় তাকাইয়া দেখে, ইরার মুখখানা এক মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া উঠে। তবু জোর করিয়াই মুখে হাসি টানিয়া বলে, "আমায় বুড়ি করে ফেলতে চাও নাকি এরই মধ্যে ?"

চা ঢালিতেছে সে দুইটি পেয়ালায়—মধুর পরিবেশন শুষ্ক হইয়া উঠে এক অপমানের ব্যথায়।

সুপ্রিয় জবাব দেয় না ইরার কথার। একটু মায়াও হয়। এতটা রূঢ় না হইলেও পারিত। কিন্তু অসুবিধাজনক মনোভাবকে সহজ করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না সে। বড় গ্লানিকর লাগে।

ইরা চা খাইয়া চলিয়া যায়। ভিতরে তাহার কি বহ্নি জ্বলিতেছে জানে সুপ্রিয়ও। তবু এ ছাড়া উপায় ছিল না তাহার।

মনটা বিশ্রি হইয়া থাকে। আবার বাহির হইয়া পড়ে সে রাস্তায়। মনে মনে ভাবে, অবাঞ্ছিত প্রেমকে গ্রহণ করাও যেমন সোজা নয়, উহা প্রত্যাখ্যান করাও তেমনি সহজ নয়। ভাবে একটু ইরার কথাই। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে উহারা, স্বজনের সীমানা হইতে বহু দূরে চলিয়া আসিয়াছে। এ দুরূহ পথযাত্রায় একলা চলার ক্লান্তিতে অবসাদ আসাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই হয়তো সঙ্গী খোঁজে —হয়তো জীবন ভরিয়াই খুঁজিবে। হয়তো ভুলও করিবে অজস্র।

কষ্ট হয় সুপ্রিয়ের ইরার জন্য। কিন্তু নিরুপায় সে।

সিন্ধুবালার ছেলের আবার মাঝরাত্রি হইতে ধুম জ্বর আসিয়াছে। ভোরবেলা ছেলেকে কাঁথায় জড়াইয়া কোলে লইয়া বসে আসিয়া সরু বারান্দাটুকুতে। রোদ উঠিয়াছে, এক ফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে শেওলাভরা উঠানের কোণায়।

মনটা অসার হইয়া আছে সিন্ধুবালার। যেন কত দীর্ঘকালের রোগী সে নিজেই। উঃ! কি ভীষণ দিন আর রাত কাটিয়াছে কয়দিন। এখনও থাকিয়া থাকিয়া বুক কাঁপিয়া উঠে। আচমকা, দূর হইতে যেন কানে আসে মাঝে মাঝে এখনও সেই ভয়ংকর বীভৎস চিৎকার— আল্লা হো আকবর; লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—জয় হিন্দ, জয় মা কালী। দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। উঃ সে কি আগুন। আকাশ-ছোঁওয়া রক্ত-

বর্ণ আগুন সব। চোখের উপরেই পুড়িয়া কয়লা হইয়া গেল পর পর কয়টা খোলার ঘর। ছোট ছোট ছেলেপুলে, আর মেয়ে মানুষের চোখে সে কি ত্রাস, সে কি আতংক।

ঝিলিক দিয়া উঠে শরীরে এখনও ভাবিতে। তাহাদের এই ভুতুরে অন্ধকার বস্তির ছোট্ট উঠানটুকুতে আসিয়া ভিড় করে সবাই—কোলে কাঁখে ছেলেপুলে লইয়া।

সিন্ধুবালাও ছেলেকে বুকে চাপিয়া পরিত্রাহি ডাকিতে আরম্ভ করে, "মা মনসা রক্ষা কর—রক্ষা কর মা মনসা"···পা কাঁপে থর থর করিয়া। দেওয়ালের একটা ভাঙা ফুটা দিয়া দেখিয়াছিল—উঃ সে কি দৃশ্য। রক্তগঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে রাস্তায়। ধারাল চকচকে ছোরা হাতে, লাঠি সরকি হাতে ভীষণ মানুষের কি ত্রস্ত ছুটাছুটি।—এখনও ভুলিতে পারে না সে দৃশ্য—গা-কাঁটা-দেওয়া দৃশ্য।······

সিন্ধুবালা ছেলের কপালে হাত দিয়া দেখে বারে বারে জ্বরের উত্তাপ। আর দেখে উঠানের রোদ। রূপসীর কথা মনে পড়ে। যমুনা, ঠান্‌দিবুড়ি হয়তো জানেও না, এখানে, কলিকাতায় তাহারা কি দিন কাটাইতেছে।

সূর্যের কথাই মনে পড়ে বারে বারে। ছেলেটাকে বড় ভালবাসিত সে। তবু কত কটু কথাই শুনাইয়াছে তাহাকে, আজ অনুতাপ বেঁধে কাঁটার মত মনে।

সিন্ধুবালার সুখস্বপ্ন ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বপ্নরাজ্য মিলাইয়া গিয়াছে হাহাকারভরা ক্ষুধার্ত বাতাসে। চতুর্দিকে ভাসে শুধু সেই অট্টহাসি—রে রে রে রে, মার মার, ধর ধর। আর ধর্ষিতা মেয়েমানুষের বুকফাটা, আকাশফাটা আর্ত চীৎকার।

রূপসীর বাড়ী গ্রাম ছাড়িয়া আসার শেষ সন্ধ্যাটি মনে পড়ে। গয়নার নৌকায় পদ্মা-পাড়ি দিয়া আসিয়াছিল কত রঙিন আশার ফুলঝুরি আঁকা মনে।

লক্ষ বিজলীর বাতিও আর চোখে চমক লাগায় না।

কমলারাও উঠিয়া গিয়াছে এখান হইতে। পরেশের চাকরি গিয়াছিল গতবারের ষ্ট্রাইকের পরই। তাহারা কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে।

প্রতাপ ওষুধ লইয়া আসে এক হাসপাতাল হইতে। বহু দূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে সে, ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে গায়ের গেঞ্জিটা। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসে সে দাওয়ায়।

সিন্ধুবালা দেখে প্রতাপকেও। কত বুড়া হইয়া গিয়াছে চেহারা এই কয় বছরে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে।

আবার রেশনের লাইনে দাঁড়াইতে হইবে—প্রতাপ উঠিয়া যায় এক গ্লাস জল খাইয়া। কয়দিনের উত্তেজনা আর রাতজাগার ক্লান্তি সব শক্তি চুষিয়া লইয়া গিয়াছে। পায়ে জোর পায় না, তবু হাঁটে রেশনের জীর্ণ থলেটি হাতে লইয়া। দূর হইতেই দেখে, গলির মোড় পর্যন্ত লাইন হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই।

প্রতাপ নিস্তেজ পায়ে গিয়া বসে লাইনের পিছনে। দিনের চাকা ঘোরে। নির্বাসনা কর্মপ্রেরণা জাগায় দিনের আলো। উপায় নাই। পেটে ক্ষুধা যখন আছে, কাজ ছাড়া উপায় নাই। শোকে আর আতংকে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে চলিবে না।

সন্ধ্যার আঁধার ছায়া ঢালে শ্রান্ত অবসন্ন নাগরিকের মনে। আসে অন্ধকার রাত্রি। আবার জ্বলিয়া উঠে ক্ষুধার্ত, বন্য চক্ষুগুলি। রক্তলোলুপ হিংস্র মানুষের কুৎসিৎ আলাপ শুরু হয় আর্ত, অন্ধকার গলিতে গলিতে।

রাত হইতে না হইতেই আবার জ্বর আসে সিন্ধুবালার ছেলের। রাত বাড়ে, জ্বরও বাড়ে—গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। চোখমুখ কেমন ঘোলাটে হইয়া উঠে। সিন্ধুবালা কাঁদিয়া উঠে, "ওগো ছেলে বুঝি যায়। তুমি শীগগীর যাও ডাক্তার বাড়ী। আমার সোনা বুঝি আমাগো ছাইড়া চললো গো।"

প্রতাপ আর সহিতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়খানা হাড়ের পাঁজরের মধ্যে বেহুঁস জ্বরের কাঁপুনি আরম্ভ হইয়াছে। প্রতাপ বাহির হইয়া যায় ওষুধের শিশি হাতে।

বড় রাস্তায় পড়িতে না পড়িতেই একটা মিলিটারী পুলিশ ধরিয়া ফেলে তাহাকে।

কাকুতি, ক্রন্দন, অনুনয় সব বৃথা। একটা টাকাও বাহির করিতে পারে না সে কাপড়ের খুঁট হইতে। আনি, দুয়ানী, আর ফুটা পয়সা শুধু। মন উঠে না পুলিশের। সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারী, বিচারাধীন আসামী প্রতাপ কম্পিত পদক্ষেপে হাঁটে থানার গারদের দিকে।

তাহার খোলার ঘরটুকুতে তখন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে তাহার একমাত্র সন্তান, "বাবা গো, ও বাবা গো।"

আবার জড়াইয়া আসে জ্বরার্ত জিহ্বা। একবার ক্ষীণ ভাবে তাকায় একটু মায়ের মুখের দিকে শিশুটি। জড়ান স্বরে আবারও বলে, "মা, বাবা কই।" "বাবা গো।" ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে।

সিন্ধুবালা আর সহিতে পারে না এ করুণ বিলাপ। দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে। কান পাতিয়া থাকে বাহিরের দিকে, পরিচিত পদশব্দের অপেক্ষায়।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠে। নিশীথিনীর দীর্ঘশ্বাস ঝরিতে আরম্ভ করে রাত্রির বুকে।

এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে সিন্ধুবালা ছেলের অচৈতন্ত ক্ষুদ্র দেহটুকুর দিকে।

কিন্তু এ কাল রাত্রি আর প্রভাত হয় না। সিন্ধুবালার একমাত্র ছেলে, তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায় রাত্রিপ্রভাত হওয়ার আগেই। দারিদ্র্য নিষ্পিষ্ট মা বাবাকে এ কঠিন স্নেহের বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া যায় সে চিরদিনের জন্য।

সিন্ধুবালা ডুকরাইয়া কাঁদে। কি করিয়া বাঁচিবে সে, কি লইয়া বাঁচিবে? প্রতাপকে কি মুখ দেখাইবে আর সে?

কিন্তু মুখ আর দেখাইতে হয় না প্রতাপকে। প্রতাপ আর ফেরেনা, ফেরে মদন।

সারারাত্রি মরা ছেলে কোলে বসিয়া থাকে সিন্ধুবালা। বছর ভরিয়া কাঁদিলেও বুঝি শেষ হইবে না মায়ের এ শোকের সমুদ্র। এই শূন্য বুকটাতে কাহাকে আর চাপিয়া ধরিবে সে।

মদন ভোর বেলা ছেলেকে রাখিয়া আসে নিমতলা ঘাটে। প্রতাপের খোঁজও করিয়া আসে। দুঃসংবাদ আনিয়া জানায় সিন্ধুবালাকে। কিন্তু সিন্ধুবালা যেন আর এ পৃথিবীরই মানুষ নাই। চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সারাদিন শূন্য ঘরে। জলটুকুও স্পর্শ করাইতে পারে না প্রতিবেশী মেয়েরা।

সূর্যের দেওয়া ছেলের ছোট্ট জুতাজোড়া এখনও নূতনই আছে তাকের উপরে। ছোট ছোট জামা দুটি এখনও ঝুলান রহিয়াছে দড়িতে। সিন্ধুবালার চোখ ছাপাইয়া উঠে জলে।

এই জুতা পরিয়া কি খুশিই না হইয়াছিল ছেলে। আজ ছেলেও নাই, সূর্যও নাই। বুক চিরিয়া চিরিয়া হু হু করিয়া কান্না বাহির হইয়া আসে। কে পরিবে আর ঐ জুতা-জামা। সবই শেষ।

দিন কাটে, সপ্তাহ কাটে, মাসও কাটিয়া যায়। সিন্ধুবালা কাজকর্ম করে আবার, মদনই একটা কাজ জুটাইয়া দিয়াছে তাহাকে—ঠোঙা বানানোর কাজ।

পেটটা যখন আছে, তখন সবই সহ্য করিতে হইবে। পাথরের মত মন লইয়া চলে, ফেরে, নড়ে-চড়ে, সবই করে সুন্দরবৌ, আর দিন গোণে, কবে প্রতাপ খালাশ পাইবে।

মদন ভরসা দেয় তাহাকে।

মদন লোকটা খারাপ নয় অত, যতটা সে ভাবিয়াছিল, ভাবে সুন্দর-বৌ। মদন যত্নের ত্রুটি করে না সুন্দরবৌয়ের, আর ত্রুটি রাখে না সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে গোপন পরামর্শের। এইত সুযোগ। প্রতাপ আসিয়া পড়ার আগেই সরাইতে হইবে সুন্দরবৌকে। প্রতাপ ফিরিয়া আসিলে বলিবে, মুসলমান গুণ্ডায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তাহার বৌকে।

সিদ্ধেশ্বরের 'বাটারফ্লাই' গোঁফের তলায় পুরু ঠোঁটে হাসি ঝলকায়, ঝলসায় কামনার উলঙ্গ পিপাসা।

অন্ধকার রাত্রি! বহু উর্ধে কয়েকটা তারা দেখা যায় আকাশে। সুন্দরবৌ বসিয়া ভাবে প্রতাপের কথা, কবে ফিরিবে, আর কত দেরি? লোহার গারদের ভিতরে প্রতাপ এখন কি করিতেছে, কে জানে? আর নয় এ মরার কলিকাতা শহরে। রূপসীতে ফিরিয়া যাইবে তাহারা।

রূপসীর উঠানের ঝিঁ ঝিঁ-ডাকা শীতল সন্ধ্যার ছায়া পড়ে চোখের মণিতে।

সুন্দরবৌর চমক ভাঙে। আবার, আবার সেই বীভৎস চিৎকার। ‘রক্তের বদলে রক্ত চাই’, ‘জয় হিন্দ’, ‘জয় মা কালী’।

সমস্ত বস্তিটা কাঁপিয়া উঠে এক মুহূর্তে। পুরুষেরা ছুটিয়া বাহির হয় লাঠি বল্লম ইট্ পাটকেল লইয়া।

বৌ-ঝি-রা কাঁপে, ভয়ে আতংকে মুখ শুকাইয়া যায়। শিশুগুলি কাঁপিতে থাকে মাঁয়েদের দেখাদেখি।

সুন্দরবৌর বুকটার ভিতরে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। কাহাকে আর চাপিয়া ধরিবে সে আজ বুকে! নিজের হাত দিয়াই শক্ত করিয়া ধরে বুকটা। পা কাঁপে, শরীর কাঁপে, আবার, আবার সেই!

প্রতাপ নাই, কে বাঁচাইবে তাহাকে, কে রক্ষা করিবে? হে মা মনসা!

মদন ছুটিয়া আসে যেন কোথা হইতে একটা লাঠি হাতে—ত্রস্ত-ব্যস্ত ভীষণ চেহারা। দিশাহারা সিন্ধুবালা ভরসা পায় মদনকে দেখিয়া। বুঝি মা মনসা তাহার ডাক শুনিয়াছে।

মদন জড়িত কণ্ঠে ডাকিয়া বলে, “সুন্দরবৌ শীগ্‌গীর চইল্যা আস, এক মিনিটও দেরি না—শীগগীর, শীগগীর।”

সিন্ধুবালা এক কাপড়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় ঘর হইতে। মদনের পিছু পিছু হাঁটে কম্পিত পায়ে।

চতুর্দিকে অন্ধকার, শুধু অন্ধকার—আর বীভৎস চিৎকার—মার্ মার্ মার্।

মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে দূরে একটা গ্যাসের বাতি। আরও অনেক দূরে শোনা যায়—“আল্লাহো আকবর।”

ডরে-ভয়ে বিদ্যুৎ-কাঁপান শরীরটাকে টানিয়া লইয়া চলে সিন্ধুবালা মদনের পিছু পিছু অবশ পদক্ষেপে।

দুপুরবেলা ঘরে বসিয়া কাঁথা শেলাই করিতেছে তারাসুন্দরী। পদ্মার মেয়ের জন্য একখানা কল্কা-আঁকা বড় কাঁথা লইয়াছিল সেই কবে—সময় অভাবে আজও শেষ করিতে পারে নাই। সংসারে অভাব অনটন লাগিয়াই আছে—তার উপর দেশব্যাপী আজ এক কুরুক্ষেত্রলীলা আরম্ভ হইয়াছে—কিছুই ভাল লাগে না। কি হইবে, কি হইবে ত্রাস সর্বত্র। এদিকে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের ভিটামাটি বিক্রি করার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রশেখর কিছুতেই গ্রাম ছাড়িবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। প্রাণ থাকিতে সে দেশ ত্যাগ করিতে পারে না।

তারাসুন্দরী তাক হইতে চশমাটা পাড়িয়া আনে। চশমা ছাড়া আজ আর একগাছিও সূতা পরাইতে পারে না ছুঁচে। অথচ এককালে রাত জাগিয়া কত ক্রুশের কাজ করিয়াছে তাহারা। 'পোর্টম্যান্' ভর্তি এখনও সযত্নে তোলা আছে কত ক্রুশের খঞ্চিপোশ, খাবার ঢাকনি, ভেলভেটের উপর জরির কাজ করা জুতা। কোথায় যাইবে, কি হইবে এত কালের সযত্নে-তোলা জিনিসপত্র সব। ভগবান জানেন। একটা ঘোর অনিশ্চয়তা সম্মুখে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারাসুন্দরী। রৌদ্রে খাঁ খাঁ করে উঠানটা—তাকান যায় না। দূরে কোন বাড়ীতে ঘরের টিন খোলা হইতেছে। কেমন যেন উদাস উদাস করে প্রাণটা।

একটা কাল ছায়া পড়ে উঠানে—তারাসুন্দরী চমকিয়া তাকায় বাহিরে। একজন লুঙিপরা মুসলমান। বুকটা কাঁপিয়া উঠে। "কি চাই ?"

"ফারনিচার আছে বেচনের মত ?" প্রশ্ন করে সে নিসংকোচে।

বিরক্তির সুরে উত্তর দেয় তারাসুন্দরী, "না, আমরা কিছু বিক্রি করুম না।"

"ঐ যে ঘরটা পইড়া আছে দক্ষিণের ভিটায় ঐটার টিনগুলি বেচেন যদি, গাহেক আছে।"

তারাসুন্দরী গর্জিয়া উঠে এতক্ষণে, "তোমার ত আস্পর্দ্ধা কম না, মিঞা। যা কথাবার্তা বাইর বাড়ীতে কর্তাগো কাছে কইবা। জান না, বাড়ীর ভিতরে ঢোকার নিয়ম নাই বাইরের মানষের।"

"সব নিয়মই কি সব কালে থাকে, ঠাইরাইন ? হিন্দুরা সক্কলে ঘরবাড়ী, চেয়ার, টেবুল, থাল ঘটি বাটি বেচতাছে. দেইখ্যাই আইলাম। আপনারাও যদি বেচেন।" প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ-ঠাসা লোকটির চোখের কোণায়।

তারাসুন্দী আর উত্তর দেয় না। বোঝে সে, আজ আর উহাদের কাছে পূর্বের সম্মান আশা করা বৃথা। আজ তাহাদেরই দিন আসিয়াছে।

লোকটি চলিয়া যায়। আহত আভিজাত্যাভিমানে চুপ হইয়া বসিয়া থাকে তারাসুন্দরী। বুকের ভিতরে জমাটবাঁধা নিঃশব্দ ব্যথার চাপ। কি দিনই আসলো দেশ স্বাধীন হওয়ার আওয়াজে।

মুসলমান জোতদাররা নূতন করিয়া ঘর বানাইতেছে, ঘর সাজাইতেছে ভিটাছাড়া হিন্দুদের নিকট হইতে সস্তাদরে কেনা আসবাব পত্র দিয়া।

সৌদামিনী আসিয়া গল্প করে, "আলাবক্সর বাড়ীতে গেছিলাম পোলা ধরতে। তার চাচাত-ভাইয়ে ঘর তুলছে খাসা একখান, দেইখ্যা আইলাম। আমাগো কর্তাবাড়ীর ডাক বাংলা ঘরের মতন। তারপর কত বাহাইরা ছবি দিয়া ঘর সাজাইছে। চক্রবর্তী বাড়ীর থন নাকি কিনছে—মাছের আইশের গোলাপঝাড় একখান, মাছের দাঁতের ছবি একখান, ছবিতে কাপড় পড়ান্যা একখান। তারপর চেয়ার টেবুল কিনছে দেখলাম। এদ্দিন হিন্দুরা সব বাবু ছিল, এইবার মোল্লারা-মুন্সীরা বাবু হইয়া বইব।" হাসে সৌদামিনী। পোকায় খাওয়া কাল দাঁতগুলি চিক চিক করে অর্থহীন হাসির আড়ালে।

"চকর্তীরা কৃষ্ণনগরে যাইব ঠিক হইছে। আপনাগো পূবের ঘরের-রাও নাকি শান্তিপুরে চইল্যা যাইব শুনলাম। কাশীমুদ্দির পুতে কইল—চৌধুরীগো পূবের ঘরের আটচালাটা নাকি সেই কিনছে আটশো টাকায়।"

তারাসুন্দরী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া জবাব দেয়, "আটশো টাকা কই ? পাঁচশো টাকায় বিক্রি কইরা গেল ভাসুর পো অমন প্রকাণ্ড ঘরটা।" "তবে যে সেখের পো কইল আটশো টাকা। তাইলে বোধ করি, দালাল ব্যাটাই মারছে তিনশো টাকা।"

মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর হইতে ভাসিয়া আসে টিনের চালা খুলিয়া ফেলার ক্রমাগত একটানা হাতুড়ির শব্দ। আর মাঝে মাঝে দালালদের বিকট চীৎকার—"ফারনিচার আছে নাকি। ফারনিচার বেচবেন ?"

'ফারনিচার' কথাটি মনে বাসা বাধিয়াছে নূতন বাবু-হওয়ার স্বপ্ন দেখা জোতদারদের। জীবন ভরিয়া পৃথক আসন, পৃথক আলিসায় বসা, পৃথক হুঁকায় তামাক-খাওয়া সম্ভ্রান্ত কৃষকের ক্ষুব্ধ মর্যাদাবোধ সজাগ

হইয়া উঠিয়াছে আজ। হিন্দু 'বাবু'-দের মত তাহারাও গাড়ী বারান্দায়—চেয়ার পাতিয়া গুড়গুড়ি টানিবে। চাষীরা আসিয়া সেলাম দিয়া যাইবে তাহাদের। ভবিষ্যত পাকিস্তানের স্বপ্নের মদিরা নামিয়া আসে সুরমাপরা চোখে।

গভীর রাত্রিতে গ্রামের চৌকিদার হাঁক দিয়া যায়। হিম-ঝরা মাঠের উপর দিয়া স্তিমিত রাত্রির দীর্ঘশ্বাস বহে। নগেন্দ্রশেখর ঘুমায় নাই তখনও। ঘুম আসে না চোখে।

পূবের ঘরের টিন খোলা হইতেছে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজ করে কামলারা, এই মাসের মধ্যেই কাজ সারা চাই। পূবের ঘরের বৌ-ঝিদের শান্তিনগরে মামার বাড়ীতে পাঠান হইয়াছে, ১৫ই আগষ্টের আশংকায়। এখন গাছ-গাছালীগুলি বিক্রি করিতে পারিলেই চলিয়া যাইবে ছেলেরা সবাই। মাত্র পাঁচশো টাকায় বিক্রী করিয়া গেল অতবড় আটচালাটা! কৃষ্ণনগরে জমি কিনিতেই ত লাগিবে নগদ অন্ততঃ হাজার টাকা। ছেলেপুলে লইয়া পথেই বসিবে নাকি রমেশ?

ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। সমস্ত গ্রামই খালি হইয়া যাইতেছে চোখের উপরে। বাঁড়ুজ্যেরা চলিয়া গিয়াছে, শূন্য ভিটাগুলির দিকে তাকান যায় না।

লক্ষ্মীহীন উলঙ্গ ভিটাগুলি যেন চতুর্দিকে চলিয়া পড়িয়া আছে মূর্তিমান অভিশাপের মত।

বাংলার বুকে এমন ঘোর দুর্দিন ফণা তুলিয়া দাঁড়াইবে, এতো তাহার কল্পনায়ও স্পর্শ করে নাই কোন দিন।

চোখের উপরেই দেখিতেছে নগেন্দ্রশেখর তাহারই দেশ, সমাজ, ভাষা, নষ্ট হইতেছে। ঠিক পদ্মানদীর ভাঙনের মতই চোখের উপরে এই ভাঙন। অবিকল সেইরূপ।

নগেন্দ্রশেখর চক্ষু মুদিয়া ভাবে ভবিষ্যতের কথা—আরও ভীষণ দিন আসিতেছে সম্মুখে। ব্রিটিশের প্যাঁচে কোথায় চলিয়াছে ভারতবর্ষ, ভাবিতে স্তব্ধ হইয়া যায় মন।

উঠানের উপর দিয়া কাহার যেন পদশব্দ শোনা যায়। কোনও স্নেহের জন বাড়ী আসিল নাকি এ গভীর রাত্রিতে? সুকল্যাণ? চমকিয়া উঠে নগেন্দ্রশেখর, "কে, কে যায়?"

কুকুরগুলিও চেঁচায় কিছুক্ষণ।

কেহই কোথাও নাই। শুধু নিস্তব্ধ অন্ধকার উঠানের উপর দিয়া রাতজাগা পাখী একটা উড়িয়া যায় ডানা কাঁপাইয়া।...

সৌদামিনী সময়ে অসময়ে আসিয়া বসে মাষ্টারবাবুর বাড়ীর দাওয়ায়। গ্রামের প্রায় সবাইত চলিয়া গিয়াছে। সেই আকালের দিন হইতে গ্রাম জনশূন্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ থাক না থাক—ঘরবাড়ীগুলিত ছিল এতকাল। এইবার পাকিস্তান হওয়ায় ঘরবাড়ীও বেচিয়া যাইতেছে সকলে। ঝাড়জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নেড়ানেংটা ভিটাগুলি পড়িয়া আছে। বুকটায় মোচড় দিয়া উঠে। এতলোক দেশ ছাড়িল, কিন্তু সৌদামিনী এই ভিটার মায়া কাটাইতে পারে নাই আজও। ষাট বছর ধরিয়া গোবর দিয়া লেপা উঠান, ঘরের পিড়া! ঐ আমগাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে তাহার সন্তানদের বাপ—তাহার হারাধন, তাহার

ছেলে-বৌ সবাই। উহাদের ফেলিয়া সে যাইবে কোন দেশে। কিন্তু মনটা ভাঙিয়া তুমরাইয়া আছে। পাড়াপড়শীদের উঠানে উঠানে কত সাঁঝের তারাভরা আকাশের তলায় বসিয়া প্রাণের নিঃশব্দ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাদের সাথে তিল তিল করিয়া—তাহাদের এই বিদায়ের ব্যথায় বুড়া হাড়ও যে এমন করিয়া অবশ করিয়া দিয়া যাইবে—কোনদিন জানিত কি এই গ্রামের ধাত্রী—বুড়ী সৌদামিনী ?

খাঁ খাঁ করে গ্রামটা—আকাশে বাতাসে যেন মরাকান্নার নীরব রোল।

দেশ ভাগ হইয়া গিয়াছে গত সন্ধ্যায়—রেডিওতে খবর ছড়াইয়া পড়ে সমস্ত ভারতবর্ষে। নগেন্দ্রশেখর চুপ করিয়া শুইয়া থাকে ইজি-চেয়ারে। একটা অবসাদের ক্লান্তি ঘিরিয়া আছে মনে।

অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল! যেন তাহারই বুকের হৃদপিণ্ডটাকে দুই টুকরা করিয়া দিয়া গিয়াছে এ ঘোষণা। ভারতবর্ষ—শিবাজী, নানক, টিপুস্থলতান, লালালাজপতের ভারতবর্ষ আজ পাকিস্তান আর হিন্দুস্থানে ভাগ হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার উৎসব করিতে বলা হইয়াছে কংগ্রেস হইতে ঘরে ঘরে। কিন্তু উৎসবের সে সাড়া কই মনে।

এক শুভ সচেতন মুহূর্তে যে সঙ্গীত গাহিয়া উঠিয়াছিল উদাত্ত স্বরে—যে রাগিণী যৌবনোন্মেষ হইতে ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত

হইয়াছিল, যে সুর বনমর্মর কাঁপাইয়া গৃহছাড়া করিয়া ডাকিয়া লইয়াছিল শতসহস্র তরুণ তরুণীকে বছর ঘুরিয়া যুগান্তে মিশিয়াছে—শতাব্দীর স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে তবু ত সে গীত থামে নাই।

কিন্তু আজ এ উৎসব প্রদোষে সেই জয়যাত্রার গান, সেই মহাসঙ্গীত থামিয়া গেল কেন কোন অদৃশ্য ভীষণের ইঙ্গিতে। কি ব্যথা, কি গভীর বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে বার্ধক্যে-ক্ষীণ দুর্বল বুকের ভিতরে।

তারাসুন্দরী অবসন্ন মনে পূজার ঘরের কাজ করে।

বিকালে একটা সভা ডাকা হইয়াছে স্কুলের মাঠে। গ্রামবাসী জড়ো হয়—মেয়ে পুরুষ সবাই। নগেন্দ্রশেখর ধীরে ধীরে উঠিয়া যায় লাঠিতে ভর দিয়া সভার দিকে।

মুসলমানদের চোখে আশার রোমাঞ্চ—হিন্দুদের চোখে হতাশা আর অনিশ্চিতের কুয়াশা।

সবুজ পতাকা উড়িতেছে বাতাসে—কৃষক আর চাষীরা খুশির চোখে তাকাইয়া দেখে।

শশাঙ্কশেখর বক্তৃতা দেয়। প্রথমেই শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় শহীদের স্মরণে। আবেগ-গম্ভীর স্বরে বলে সে—"এ গ্রামের প্রথম শহীদ সূর্য—তার প্রতি আমরা অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সূর্য মরে নাই। সে আকাশের ঐ ধ্রুবতারার মতই উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে অনন্তকালের আকাশে।...

মস্তক নত করে বক্তা। সকলকে বলিয়া দেয়—ঘরে গিয়া একটি প্রদীপ যেন জ্বালায় সন্ধ্যায়—শহীদদের উদ্দেশে।

যমুনাও শোনে বক্তার কথা—স্তিমিত চোখ দুইটি জ্বল জ্বল করিয়া উঠে তাহার।

সন্ধ্যার পর নগেন্দ্রশেখর ও তারাসুন্দরী ছাদের আলিশার উপর প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়। নত হইয়া প্রণাম করে আকাশের দিকে তাকাইয়া। শহীদের প্রতি জানায় নিঃশব্দ অন্তরের শ্রদ্ধা। গভীর আবেগে মনে মনে উচ্চারণ করে নগেন্দ্রশেখর—"এ পূণ্যভূমির রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশিয়া আছে তোমাদের জয়যাত্রার গান—"জাগো জাগো।"

নগেন্দ্রশেখর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ছাদের কারনিশ ধরিয়া।

নীচে বাঁশঝাড়ের আড়ালে প্রতাপের জনহীন ভিজা উঠানের বুকে জ্বলিয়া উঠে ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ।

ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রণাম করে যমুনা বক্তৃতার কথাগুলি স্মরণ করিয়া। ঐ তারাদের মতই তাহার সূর্যও চিরকাল থাকিবে মানুষের মনে। যমুনা ভুলিতে পারে না সূর্যকে। কেহইত ভুলিতে পারিবে না তাহাকে। ভক্তিভরা চোখে তাকায় সে ঊর্ধে।

চতুর্দিকের নিস্তব্ধ ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে যমুনা তাহার সৎবোনের মা-মরা ছেলেটির গা ঘেঁষিয়া। এক তীব্রস্মৃতি, আর এই শিশু, এই ত তাহার অবলম্বন জীবনে।

সৌদামিনী মারা গিয়াছে কিছুদিন আগে।

তাহার জনশূন্য, প্রানহীন ঘরটার চালে আকাশের ম্লান জ্যোৎস্না নামিয়া আসিয়াছে। বহুদূরের বোবামাঠ ভেদ করিয়া ভাসিয়া আসে উৎসবরত মুন্সীদের জিগির ধ্বনি।

কলিকাতায় স্বাধীনতা উৎসব অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে হিন্দু-মুসলমানের মিলন আলিঙ্গনের মধুর দৃশ্যে। লাল, সবুজ ও তেরঙ্গা পতাকার ইন্দ্রধনু—অপরূপ মনোরম!

পদ্মা ও বিপাশা চলিয়াছে পাশাপাশি মেয়েদের মিছিলে গান্ধীজীর মিটিং-এ।

প্রাণের আবেগে ধ্বনি দেয়—"হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই, ভুলো মৎ ভুলো মৎ।"

রাস্তার দুই পাশে মুসলমান ভাইয়েরা গোলাপপাশে আতর ছিটাইয়া দেয় হিন্দু ভাইদের গায়ে।

খুশির অভিনন্দন চোখে চোখে।

পদ্মার শরীরে শিহরণ খেলিয়া যায় এ আতর স্পর্শে—নবদম্পতির প্রথম আলিঙ্গনের মতই রোমাঞ্চময়, পুলকিত শিহরণ। অপার্থিব-জগতের মানুষ যেন হইয়া গিয়াছে আজ সবাই। শুধু আত্মবিলুপ্ত অনুভূতি।

গলিতে গলিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও আবার সজীব হইয়া উঠে, "হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই" রবে। বিপাশা ঘুমপাড়ায় পরীকে—দোলা দিতে দিতে ছড়া টানে—"হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই ভুলো মৎ ভুলো মৎ।" বিশ্বরূপ আসিয়া বসে পাশে। তৃপ্তির প্রশান্তি নামিয়াছে চোখে। ঘুমপাড়ানি বর্গীর উৎপাতও থামিয়া গিয়াছে আজ এ মিলনের গানে।

স্নিগ্ধ পরিবেশ ঘরে, বাহিরে, চতুর্দিকে।

দীর্ঘকাল পর শান্তিতে ঘুমায় সবাই। কিন্তু সকলের মনে আশা ও সংশয় ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায় বারে বারে—"এ মিলন আর ভাঙবে না ত।"

শান্তিপ্রিয় মানুষেরা ঘুমায়। কিন্তু জাগিয়া থাকে রাতের আততায়ী। নিশীথিনীর গোপন অন্ধকারে চলে কুটিল পরামর্শ। ভয়াবহ হিংস্র চোখগুলি ঘুরিয়া বেড়ায়। বিষ ছড়ায় পথে ঘাটে—"হিন্দুর শত্রু গান্ধী—ফিরে যাও গান্ধী।"

আবার জ্বলিয়া উঠে ২রা সেপ্টেম্বর।

লজ্জা, লজ্জা, কি লজ্জা! পদ্মা ঘরের কোণে বসিয়া চোখের জল ফেলে। মুসলমান ভাইয়েদের হাতে "রাখী" বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহারা। বিশ্বাস ভঙ্গের এ গ্লানি সহিবে কোন মুখে।

পদ্মা ভাবিয়া পায় না, এ কি হইল দেশের। পেছনের দানবেরা আর কতকাল কল টিপিবে আড়াল হইতে। আর কতদিন এ দালালদের জিয়াইয়া রাখিবে তাহারা।

বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই মন ভাঙিয়া গিয়াছে। এ দাঙ্গায় সব চাইতে বড় ক্ষতিই হইয়াছে শ্রমিক আন্দোলনের। প্রসাদের শুকনো মুখখানা দেখিয়া এত কষ্ট হয়। অরুণাভ বিশ্বরূপ, বিপাশা স্বপ্রিয় সকলেরই চোখে মুখে হতাশার ছায়া। তবু জোর করিয়াই আবার কাজ শুরু করে, আবার জোড়া তালি লাগায়—ভাঙা ইউনিয়নগুলিতে।

পরী জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে চিৎকার করিয়া "পচুদা, ও পচুদা। শীগগীল বালী এসো। আল, দেলি কলে না।"

পদ্মার বুকটায় নূতন করিয়া আবার মোচড় দিয়া উঠে। পরী ভুলিতে পারে নাই পচুকে। হয়তো কাহাকেও দেখিয়া মনে পড়িয়াছে তাহার কথা।

পদ্মাও ভুলিতে পারে না পচুর এ নির্মম অভাব। তাহার চোখের সামনে সব সময়ই ভাসে পচুর চেহারাটা।

মাস দুইও হয় নাই—এরকমই এক দুপুর বেলায় পচু সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই। সে এক দিন তাহার লাট্টু খেলার সাথীদের নিকট হইতে বাড়ী ফেরার পথে দেখে, মস্ত এক লাইন দাঁড়াইয়াছে দোকানের সামনে হরলিক্সের জন্য।

পচুর খেয়াল হয়, তাহাদের পরীর জন্যও এক কৌটা হরলিক্স লইয়া গেলে বেশ হয়। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া পড়ে সেও লাইনের পেছনে। প্রায় দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকার পর পচুর পালা আসে।

কিন্তু দোকানদার বাবুটি পচুর ঠিক আগের ভদ্রলোকের হাতে শেষ শিশিটি দিয়া আপসোস করে পচুর দিকে তাকাইয়া, "খোকা, এইমাত্র ফুরিয়ে গেল। তুমি কাল এস, কাল ঠিক পাবে।"

পচুর মনটা দমিয়া যায়। কিন্তু মনে মনে জিদ চাপিয়া যায় যেমন করিয়াই হউক পরীর জন্য এক শিশি হরলিক্স জোগাড় করিবেই।

এদিকে বেলাও প্রায় শেষ। বৌদির কাছে বকুনিই খাইতে হইবে হয়তো, ধীরে ধীরে হাঁটে পচু। ছোট্ট পার্কের ধারে প্যারা-মবুলেটারে শোওয়ান রোজদেখা মেয়েটিকে দেখে মন দিয়া। শিশুটির কাণ্ড দেখিয়া আপন মনেই হাসে পচু।

"আমাদের পরীওত এরকমই সুন্দর।" মনে মনেই বলে সে।

অরুণাভ শুনিয়া তিরস্কার করে "সর্বনাশ, তুই ঐ রাস্তায় গিয়েছিলি হরলিক্স আনতে, গুণ্ডাদের ঘাঁটিতে?"

কিন্তু পরের দিনই দুপুর বেলা আবার চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়ে হরলিক্সের প্রত্যাশায়—দোকানদার বাবুর কথা ভোলে নাই সে।

পদ্মা ঘুম হইতে জাগিয়া দেখে, পচু বাড়ী নাই।

"এত নিষেধ সত্বেও আবার বেরিয়েছে। মহা ফ্যাসাদেই ফেলবে ছেলেটা।" ভাবে পদ্মা চিন্তিত মনে। কিন্তু উদ্বেগ ক্রমশঃই গাঢ় হইয়া উঠিতে থাকে, বারে বারে রাস্তার দিকে তাকায়। বহু দূরে পচুর মত দেখা যায় যেন—নীল সার্টটিই গায়ে। এই দিকেই আসিতেছে।

কিন্তু না, পচুত না। ছেলেটি একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পদ্মা আবার তাকাইয়া থাকে এক দৃষ্টিতে। যত দূরে চোখ যায়, দেখে সে রেলিং-এর উপর ঝুঁকিয়া। কত অসংখ্য লোক আসিতেছে, যাইতেছে —লম্বা বেঁটে, ধুতিপরা, সার্টপরা, খালি গা। কিন্তু সবাই রাস্তা ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। পদ্মার পা দুইটা যেন অবশ হইয়া আসে। বুকটা ভারী হইয়া উঠে নানা ধরনের কাল্পনিক চিন্তায়।

অরুণাভ বাড়ী ফিরিয়াই আবার বাহির হইয়া যায় পচুর খোঁজে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। থানায় খবর দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে বিষণ্ণ মুখে। গুণ্ডার হাতেই প্রাণ দিল নাকি পচু—ভাবিতেও কাঁপিয়া উঠে শরীর।

পদ্মা কাঁদে নীরবে। পচুর কচি মুখখানা ভাসে চোখের সামনে বারে বারে।

দড়িতে ঝুলান আধময়লা সার্ট প্যাণ্টগুলির দিকে তাকায় পদ্মা করুণ চোখে। থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে সে, যেন পচুর গলা শোনা যায়। যেন "পরী" বলিয়া ডাকিতেছে দুয়ারের সামনে।

আকুল হইয়া প্রার্থনা করে পদ্মা, বাঁচিয়াই যেন থাকে পচু। গুণ্ডার হাতে যেন প্রাণ না দিয়া থাকে এ অনাথ বালক।

সংবাদ আসে অরুণাভের পিতার মৃত্যু হইয়াছে। অরুণাভ ভাবে বৃদ্ধা ঠাকুরমার কথা। এ শোক সামলাইয়া উঠিলে হয়।

স্থির হয়—শ্রাদ্ধের কাজ করিতে দেশে যাইবে সে কয়েকদিনের জন্য। সরকার মহাশয়ের পত্র আসিয়াছে। সঙ্গে তাহারই পিতার স্বাক্ষরিত একখানা পত্র। পিতার মৃত্যুর পর এ পত্র তাহার নিকট পাঠাইবার নির্দেশ ছিল।

অরুণাভ খুলিয়া পড়ে পত্রখানা—এক নিঃশ্বাসে। সুপ্রিয়ের জীবনের ইতিহাসের দীর্ঘ কাহিনী। স্তম্ভিত হইয়া যায় সে পত্রের রহস্যভরা সংবাদে। সুপ্রিয়ের জন্মদাতা, তাহারই পিতা। আর এই সুপ্রিয়ই অরুণাভের মাতার মৃত্যুর কারণ। আশ্চর্য পরিহাস মনে হয় জীবনের।

সুপ্রিয় অবৈধ সন্তান তাহারই পিতার! স্তব্ধ হইয়া ভাবে অরুণাভ। সমস্ত দিনে একবারও বাহির হয় না, চুপ করিয়া শুইয়া থাকে।

পদ্মা বিস্মিত হয় অরুণাভের চোখ-মুখের এই ম্লান ছায়া লক্ষ্য করিয়া।

"কি হ'য়েছে তোমার, বলত।" পদ্মা পাশে আসিয়া বসে। পিতার মৃত্যু সংবাদে এত ভাঙিয়া পড়ার কথা নয় অরুণাভের, ভাবে সে।

পদ্মার হাতখানা ধরিয়া বলে অরুণাভ "তোমার কাছেও বলা যাবে না এ সংবাদ পদ্মা। কারও কাছেই নয়।' পদ্মা ভীত হইয়া উঠে মনে মনে।

অরুণাভ ভাবে, কেহই জানিবে না এ গোপন সংবাদ। সুপ্রিয়ও জানিবে না তাহার জন্ম-ইতিহাস। শুধু সে তাহার পিতার পাপের গ্লানিকে বহন করিবে পৈতৃক পাপের অংশ হিসাবে। শুধু নিজের মধ্যেই গুটাইয়া রাখিবে এ কলঙ্ক-লিপি।

অরুণাভের নামে সম্পত্তি নামজারী হইবে। সম্পত্তি বলিতে কিছুই বড় রাখিয়া যায় নাই তাহার পিতা। তবু যেটুকু আছে, তাহারই অর্দ্ধেকাংশ সুপ্রিয়ের নামে লিখিয়া দিয়া আসে সে।

বৃদ্ধ সরকার মহাশয় মৃদু আপত্তি জানায়। সুপ্রিয় ভীষণভাবে বাধা দেয় "আমাদের পরীরাণীকে বঞ্চিত করা চলবে না।"

অরুণাভ উত্তর দেয়, "তুই যদি আমার সহোদর ভাই হ'তি তবে কি আপত্তি করতিস ?"

এর উপরে আর কোনও কথা বলিতে পারে না সুপ্রিয়। কিন্তু বড় বিব্রত বোধ করে। সবাই জানে, আত্মীয় পরিজনহীন, মাতৃহীন, বালক সে, অরুণাভের পিতার আশ্রয়েই বড় হইয়াছে। দয়ায় প্রতিপালিত পরিচয়ই গ্লানিকর অভিসম্পাৎ তাহার জীবনের। তাই খুব কম সময়ই ভাবে সে, তাহার জীবনের কথা। ভাবিতে গেলেই বিপন্ন লাগে নিজেকে। তার উপর অরুণাভের এ দান তাহাদের মধুর সম্পর্ককেই বিকৃত করিয়া তুলিবে, রহস্যের কূল-না-পাওয়া আত্মীয়দের কানাকানিতে।

অরুণাভ বারে বারে অনুরোধ করে সুপ্রিয়কে তাহাদের বাড়ীতেই থাকার জন্য।

কিন্তু সুপ্রিয় দুষ্টুমিভরা হাসি দিয়া বলে পদ্মার দিকে তাকাইয়া "একটু দূরে দূরে থাকারও মাধুর্য আছে, বোঝ না কেন। এতবড় একটা মেঘদূতকাব্য, বিরহের উপর। আমি না হয় আমার তেতালার ঘরে বসেই একটু কাব্য তৈয়ার করলাম মনে মনেই।"

পদ্মা বলে "বড় বেশী পিছল পথে চলছো না কি, সুপ্রিয় ?"

সুপ্রিয় উত্তর দেয় "পথটা পিছল যদি জানাই থাকে তবে পা টিপে টিপেই চলে লোকে। তাই পা ফসকাবার ভয় থাকে না।"

পদ্মা হাসিয়া বলে, "এরই নাম পা টিপে টিপে চলা ?"

পার্কের একটা বেঞ্চিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে অরুণাভ। কাজের মধ্যে ডুবিয়া যখন থাকে, নিজেকে খুঁজিয়া পায় না সে কাজের নেশায়।

কাজের উন্মাদনায় ঘোরে সাংবাদিক মহলে ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, রাস্তায়। কিন্তু কাজ যখন শেষ হইয়া যায়, বড় নিস্তেজ অবসন্নতায় ঘিরিয়া ফেলে দেহ, মন। বড় একা বোধ করে সে নিজেকে। তাহাকে বুঝিবার মত কেহ নাই। পদ্মাও চিনিল না তাহাকে। তাহার এ কঠিন কর্মময় জীবনের পর্দা ঠেলিয়া পদ্মা কোনদিন খুঁজিয়া পাইল না তাহাকে। তাই দূরে দূরেই রহিল সে চিরদিন।

এদিকে সংবাদপত্রের মালিকদের সহিত মতান্তর-ত লাগিয়াই আছে। অরুণাভ লক্ষ্য করে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাকে আর লিখিতে দেওয়া হইতেছে না।

আর বেশীদিন টিকিয়া যে থাকিতে পারিবে মনে হয় না। অরুণাভ উঠিয়া আবার হাঁটিতে থাকে পার্কের ভিতর দিয়া। একজন পুরানো আমলের আই-বি-র ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

"কি খবর ?"

"খবর ত আপনাদেরই এখন।" হাসিয়া বলে অরুণাভ, "শুনি, আপনাদের ব্যারাকে নাকি রাবণের চিতা জ্বলছে।"

আই বির ভদ্রলোকটি হাসিয়া উত্তর দেয়, "তা'তে আপনাদের নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনাদের ফাইল ঠিকই আছে।"

রাস্তায় আসিয়া পড়ে অরুণাভ, ভদ্রলোকটি বিপরীত দিকে চলিয়া যায়।

দূর হইতে হঠাৎ চোখে পড়ে অরুণাভের, ঠিক পচুর মতই একটি ছেলে বসিয়া আছে একটা অপরিচিত বাড়ীর রোয়াকে। ঠিক পচুই।

চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে অরুণাভের, দ্রুত আগাইয়া যায় সে। কিন্তু এমন ভাবে কি ফাঁকি দিতে পারে পচু তাহাদের।

একটা প্রসেসন চলিয়াছে 'বাটা' শ্রমিকদের। অরুণাভ পাশ কাটাইয়া যায়। রাস্তাটা পার হইয়াই একমুহূর্তে দমিয়া যায় সে। পচুত না। একেবারেই আলাদা চেহারা।

কিন্তু এমন ভুল দেখিল সে! মনটা বড় খারাপ হইয়া যায়। বাড়ী ফিরিয়া আসে অবসন্ন পায়ে।

পদ্মা দেশের বাড়ীতে আসিয়াছে! এখানেই থাকিবে সে এখন, বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ীর শোকদগ্ধ মনের ক্ষতে অন্তরের মধুর প্রলেপ দরকার। এই বয়সে পুত্রশোক যে কি ভীষণ অসহনীয়, বোঝে পদ্মা।

পাঁচআনির সবাই রাঁচী চলিয়া যায়। তাহাদের মতে, নোয়াখালিতে যাহা হইয়া গেল তাহার পর আর কোনও ভরসায়ই ছেলে পুলে লইয়া পাকিস্তানে থাকা চলে না।

সুরবালার বাড়ী ছাড়িতে মন চায় নাই। স্বামীর স্মৃতিমাখা ধূলিকণা। যেদিকে তাকায় স্বামীর হাতের চিহ্ন। তাঁহারই নিজের হাতে করা ফলের বাগান, গাছ গাছড়া, বাড়ীঘর, সবই। জীবনের বাকি দিনগুলি স্বামীর স্পর্শমাখা ঘর খানিতেই কাটাইয়া যাইবে, এইটুকুই ছিল শেষ আশা। তাহাও অদৃষ্টে কুলাইল না।

প্রজারা আসিয়া বলে, "শুনতাছি, আপনারা নাকি সব বাড়ী ছাইরা যাইবেন। কিসের লেইগা আপনাগো বাপঠাকুরদার দেশ

ছাইড়া যাইবেন। আমরা আছি তবে ক্যান।" বুড়া করিম শেখ দুধ দোওয়াইতে আসে। সাদা দাড়ির ভিতর হইতে ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠে, "কর্তামা, এইসব কি শুনি। আপনারা নাকি চইল্যা যাইবেন?"

সুরবালা বলে, "যামুনা, আর করুম কি। তোমাগো রাজ্য হইব, তোমরা কি আমাগো থাকতে দিবা। নোয়াখালির কাণ্ড শোন নাই বুড়া। তখন ত আইবা এই কর্তাগো গলায়ই আগে ছুরি বসাইতে।"

"বুড়াকর্তার আমল থেইকা আমি এই আপনাগো বাড়ীতে দুধ দোওয়াইতেছি। কোনদিন দেখছেন, এতটুকু বেয়াদপি।"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠে এ মিথ্যা অপবাদে।

তিনআনিতে আসিয়া আবার দুঃখ করে সে। দাড়ি পাকিয়া গিয়াছে, তবু এতখানি বয়সের মধ্যে এ অপবাদ কেহ দিতে পারে নাই তাহাকে। মনটা ভারি হইয়া থাকে সারাদিন।

পূব পাড়ের মুসলমান মেয়েরা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে খামার বাড়ীতে। ব্যথিত চিত্তে দেখে তাহারা, সত্যি যাওয়ার জন্য গোছান শুরু করিয়াছে কর্ত্রীরা।

"কোনঠে যাইবেন। আর আইবেন না?"

আর ফিরিয়া আসিবে না শিশু বয়স হইতে রোজ সকাল সন্ধ্যায় দেখা এই খামার বাড়ীর বৌ, ঝি, কর্ত্রীরা—ভাবিতেও ছায়া ঘনাইয়া আসে চোখের পাতায়।

কমলা ঠাট্টার সুরে বলে, "ফিরুম না ক্যান, নায়র যাইতেছি বাপের বাড়ীতে।"

করিমের বৌ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়ায় গালে হাত দিয়া তিনআনির উঠানে।

"কর্ত্রীমা কই, বৌ কই ?"

বুড়া কর্ত্রী ঘর হইতে বাহির হয়।

"আপনাগোও নায়র যাওন হইবেন ? পাঁচ আনিরা যাইছেন। চারি আনিও নায়র যাইছেন। আপনাগো বৌ ও যাইব ?"

বুড়া কর্ত্রী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, "আর না গিয়া করবো কি ! তোমরা কি আর আমাগো থাকতে দিবা ?"

"ক্যান কি দোষ করছি, মা আমরা। আপনারা চইলা গেলে কি ভাল ঠেকে। কেমন খালি খালি লাগে। আমরা ঘুইরা ফিইরা আহি বৌ ঝি গো লগে কথা কই। সব চইলা গেলে ভাল লাগে না।"

বুড়াকর্ত্রী কি আর বোঝে না তাহা। এ কি আর ভাল লাগিতে পারে ? জাত আলাদা, ধর্ম আলাদা, আচার পদ্ধতি আলাদা, তবু তাহাদের সঙ্গেই জন্মিয়াছে অন্তরের সব চাইতে বড় যোগসূত্র।

উহারাইত তাহার শ্বশুর, দাদাশ্বশুরের আমল হইতে প্রতিবেশী। অন্তরে অন্তরে যে বন্ধন জন্মিয়াছে বাপঠাকুরদার আমল হইতে সে বন্ধন আজ এই দেশের ভাগবাটোয়ারার দপ্তরে বসিয়া এক টানে ছিঁড়িয়া ফেলা সোজা নয়। এ বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে টান পড়িয়াছে, হৃৎপিণ্ডেরই শিরায় শিরায়।

করিমের বৌ তাহার প্রথম বধূজীবনে মস্ত ঘোমটা টানিয়া শাশুড়ীর পিছনে পিছনে বৌ দেখিতে আসিত খামার বাড়ীতে, রূপার মল পায়ে দিয়া। তাহার "বাউঠি" পরা হাতে ঘোমটা ফাঁক করিয়া আয়ত চোখে দেখিয়া যাইত 'আঁতুর'ঘরের দুয়ারে বসা ধাইয়ের কোলে খামার বাড়ীর নবজাত শিশুদের। তারপর ধীরে ধীরে সেই নথনাড়া মসৃণ কপোল দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে লোলচর্মের

আড়ালে। বার্দ্ধক্যের ছাপ আজ সর্বাঙ্গে। তবু এই প্রতিবেশী উঠানগুলির আকর্ষণ আজও টানিয়া আনে তাহাকে সময়ে অসময়ে।

রূপার 'আধুলি' গলায় নীলশাড়িপরা ছোট ছোট মেয়েরা অবাক চোখে ঘিরিয়া দাঁড়ায় দালানের সিঁড়িতে।

তাহাদের সুরমাপরা নির্বাক চোখে ধরা: দেয় সেই একই কথা—"ওনরা চইলা যাইবেন সব বাড়ী ছাইড়া ?"

গ্রামের মানুষের রূপকথার এ দীর্ঘ কাহিনী কলিকাতার মানুষেরা জানে কি ?

শিশু সন্তানকে মায়ের কোল হইতে টানিয়া উপমাতার কোলে সঁপিয়া দেওয়ার মতই নিদারুণ দুঃসহ এই ভিটা-ছাড়ার ব্যথা। এ ব্যথা কি শুধু মা-হারা সন্তানের বুকেই আছড়াইয়া কাঁদে বিনাইয়া বিনাইয়া ? মায়ের বুকেও জমিয়া থাকে কত অথৈ ব্যথার সমুদ্র। কথায় বুঝাইতে পারে না এ কি গভীর বেদনা।

পাকিস্তান পাইয়াছে তাহারা। তাহাদের এত কালের স্বপ্নকথা—পাকিস্তানের অর্থ যে এই, ইহাত জানিত না তাহারাও।

সুখে, দুঃখে, শোকে তাপে, আমোদে-আহ্লাদের মাঝে তিল তিল করিয়া, যুগ যুগ ধরিয়া মনের আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল যাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই মাঝে আজ এ কি বিরাট ব্যবধান হঠাৎ নাড়া দিয়া উঠিল ?

বাগ্দী, নম, মুসলমান মেয়েরা একসঙ্গে পাট টানে—খালপাড় হইতে 'খাতাঘরে' টানিয়া লইয়া যায় পাটের বোঝা।

পথে চলিতে চলিতে পরাণ বাগ্দীর মেয়ে দুঃখ করিয়া বলে হালিমার ফুপুকে, "দেশ ছাইড়ে চইল্যে যাইতে হ'বে। তোরাত আমাগো থাকতে দিবি না।"

হালিমার 'চাচার' কানে যায় সে কথা। উহাদের পেছনেই চলিতেছে সেও পাটের বোঝা লইয়া। উত্তর দেয় সেই "ক্যান দেশ ছাইড়া যাবি তোরা, যেখানে মনে যা খুশি হোক গিয়া। আমরা যেমন ছিলাম বরাবর তেমনই থাকুম।"

তবু ভয় আর সন্দেহ উঁকি মারে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে। পত্রিকার পাতায় পাতায় লোমহর্ষণ কাহিনী ভুলিতে পারে না। গোমাংস খাওয়াইয়া 'কলমা' পড়াইয়া সব নাকি মুসলমান করিয়া ফেলিয়াছিল। বয়স্থা মেয়েদের ধরিয়া লইয়া নিকা বসিয়াছিল।

চক্ষু স্থির হইয়া যায় সকলের।

বৃদ্ধ মুসলমানরাও বলাবলি করে ঘরে বসিয়া। এই সব কাফেরের অপকর্মকে তাহারাও সমর্থন করিতে পারে না।

কিন্তু জোতদার, মণ্ডলেরা খুশিই হয়। কলিকাতায় তাহারা পরাস্ত হইয়াছিল। উহার শোধ কিছু হইয়াছিল নোয়াখালিতে। মনে মনে ভাবে, "হিন্দুরা চইল্যা গেলেইত হয়। এতকাল হিন্দুরা রাজত্ব করছে, দোকান-পাট ব্যাবসা বাণিজ্য সবই ছিল হিন্দুগো হাতে।" এইবার তাহাদের দিন আসিতেছে।

বাবু হইয়া উঠিবার রঙিন স্বপ্ন কৃষক-প্রধানদের চোখে। আর দেরি সয় না। "হিন্দুরা গেলেইত হয়।"

অরুণাভের ঠাকুরমা ভিটার মায়া ছাড়িতে পারিল না এতকাণ্ডের পরও। আর পারিল না বৃদ্ধ সরকার মশাই। সমস্তটা জীবনের স্মৃতিজড়ান এ কাছারি ঘরের মায়া ত্যাগ করা সোজা নয় তাহারও।

শোকে জর্জরিত দিদিশাশুড়ীকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য, তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে পদ্মা জনশূন্য বাড়ীঘর, গরুর বাথান, লেবু

বাগান, আনারস ক্ষেত। সবই ফাঁকা, সবই যেন ছাড়াছাড়া লাগে আজ। অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি ঝরিয়া পড়ে জনহীন গোলাবাড়ীর উঠানে। থমথম করে ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলান শূন্য নাটমন্দির, মণ্ডপঘর, আধা ভাঙা, জীর্ণ পালকিগুলি।

কাছারি ঘরে বৃদ্ধ সরকার মশাই এখনও হিসাবের খাতাপত্র উল্টায়। কদাচিৎ দুই একজন বৃদ্ধ প্রজা আসিয়া ঘুরিয়া যায়; দুই এক ছিলিম তামাক টানে। বৃদ্ধ সরকার তাহার অভ্যাসমত বাকি খাজনার কথাটা স্মরণ করাইয়া দেয়। কথাটা নিজের কানেই বেসুরা শুনায়।

দিদিশাশুড়ীর কথা আর শেষ হয় না পদ্মার কাছে। হয়তো জীবনের শেষ কথা বলিয়া লইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে চোখ ভিজিয়া উঠে।

আঙুল দিয়া দেখায়,—ঐ যে দূরে আমগাছটা দেখা যায়, তার আড়ালে সারি সারি টিনের গুদাম, 'ঐ পর্যন্ত ছিল এ বাড়ীর আম-বাগানের সীমানা।

পদ্মার দাদাশ্বশুরের লাগান বড় বড় গাছ—আম, জাম লীচু বাগান। অলক্ষ্যে নিঃশ্বাস পড়ে বৃদ্ধার। দূরে দেখা যায়—পীতাভ ধানক্ষেত। সুপারি গাছের দীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে দীঘির জলে।

রাত্রিতে মেয়েকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে, পদ্মা শোনে দিদি শাশুড়ীর মুখে তাহার বধূ জীবনের কহিনী।

স্মৃতির পর্দায় পর্দায় জড়ান এ রূপকথার শেষ হইতে চায় না।

পদ্মার চোখেও বেদনাময় আবেশ নামিয়া আসে। বৃদ্ধার দন্ত-বিহীন অসম্পূর্ণ উচ্চারণেও ধরা দেয় কত বিলম্বিত রাগরাগিনী—জীবনের রোমাঞ্চময় গাথা।

পালকির ভিতর হইতে ‘পুণ্যাহে’র মেলা দেখিতে যাইত এই বোসের বাড়ীর বৌয়েরা। কত চড়ক ঘুরিত মেলায়, কত ভাসান গাহিত দলে দলে।

ধূপছায়া আর ময়ুরকণ্ঠী রংয়ের আসমানী, বাণারসী-পরা দিদি-শাশুড়ীর বধূ-মুখখানা ভাবিতে চেষ্টা করে পদ্মা। নিঝুম রাতে হারিকেনের পাশে বসিয়া তাকাইয়া দেখে পদ্মা বৃদ্ধার করুণ মুখ-ছবি। সুদীর্ঘ বেদনার কাহিনী আঁকা সে-মুখে হারিকেনের নিস্প্রভ আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পদ্মা স্থির চোখে তাকাইয়া থাকে।

দিদি শাশুড়ী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, “আমার শাশুড়ীর আমলের বাজু, তাবিজ, গোপহার, নিমফল—কত কিছু ছিল সিন্দুক ভর্তি, কত আতর দান, গোলাপপাশ রূপার গড়গড়া। আর আউজকা আমার সোনার চাঁদের গলায় একখান ধুকধুকী ও পড়লো না—”

সুপ্রিয় কলেজের কাজ ছাড়িয়া গ্রামে চলিয়া আসিয়াছে আজ ছয় মাস।

গ্রামের মোড়ল আসিয়া জানায় সুপ্রিয়কে তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে গ্রামের দারোগা। সুপ্রিয় গা ঢাকা দিয়া আছে। একটা জরুরি কাজে শহরে যায় সে। শহরের প্রান্তে খোলা ময়দানের উপর মধ্যাহ্নের নমাজ পড়িতেছে দুই একটি বৃদ্ধ মুসলমান। আরও দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের মাঠে সভা ডাকিয়াছে লীগ হইতে।

সুপ্রিয় দূর হইতে শুনিতে চেষ্টা করে। সভার কাজ শেষ হইয়া যায়। শ্রোতারা খুশি হইতে পারে না বক্তার কথায়।

"পাকিস্তান ত দেখি শুধু বড়লোকের জন্যই।"

ঈদের সময় নূতন কাপড় জুটাইতে পারে নাই ছেলেমেয়েদের জন্য। ক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে মনের আড়ালে।

শহর হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইযা যায়। সুপ্রিয় ঘুরিয়া যায় নিঃশব্দে একটা পেয়াজ ক্ষেতের পাশ দিয়া। বাঁশের বেড়ায় ঘেরা অন্দর হইতে মোরগ আর মুরগি মুসলমান গৃহস্থ পল্লীরই পরিচয় ঘোষণা করে থাকিয়া থাকিয়া।

ভিতরে কেরোসিনের "কুপি" জ্বলিতেছে—ঘরের বেড়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটিয়া বাহির হয় লাল-কেরোসিনের নিষ্প্রভ আলো।

সুপ্রিয় ঘরের পিছন দিয়া চলে।

ভিতরে নারী কণ্ঠের গ্রাম্য উচ্চারণে ঝরিয়া পড়ে জ্বালাময়ী অসন্তোষ—"পাকিস্তান হওনে ত দেখি মান ঈজ্জৎই রাখন দায়। পরনের কাপড়ের দশা দেখছো?"

ক্ষোভ দেখা দিয়াছে চতুর্দিকে।

সুপ্রিয় হাঁটিয়া চলে আরও উত্তরে। গ্রামের শেষ মাথায় কামার বাড়ীতে বৈঠক বসিবে তাহাদের আজ গভীর রাতে।

দূরে মরা-নদীর ওপারে ইউনুস অপেক্ষা করিয়া আছে তাহার জন্য। ইউনুসের বৌও অপেক্ষা করিয়া আছে ভাত লইয়া। নীলডুরে-পরা চাষীর বৌ। সুপ্রিয় হাঁটে সন্তর্পণে সাঁকোর উপর দিয়া।

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে ইউনুস। "এত দেরি হইল—আমিত ভাবলাম ধরা পইরা গেলেন বুঝি।"

ইউনুসের বৌ তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া আনে।

লাল মোটা ভাত আর পেঁয়াজ কলির তরকারি। ইউনুস আর সুপ্রিয় খাইতে বসে, ইউনুসের বৌ ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়া থাকে সামনে।

কথা বলে না। তবু কত অফুরন্ত মমতা ঝরিয়া পড়ে অকুটিল কাল চোখের মণিতে।

সুপ্রিয় মুখ নীচু করিয়া ভাত খায়। কিন্তু মনে মনে অনুভব করে চাষীর বৌয়ের এ উদ্বেগময় অন্তরের কল্যাণ কামনা।

আবার পথচলা শুরু হয়। খালের ধারে মাছ পাহারা দিতেছে চাষীর ছেলেরা। মৎস ভক্ষক "উদ" তাড়াইবার জন্য এ নৈশ প্রচেষ্টা।

চতুষ্কোণ লণ্ঠনের রক্তিমাভ আলোতে স্পষ্ট হইয়া উঠে চাষীর ছেলের অসন্তোষচাপা বিরক্তি।

উত্তেজিত স্বরে কথা বলে দুইজনে। নিত্যকার জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী কাব্য হইয়া উঠে হিমঝরা বোবা মাঠের বুকে।

"শত্রু আমাগো হিন্দুরা না, শত্রু বড়লোকেরা। না হইলে এখন ত হিন্দুগো দেখান হইছে, তাও ক্যান এই দশা আমাগো। বড়লোকগো বেলায় ত সবই জোটে দেখি। নূতন হইছে পাকিস্তান বইলা কিছু আটকায় না। শহরে দেইখ্যা আইলাম মটরে চইরা ফুর ফুর কইরা ঘুইরা বেড়াইতেছে বিবিরা। আর আমাগো বিবি গো বুঝি সরম, লজ্জা নাই।"

উত্তর দেয় কর্কশ পুরুষকণ্ঠে, "আরে মিঞা, আমাগো কি আর মাইনষের মত দেখে বড়লোকেরা। এই কথাটাইত আগে বুঝি নাই যে—শত্রু আমাগো হিন্দুরা না—শত্রু বড়লোকেরা।"

সুপ্রিয় হাঁটিয়া যায় মৃদু পায়ে আখের ক্ষেতের পাশ দিয়া। সম্মুখে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত। এই ধানকাটা মাঠের বুকেইত রক্ত জমাট হইয়া উঠিয়াছিল একদিন। বীজ বোনা বৃদ্ধ চাষীদের বুকের উষ্ণ রক্তে-ভিজা মাটিতে ফসল ফলিয়া উঠিয়াছে আবার।

কিন্তু এ পাকা ফসল ঘরে তুলিয়া যাইতে পারে নাই বৃদ্ধ মণ্ডল। তাহার আত্মার ক্রন্দন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে যেন এ ধানের শীষের নিশীথ কম্পনে।

পিছনে ফিরিয়া তাকায় সুপ্রিয়। দূর হইতে দেখা যায় 'উদ তাড়াইবার অভিযানেরত চাষীর ছেলেদের চতুষ্কোণ লণ্ঠনটি—গাঢ় অন্ধকারের ভিতর শুধু জ্বল জ্বল করিতেছে একটি লাল আলোক বিন্দু।

সুপ্রিয় অগ্রসর হইয়া যায়।

সমীর টিফিনের সময় তাহাদের ছাত্রদের খুঁজিয়া জানাইয়া দেয়, "মিটিং হ'বে আজ, ছুটির পরে। যেও সবাই।"

থার্ড ইয়ারের মলয় ঠাট্টা করে, "তোমাদের ঐ গাছ তলার মিটিংত। তাহ'লে আমি সময় নষ্ট করতে পারবো না।" সমীর বলে, "গাছ তলায় হ'লেও জরুরি ব্যাপার আসা চাই-ই।"

ছুটির পর তাহাদের ছাত্ররা জড়ো হয় কলেজ প্রাঙ্গণে। কয়েক জনের চোখে মুখে উদ্বিগ্ন ব্যস্ততা। দায়িত্বপূর্ণ চিন্তার ছায়া চোখের তারায়। প্রসাদ আগাইয়া আসে তাহার কাঠের পা লইয়া, ধীরে ধীরে।

বক্তৃতা আরম্ভ হয়। প্রধান বক্তা সেই। আগামী দিনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে সে ছাত্রদের।

জ্যোতির্ময়ও ছুটির পরে আলাদা ভাবে একটা মিটিং ডাকে তাহাদের ছাত্রদের লইয়া। দোতালার কমনরুমে জড়ো হয় তাহারা। নিজেদের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ শুরু হয় তুয়ার বন্ধ ঘরের ভিতরে। কমলেশের ছোট ভাই অমরেশ আপত্তি জানায়, "কমুনিষ্টদের সাথে একত্রে কাজ করা চলতে পারে না।"

জ্যোতির্ময় উত্তেজিত হইয়া উঠে, "আমাদের কাজটাই বড় করে দেখতে হ'বে। কার সঙ্গে করা সেটা বড় নয়।"

নীচে বড় রাস্তা দিয়া এক লরী বোঝাই লোক স্লোগান দিয়া জোরে চলিয়া যায়। "ষ্ট্রাইক বন্ধ কর। শিশু রাষ্ট্রকে বাঁচাও। কমুনিষ্টদের উস্কানিতে বিভ্রান্ত হ'য়ো না।" আরও একটা লরী আসে "চোঙ' লইয়া সমস্বরে শ্লোগান দেয় লরীর ভিতর হইতে "ষ্ট্র্যাইক মৎ করো।"

গুণ্ডার মত চেহারা—উদভ্রান্ত দৃষ্টি ঘোলাটে চোখে। ছাত্ররা তাকাইয়া দেখে। তাহাদেরও চোখে চোখে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হয়।

তাহারাও প্রত্যুত্তর দেয় সমস্বরে, চিৎকার করিয়া, "ষ্ট্রাইক জরুর করেঙ্গে।"

সঙ্গে সঙ্গে লরীর ভিতর হইতে ইট আসিয়া পড়ে জমায়েত ছাত্রদের উপরে।

উহারাও পাল্টা নিক্ষেপ করে সে ইট কুড়াইয়া লইয়া। একটা লোকের মাথা কাটিয়া যায় লরীর ভিতরে। লরীটা তীরের বেগে ছুটিয়া যায়।

ছাত্রদের মধ্য হইতে চেঁচাইয়া বলে, "থানায় চল্লিত ব্যাটারা। যত সব মাতাল আর গুণ্ডা দিয়ে ষ্ট্রাইক ভাঙাবে। অত সোজা নয়।"

সমীরের চোখের নীচে ফুলিয়া উঠিয়াছে। একটি ছেলে জলের ট্যাঙ্ক হইতে জল লইয়া ঢালিয়া দেয়।

বেলা পড়িয়া আসে। বাড়ী ফেরে ছাত্ররা পরের দিনের অবস্থা সম্বন্ধে অনিশ্চিত উদ্বেগ লইয়া।

হোষ্টেলের ছেলেরা জটলা করে তখনও।

"গুলিটুলি কি আর চলতে পারে এখনই।"

"তাহ'লেত শিশুরাষ্ট্রের মুখোশ ভাঙবে একটু।" উত্তর দেয় আরেকজন।

বাকী ছাত্ররা এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়ে বাড়ীমুখী। রাস্তায় দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় পোষ্টার আটকান—"এই ষ্ট্রাইকের পেছনে আছে কম্যুনিষ্টদের উস্কানি। এই কম্যুনিষ্টরা কারা? যারা '৪২ সনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আজও এই শিশুরাষ্ট্রকে বিপন্ন করিতে চাহিতেছে তাহারাই।"

জ্যোতির্ময় পড়ে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পোষ্টারটা। মনে মনে বলে, "তোমরাই হ'চ্ছ আজকের শ্রমিকের বড় বন্ধু!"

সুকল্যাণের ঘরে যায় জ্যোতির্ময়। সুকল্যাণের ঘরে আরও কেহ কেহ আসিয়াছে পূর্বেই। জ্যোতির্ময়ের মুখে সব শুনিয়া সুকল্যাণ বলে গম্ভীর হইয়া, "'৪২ সনের পর আজ ছয় বছর কেটে গেল। '৪৮-এ পা দিলাম এখনও সেই '৪২ সনের একঘরেরা জাতে উঠতে পারলো না, কুলীনের বংশধর সব আমরা।"

এরই মধ্যে একজন খবর লইয়া আসে, তাহাদের অফিস আক্রান্ত হইয়াছিল সন্ধ্যাবেলা, একজন মহিলা নেত্রীকে অপমানিত করিয়া গিয়াছে।

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া যায়। মেয়েদেরও সম্মান করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এরা?

সুকল্যাণ আপসোস করিয়া বলে, "আমাদের ঘাড়ে দাঁড়িয়ে আজ তোমরা নেতা। আর এখনই এই মূর্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামের

অত্যাচারিত দেশপ্রেমিকরা আজ তাহাদের এ আত্মত্যাগ, এ লাঞ্ছনার যোগ্য মূল্যই পাচ্ছে বটে।"

প্রসাদ ফেরার পথে রিকসা করে। সমীরই বলিয়া দেয়, "রিকসা করে চলে যাও তাড়াতাড়ি। বলা যায়না ওদের ব্যাপার ট্যাপার। হুঁশিয়ার থাকাই ভাল।"

প্রসাদ তাকাইয়া দেখে, রিকসাওয়ালা সুন্দর একটি ছোট্ট তেরঙ্গা পতাকা লাগাইয়াছে তাহার রিকসার মাথায়। প্রসাদ ইচ্ছা করিয়াই প্রশ্ন করে, "ওটা লাগিয়েছ কেন?

"কেয়া আপ জানতে নেহি, স্বরাজ মিলগিয়া"

"স্বরাজ ত মিলগিয়া। কিন্তু তোমাদের হাল কিছু বদলেছে?"

আধা বাংলায় জবাব দেয় রিকসাওয়ালা, "নেহি বাবু। হাম ত গরীব আদমি। হামকো ত ভগবান দেখছেন না, আউর কোন দেখেগা।"

প্রসাদ আর প্রশ্ন করে না। মনে মনে ভাবে আজাদী মিলগিয়া, এতেই খুশি। কিন্তু এ স্বরাজের সাথে তার কি লাভ হ'ল সে প্রশ্ন মনে আসে না।

স্বরাজ পাওয়ার সহিত এদেরও যে জীবনের মস্ত সম্পর্ক থাকতে পারে তাই এরা জানে না। কিন্তু একদিন জানিবে। এ হাল চিরকাল আর থাকিবে না। মোড় ঘুরিবেই।

রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর রোয়াকে 'স্পেসাল বিল' লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

"এ বিল যে গণ-আন্দোলনকেই পিষে মারার জন্য, সেটা বুঝছো না কেন।"

"তা ত না। এতে ত এমন কথা বলাহ য়নি"।

"বলা না হ'লে কি হবে—

রিকসাটা ঘুরিয়া যায়—আর কানে পৌছায় না তর্কটা। অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে প্রসাদ।

সূর্যদের বস্তির পাশ দিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে রিকসা। মনটা খারাপ হইয়া যায়। সূর্য নাই। গ্লাস ফ্যাক্টরীর ইউনিয়ন ভাঙিয়া গিয়াছে। দাঙ্গাতেই আরও সর্বনাশ হইল। বেশীর ভাগ ইউনিয়নেই আজ এই অবস্থা। এই জন্যইত দাঙ্গা জিয়াইয়া রাখিতে এত আগ্রহ মালিকদের! তাহার দাদাও ত আজ একজন মস্ত বড় হিন্দু পাণ্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুস্বার্থের জিগির তুলিয়া মুসলমান মজুরদের সব ছাঁটাই করিয়াছে তার ফ্যাক্টরীতে।

মজুরদের একতা ভাঙিয়া গিয়াছে, আত্মবিশ্বাস হারাইয়া গিয়াছে। কি নিয়া আর টিকিয়া থাকিবে ইউনিয়ন।

সূর্যের রক্তমাখা দেহটা ভাসে চোখের সামনে। আরও কত অগণিত সূর্যের রক্তমাখা পথের উপর দিয়া চলিবে কালের রথচক্র।

এত বড় নিস্তব্ধ শূন্যপুরীর ভিতরে তিনটি প্রাণী—পদ্মা, তাহার শিশুকন্যা আর বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী। আর আছে কাছারি ঘরে বৃদ্ধ সরকার। পাঁচ আনি, চার আনির মস্ত মস্ত টিনের ঘরগুলি নিষ্প্রাণ মরার মত পড়িয়া আছে। জনহীন উঠানগুলির বুকে উদাস করা শূন্যতা।

বাড়ীর সামনের সড়ক দিয়া অনবরত গরুর গাড়ী চলিয়াছে, বিছানা, তোরঙ্গ, জিনিসপত্র বোঝাই, বাস্তত্যাগী গৃহস্থদের লইয়া।

নমপাড়ার ছিদামের মা আসিয়া দুঃখ করে "রাইচরণ চইল্যা গেল, ক্ষেতভর্তি তরিতরকারী—যার ভোগে যা। অদৃষ্টে ছিল না ভোগ। কেমন সুন্দর লতাইয়া উঠছে চালের উপর কুমড়া গাছটা। দেখলে মায়া লাগে।"

"শ্বশুর শাশুড়ীর ভিটা—একি যে সে মায়া।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে পদ্মার দিদি-শাশুড়ী।

পদ্মা শোনে, গ্রাম ভরিয়াই আর্তনাদ উঠিয়াছে, নিঃশব্দ বন, প্রান্তরও যেন এ নীরব ক্রন্দনে মাখা।

পদ্মা ঘাটলায় গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। পুকুরের ওপারে সুদূর বিস্তৃত ধানক্ষেত। শেষ আর দেখা যায় না। বসিয়া বসিয়া ভাবে পদ্মা পুরানো দিনের কথা। এ বিষণ্ণ আবেষ্টনী বহুদিনের স্মৃতিগুলিকে জাগাইয়া দিয়া যায় মনে। সেই ছয় বছর আগের অরুণাভ! প্রিয় সান্নিধ্যের মধুর কামনা!

বিশ্বরূপকেও ভুলিতে পারে না পদ্মা। গভীর বেদনানুভূতি অঙ্গে অঙ্গে, শিরায় শিরায়। অরুণাভ ও বিশ্বরূপ এক সঙ্গেই জুড়িয়া আছে তাহার প্রেমাচ্ছন্ন মনের ইন্দ্রজালে। দুইটি ব্যক্তিত্বের মাধুরী-ধারা বহিয়া চলিয়াছে অন্তঃশীলা ফল্গুর মত।

বিশ্বরূপও কি ভাবে তাহার কথা। এমন নীরব প্রেমের ফল্গু বহিতেছে কি তাহারও অন্তরে!

বিপাশার মুখখানা ভাসিয়া দাঁড়ায় মনের দুয়ারে। বিবেকের অনুরোধ উঠে মনের আরেকটা প্রকোষ্ঠে! বিশ্বরূপকে ভুলিতেই হইবে, তাহাকে।

আবার অরুণাভের কর্মক্লান্ত মুখখানা ফুটিয়া উঠে অপলক চোখের তারায়। আধ-প্রেম আধ-স্নেহের কি স্নিগ্ধ বেদনা! পদ্মা মনে মনে উচ্চারণ করে, 'প্রিয়, প্রিয় আমাদের'। অরুণাভের সহিত প্রথম পরিচয়ের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি ভাসে চোখের সামনে। হিন্দিতে বক্তৃতা দেওয়া—বংকল মজদুরদের সম্মুখে, গভীর রাত্রিতে পোষ্টার লেখা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের জনবিরল রাস্তা···

অদূরে পরী হাস আর কুকুরের সঙ্গে খেলা করিতেছে। পদ্মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে। স্বর্গীয় সুন্দর জীব সব। মাটির বুকেই আছে, তবু মাটি হইতে বহু উর্দ্ধে। অপূর্ব মিতালী।

পরী একটা বাটিতে কতগুলি মুড়ি লইয়া আসিয়াছে হাঁসগুলিকে খাওয়াইতে। কুকুরটাই খাইয়া ফেলে সব, হাঁসগুলিকে বঞ্চিত করিয়া। পরীর মনমত হয় না উহা। সে কাঁদ কাঁদ হইয়া আসিয়া দাঁড়ায় মার কাছে।

পুকুরের ওপারে সুপুরী গাছগুলির আড়াল দিয়া কে একজন দ্রুত সাইকেল চালাইয়া চলিয়াছে।

"সুপ্রিয় না।" পদ্মা লক্ষ্য করিয়া দেখে। সুপ্রিয়ই! সেও দেখিতে পাইয়াছে তাহাকে। এক নিমিষের জন্য সাইকেলের গতিটা একটু কমাইয়া কি যেন বলিয়া যায় হাতের ইশারায়। কথাগুলি ধরা যায় না, বাতাসে উড়াইয়া লইয়া যায়। তবু খুশি হয় পদ্মা, সুপ্রিয় এখানেই আছে তবে। দূরে মিলাইয়া যায় সাইকেলটা। বাতাসের আগে আগে উড়িতেছে মাথার চুলগুলি। "রোদে পুড়ে পুড়ে কি চেহারা হ'য়েছে।" মনে মনে ভাবে পদ্মা। এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে সেই দিকে।

পরী একটুকরা কাগজ লইয়া আসে কোথা হইতে, "নৌকো বানাও মা। নৌকো।" পদ্মা কাগজের নৌকা বানাইয়া

পুকুরে ভাসাইয়া দেয়, পরী খুশিতে ঝলমল করিয়া উঠে। ছোট্ট চোখের মণিতে কি স্বপ্ন নামিয়া আসে, দেখে পদ্মা। শিশুর পৃথিবী! এত সুন্দর এই ছোট্ট দুনিয়াটুকু। তবু কেন সর্বক্ষণের জন্য একটা ব্যথার চাপ অনুভব করে সে। সারাদিন কাজ কর্ম করে পদ্মা। কাজ করার সঙ্গে- সঙ্গে গানের সুর টানে ম্লান কণ্ঠে মৃদুগলায়।

দিদিশাশুড়ী পূজায় বসিয়াছে। একমনে ধ্যান করিতেছে চোখ বুজিয়া। পরী সেই ফাঁকে লক্ষ্মীর আসন হইতে লক্ষ্মীর মূর্তি তুলিয়া লইয়া আসে।

পদ্মা ছুটিয়া যায়, "সর্বনাশ। শীগগীর রেখে এসো।" পরী কিছুতেই ছাড়িবে না। "এটা আমার পুতুল।" পদ্মা জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া যায় তাহার হাত হইতে পিতলের লক্ষ্মী দেবীকে। পরী পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

পদ্মা বলে, "পরী এস আমার কাছে, গল্প বলি—"সাত ভাই চম্পা জাগরে।"

পরী আপত্তি জানায়, "না, কাগারাণীর গল্প বল।" পদ্মা সুর করিয়া গল্প শুনায় মেয়েকে—"কাক এসে কাগারাণীকে ডাকছে, 'কাগারাণী, কাগারাণী, ভাত খাও এসে ঘরে।'

কাগারাণী গাল ফুলিয়ে বলে,

"কাগা আমায় মেরেছে—
গা কনকন করেছে—
বাজারে বাজাব ঢোল—
ভাত খাব না হাড়ি তোল।"

সুপ্রিয় ঘরে ঢোকে, "বাপরে, কাগারাণীর রাগত কম নয়।"

পরী লাফাইয়া উঠে কাকাকে দেখিয়া। কাকার কাছে গিয়া বলে, "কাকা, বানলে, বালিগুলোকে মুন বলে বলে খায়।"

সুপ্রিয় হাসিয়া বলে "আর কিছু খাবার জুটলো না, বালিগুলোকেই খায়—তাও আবার মুন ভেবে। তোমার গল্পের বানরের দেশেও দুর্ভিক্ষ লেগেছে পরী!"

পদ্মা খুশি হয় সুপ্রিয়কে পাইয়া। সুপ্রিয় লক্ষ্য করে। তাহারও মনটা খারাপ হইয়া যায় পদ্মার জন্য। একেবারেই সঙ্গীহীন এখানে। অথচ গেল পত্রে জানাইয়াছে অরুণাভ, তাহার চাকরি গিয়াছে এডিটারের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায়। কাজেই কলিকাতায় গেলেও মুস্কিল এখন, বিশেষ পরীর জন্যই যাওয়া উচিত না। পদ্মা জিজ্ঞাসা করে, "আজই আবার চলে যাবে?"

"আজই যাব না, তবে থাকতেও পারবো না। কোলকাতায় যেতে হ'বে শীগগীরই কয়েকদিনের জন্য।"

পদ্মা তারিখটা মনে করিয়া দেখে তাহার শাশুড়ীর মৃত্যুদিবস আজ। দূর অতীতের একটি বিশেষ দিনের স্মৃতি জড়াইয়া ধরে মনে, যেদিন প্রথম চিনিয়াছিল সে তাহার অরুণাভকে।

পদ্মা বলে, "চলো সুপ্রিয়, মায়ের শ্মশান থেকে ঘুরে আসি।"

ছোট্ট একটি স্মৃতিবেদী সাদা পাথরের—একটা সাদা কাঞ্চন গাছের তলে। সুপ্রিয় বসে গাছতলায় ঘাসের উপরে। পদ্মাও বসে মেয়ে কোলে বেদীর তলায়। পদ্মা মৃদু গলায় গান করে তাহারই প্রিয়তমের জীবনদাত্রীর মৃত্যুতিথির স্মরণে। সেই প্রথম গাওয়া গান—"হে মহা জীবন, হে মহা মরণ।"

অরুণাভের বিষন্ন মুখখানাই ভাসিয়া উঠে মনের আড়াল হইতে—তাহারই স্বামী, তাহারই প্রিয়তমের মাতৃহারা শিশু-মুখখানা যেন

আসিয়া দাঁড়ায় সম্মুখে। পদ্মার চোখ জলে ভরিয়া উঠে। ভারী হইয়া আসে কণ্ঠ, গান থামিয়া যায় আবেগে। সুপ্রিয় টানিয়া লয় অসমাপ্ত গানের সুরকে। মৌনী বনবনানীর নিস্তব্ধতায় মিলাইয়া যায় পুরুষ কণ্ঠের গম্ভীর স্বরস্রোত।

পদ্মা সজল চোখে তাকায় খালের ওপারে।

একটা গরুর গাড়ী চলিয়াছে ধীর মন্থর গতিতে, ভিটাত্যাগী গৃহস্থদের লইয়া। খালের এপারে দাঁড়াইয়া মুসলমান শিশুরা করুণনেত্রে দেখিতেছে তাহাদের খেলার সাথীদের এ চলিয়া যাওয়া। ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে থাকে গরুর গাড়ীটা পিছু ডাকা চোখগুলির আড়ালে।...

দুপুর বেলা চুপ করিয়া বসিয়া আছে পদ্মা। মনটা বড় খারাপ হইয়া আছে তাহার। অরুণাভের চিঠির অপেক্ষায় উতলা হইয়া থাকে মন। সুপ্রিয় ঘরে ঢোকে বাহির হইতে—রৌদ্রে লাল হইয়া উঠিয়াছে চোখ মুখ। পদ্মার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "কি হ'য়েছে পদ্মা।"

"কোলকাতার চিঠিপত্র আসছে না। তাই বড় খারাপ লাগছে মনটা। আর একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে উঠলাম।"

পদ্মার গলার স্বর ভারী হইয়া আসে। সুপ্রিয় কথা বলে না। বাহির হইয়া যায় আবার। পদ্মা ব্যস্ত হইয়া তাকাইয়া দেখে, সুপ্রিয় আবার সাইকেলে ছুটিয়া চলিয়াছে।

"না খেয়ে-দেয়েই আবার বের হ'ল।" মাতৃসুলভ ব্যথায় মনটা কাতর হইয়া উঠে সুপ্রিয়ের জন্য।

ঘণ্টা খানিকের মধ্যে ফিরিয়া আসে সুপ্রিয় পোষ্টাফিস হইতে। দূর হইতেই দেখায় একখানা এনভেলাপ। পদ্মার মনটা আশায় নাচিয়া উঠে—অরুণাভের পত্র।

"নাও তোমার চিঠি। এবার আমি চলি।" পদ্মা বলে, "স্নান করে এসে তুমি। আমি ভাত বসিয়ে রেখেছি। সেই ভোরের ঠাণ্ডা ভাত কি আর এত বেলায় খাওয়া যায়।" সুপ্রিয়ের চোখে পুরানো ব্যথার ছায়া পড়ে নিমেষের জন্য, পদ্মার এ আন্তরিক স্পর্শে। অবার মুহূর্তেই সংযত করিয়া লয় মনকে।

স্নান করিতে চলিয়া যায় সে।

পদ্মা চিঠিখানা খোলে।

অরুণাভ লিখিয়াছে—"প্রিয় পদ্মা, তুমি পত্র পেয়েই চলে এসো—বিপাশা পুলিশের লাঠিতে গুরুতর রূপে আহত। ছাত্রদের একটা মিটিং-এর উপর অতর্কিত লাঠি চালায় পুলিশ, অসংখ্য কাঁদুনী বোমা ছোঁড়ে। তা'তে প্রায় একশ ছাত্র ছাত্রী অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে।

"এ দিকে দালালদের প্রচেষ্টা আর প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত সমান ভাবেই চলছে। ভারতবর্ষের রাজনীতি এক নূতন পর্যায়ে শুরু হ'য়েছে। অর্থ-নৈতিক সংকট সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক শক্তি।

"তুমি আর পরী। তোমাদের কথা সব সময় মনের কাছে আছে।

"পরীর কথাই ভাবি—সে ত কিছুই বোঝে না। তোমার উদ্বেগময় জীবন হয় তো আর কোনদিন শেষ হ'বে না। তবু এই জীবনই আমাদের সার্থকতা। অরুণাভ।"

পত্র পড়িয়া আর এক ঘণ্টাও দেরি করিতে পারে না যেন পদ্মা রওয়ানা হইতে। সরকার মশাই আপত্তি জানায়, "আজ এই অমাবস্যায় কচি মেয়ে নিয়ে বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়াটা কি ঠিক হ'বে।"

সরকার মশাই পঞ্জিকা খুলিয়া দেখে, তিনদিনের মধ্যে আর ভাল দিনও নাই যাত্রার। মঘা, অশ্লেষা।"

সুপ্রিয় প্রতিবাদ করে, "বিপদ যদি হয়ই কিছু, তাহলে কি আর মঘা অশ্লেষায় ঠেকে থাকবে। অরুণদার এ পত্র পেয়ে আর দেরি করা ঠিক নয়।"

অগত্যা পালকি ঠিক করিয়া আসে সরকার মশাই। অত রাত্রিতে গরুর গাড়ী পাওয়া যাইবে না।

রাত্রিতেই রওয়ানা হয় পদ্মা, মেয়ে কোলে পালকিতে উঠে। সুপ্রিয় সাইকেলে যায় পিছনে পিছনে। দিদিশাশুড়ী নিঃশব্দে চোখের জল মোছেন। পদ্মারও মনটা এবার বড় ভিজিয়া উঠে—এই হয়তো শেষ দেখা। কেমন একটা পিছুডাকা আকর্ষণ অনুভব করে পদ্মা আজ। ঐ বৃদ্ধা একলা এই জনহীন পুরীতে কি ভাবে দিন কাটাইবে?

অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি। পালকির বেহারারা হুঁশিয়ারি শব্দ করিতে করিতে আগাইয়া চলে সম্মুখে আঁকাবাকা, অসমান পথ ভাঙিয়া। চতুর্দিকে গভীর অন্ধকার—দূরে নদীতে মাছধরার নৌকার বাতি, বেহারাদের অদ্ভুত হুঁশিয়ারি শব্দ, কোলের উপর ঘুমন্ত শিশুর উষ্ণ নিঃশ্বাস—সবে মিলিয়া এক রোমাঞ্চময় আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হয় দোদুল্যমান পালকি। দুই পাশের ভূতের মত কাল কাল ঝোপঝাড়, জঙ্গল গাছপালা টিনের গুদামঘর ধীরে ধীরে পিছে সরিয়া যায়। বিষণ্ণ স্তব্ধতায় আচ্ছাদিত তমসা ঘেরা শর্বরী। একদিকে অনিশ্চিত সম্মুখের গাঢ় দুশ্চিন্তা, আরেক দিকে পিছুডাকা গভীর আকুলতায় স্থির হইয়া যায় পদ্মা।

৫ই জানুয়ারী। জেনারেল ষ্ট্রাইক কল দিয়াযাছে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। আগের দিন সবাই উদগ্রীব হইয়া থাকে ভোরের

অপেক্ষায়। অবিস্মরণীয় ২৯শে জুলাইর কলিকাতা বারে বারে ছুঁইয়া যায় মনে। অরুণাভ বাড়ী ফেরে অনেক রাতে। পদ্মা ও বিপাশা উৎসুক চোখে তাকায়—"কি খবর?"

"খবর বিশেষ সুবিধার নয়। ট্রামেতে জোর চেষ্টা চলছে ষ্ট্রাইক ভাঙার জন্য। মারপিট হওয়ারও আশংকা আছে।"

পদ্মা চুপ করিয়া থাকে। দালালদের স্বরূপ সে ভালভাবেই চিনিয়াছে দাঙ্গার সময় হইতে।

অন্ধকার ভোরে ঘুম ভাঙিয়া যায় বিপাশার। এখনও সম্পূর্ণ সারে নাই শরীর। বিছানায় শুইয়াই কান সজাগ করিয়া থাকে সে। বহুদূর হইতে একটা ট্রাম চলার শব্দ কানে আসে যেন। বুকটায় মোচড় দিয়া উঠে এ শব্দে। ধীরে ধীরে শব্দটা ক্রমেই কাছে আসে—ট্রামই চলিতেছে। মনে হয় যেন, তাহার বুকের উপর দিয়াই চলিতেছে ট্রামের চাকাগুলি।

"দাদা, একটু দেখে এসোত রাস্তায়।" বিপাশা ম্লান কণ্ঠে বলে।

অরুণাভ রাস্তার মোড়ে গিয়া দাঁড়ায়। দুই, তিনটা 'রুটে'র ট্রাম চলিতেছে। ক্রমাগত আসে যায় ট্রাম বাস। মনটা দুমরাইয়া উঠে—বিষণ্ণ মুখে ফিরিয়া আসে ঘরে।

বিপাশা শুইয়া শুইয়া পত্রিকাটা উল্টায় নিরানন্দ অনিচ্ছুক হাতে।

তাহাদের সবচাইতে "ষ্ট্রং" ইউনিয়নই ট্রামের। এমনকি দাঙ্গায় যে সবচাইতে বড় ক্ষতি করিয়াছে, তাহাতেও ট্রামের একতা ভাঙিতে পারে নাই—দালালদের সব চেষ্টাই বৃথা হইয়াছে।

আর আজ জেনারেল ষ্ট্রাইক ডাকা সত্ত্বেও এই অবস্থা! ১৫ই আগষ্টের পর এই প্রথম রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট ডাকা। আর শুরুতেই এত ব্যর্থতা!

দু চার জন কমরেড আসে, একটু ঘুরিয়া যায়। সাময়িক হতাশার অবসাদ সর্বাঙ্গে। আলোচনা করে তাহারা, কোথায় গলদ। আলোচনার দ্বারা মনের মেরুদণ্ডকে সোজা রাখিতে চায়।

পদ্মা লক্ষ্য করে কমরেডদের চোখের এ বিষণ্ণতা। তাহারও বুকের ভিতরে একটা সমব্যথার চাপ। কেন এমন হয়? কর্মীদের এত তীব্র কর্মনিষ্ঠা, এত দুঃখবরণ এত ঐকান্তিকতা, তাও সার্থক হইয়া উঠে না কেন তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা!

ভাবিয়া পায় না কেন এমন হয়—কেন সাধারণ মানুষ বোঝে না তাহাদের হিত-অহিত।

দুপুরের দিকে সংবাদ লইয়া বাড়ী ফেরে অরুণাভ—শহরতলীর বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলিতে পূর্ণ হরতাল হইয়াছে। আশার বিজলী জ্বলিয়া উঠে বিপাশার দীপ্ত চোখ দুইটিতে। পদ্মা তাকাইয়া দেখে—এসংবাদ যেন আশার প্রলেপ বুলায় উহাদের চোখেমুখে।

পদ্মা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা এত দুঃখ পাচ্ছে লোকে, তা'ও নিজে থেকেই সংগ্রামমুখী হ'য়ে উঠে না কেন তাদের মন?"

বিশ্বরূপ উত্তর দেয়, "মানুষের দুঃখ থাকাটাই সব কথা নয়। দুঃখ বোধ থাকাটাও কম বড় কথা নয়। দুঃখকষ্টের ব্যথাকে ক্লোরফরম করে রেখেছে অদৃষ্টের লিখন বলে। না খেয়ে মানুষ মরছে ঠিকই কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে না জানছে, যে তারও বাঁচার পথ আছে, সুন্দর ভাবে বাঁচার অধিকার আছে পৃথিবীতে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিদ্রোহ করতে পারে না। নিজেদের একত্রিত শক্তির সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা

না আসা পর্যন্ত সংগ্রামমুখী হ'তে পারে না মন। আর এখনকার ষ্ট্রাইক ব্যর্থ হবার আরেকটা মস্ত কারণ—এতদিন ষ্ট্রাইক হ'ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি। এখন ষ্ট্রাইক হ'চ্ছে দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু দেশীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপটা এখনও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেনি মানুষের চোখে।"

একখানা এনভেলাপ আনিয়া দেয় অরুণাভ পদ্মার হাতে। পদ্মা খুলিয়া দেখে, পিসীমার পত্র—কাশী হইতে লিখিয়াছেন। দীর্ঘ পত্র। পিসীমা লিখিয়াছেন তাহাদের জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। পরিশেষে জানাইয়াছে তাহাদের আদর্শ দীর্ঘজীবী হউক।

পদ্মা অভিভূত হয়। পিসীমার শিল্পপ্রদর্শনীতে বক্তৃতা দেওয়া কথাগুলি একটু ছুঁইয়া যায় মনের প্রান্ত দিয়া। সেই পিসীমা, কাশীবাসী আশী বছরের বৃদ্ধাও আজ সাম্যবাদীদের কল্যাণ কামনা করিতেছে একান্ত নিভৃতে।

কুসুমলতা কাশীতে আছে। শহরের প্রায় শেষ মাথায় খুবই ছোট্ট একটা দেশী টালির ঘর।

রাত্রির জন্য লণ্ঠনটি ঠিক করিতে গিয়া দেখে কুসুমলতা, একফোঁটাও তেল নাই বোতলে। তাড়াতাড়ি দুপুরবেলাই বাহির হয় কেরাসিন আনিতে। এক হাতে কেরাসিনের বোতল, আরেক হাতে অস্থিসার দেহের সম্বল একটি মজবুৎ লাঠি। গায়ে জড়ান একখানা জীর্ণ উড়নি। দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতার গাঢ় ছায়াময় এক আত্ম-তন্ময়তার পর্দা দৃষ্টিতে।

অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া চলে অশীতি বয়স্কা বৃদ্ধা—কেরাসিনের দোকানের দিকে।

মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত ধূলিকণা। পায়ের তলাটা পুড়িয়া যায় মনে হয়, প্রতি পদক্ষেপে।

খড়বোঝাই একটা গরুর গাড়ী পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় কিছু ধূলা উড়াইয়া। উড়নির কোণাটা মুখে চাপিয়া ধরে বৃদ্ধা! তবু কিছুটা ধূলা ফুসফুসে ঢুকিয়া যায় মনে হয়।

কাশি আরম্ভ হয়। কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হইয়া আসে যেন। শ্বাসের কষ্ট। শেষ বয়সের নানা ব্যাধি সুযোগ বুঝিয়া ঢুকিয়াছে শরীরে। এ অক্ষম দেহটাকে আর টানিতে পারিতেছে না বৃদ্ধা। এরই মধ্যে মনে হয়, কয় ক্রোশ পথ হাটিয়া আসিয়াছে সে। গাছতলায় বসিয়া একটু জিরাইয়া লয়। সংসারে আবদ্ধ থাকিতে আর চায় না কুসুমলতা। তাহার সমস্ত জীবনের সাধনাক্ষেত্র আশ্রম, বালিকা-বিদ্যালয় সবইত ভাঙিয়া গিয়াছে, আর কিসের জন্য সংসারে থাকা। গ্রামই ভাঙিয়া গিয়াছে। শুধু রূপসী গ্রাম কেন—সমস্ত দেশব্যাপী ভাঙন শুরু হইয়াছে।

একদিকে ভাঙা, আর একদিকে গড়া। আরেক নূতন যুগ সৃষ্টি হইতেছে এই ভাঙনের ভিতর হইতে। কুসুমলতা উপলব্ধি করেঃ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজেই পৃথিবীব্যাপী এ সংকট দূর হইতে পারে, বোঝে সে। কিন্তু তাহার আর শক্তি নাই আজ। কোনও কাজেই লাগিবে না এ অসমর্থ দেহ। শশাঙ্ক, সুকল্যাণ অরুণাভ, প্রসাদরা সাধনা করিতেছে। দীর্ঘজীবী হউক উহারা। উহাদের আপ্রাণ চেষ্টা সফল হউক। প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করে বৃদ্ধা।

গঙ্গার বুক হইতে উঠিয়া আসে একটা অস্থির হাওয়ার ঢেউ। ক্ষণিকের জন্য জুড়াইয়া দিয়া যায় রৌদ্রতপ্ত দেহটাকে। আরামের একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হয় মুখ হইতে—আঃ।

আবার হাটিতে আরম্ভ করে সে লাঠিতে ভর দিয়া। তেল লইয়া ফিরিতে ফিরিতে বেলা ঢলিয়া পড়ে। ঘরের দাওয়ায় লাঠিটা রাখিয়া বসিয়া পড়ে বৃদ্ধা। গলা কাঠ হইয়া গিয়াছে তৃষ্ণায়। এদিকে পিয়ন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দুয়ারে। আরও একবার ঘুরিয়া গিয়াছে সে। টাকা আসিয়াছে।

কুসুমলতা তাড়াতাড়ি চশমা বাহির করিয়া নাম সই করে। পাঁচটি টাকা গুণিয়া লয়। পিয়ন কুপনটা ছিঁড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

কুসুমলতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা কুপনটা পড়ে মন দিয়া। দুঃখের সহিত জানাইয়াছে প্রকাশ, আগামী মাস হইতে সে আর টাকা পাঠাইতে পারিবে না। তাহার নিজের সংসার লইয়াই ব্যস্ত—তাই দূর আত্মীয় মামী, পিসী, খুড়ি জ্যেঠীর খোঁজ লওয়া আর সম্ভব নয় তাহার।

কুসুমলতার হাত হইতে খসিয়া পড়ে কুপনটুকু। একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করে ভিতরে। এতখানি রূঢ় না হইলেও পারিত প্রকাশ। প্রকাশের শিশু মুখখানা ভাসিয়া উঠে চোখের সামনে। সেই আধ-আধ কথা।

প্রকাশ মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহাকে কাশী আসার পূর্বে।

এই দুর্মূল্যের বাজারে কিভাবে যে কি চালাইবে ভাবিয়া পায় না কুসুমলতা। কি দিয়াই বা ঘরভাড়া দিবে এমাসের।

ঘরে গিয়া জল খায় কানাভাঙ্গা একটি পাথরের গ্লাসে, পিপাসা নিবৃত্ত হয়, কিন্তু চিন্তার উপশম হয় না।

রাস্তা দিয়া এক পুরান কাগজক্রেতা ডাকিয়া চলিয়াছে "কাগজ বিক্রী।" "পুরান কাগজ।"

রোজই যায় লোকটি এই রাস্তা দিয়া।

ঘরের কোণায় টিনের ভাঙ্গা সুটকেসটায় চোখ পড়ে—কাগজ বোঝাই সুটকেসটা দেখে কুসুমলতা নিবিষ্ট চোখে। বিগত জীবনের অধ্যায় সাজান কাগজের স্তরে স্তরে। কবিতা, প্রবন্ধ সভাসমিতি, বালিকাবিদ্যালয় সম্পর্কিত বহু প্রয়োজনীয় লেখা সব।

রাস্তা হইতে ক্রমেই নিকটে ভাসিয়া আসে কাগজওয়ালার চিৎকার "কাগজ বিক্রী।"

কুসুমলতা উঠিয়া ডাক দেয় লোকটিকে। অতি কষ্টে সুটকেসটি টানিয়া আনে বাহিরে। কিন্তু কাগজের ক্রেতা আপত্তি জানায় "এত মা বহু পুরান কাগজ। আর বড় ছোট ছোট। পত্রিকার কাগজ নেই?"

কিন্তু বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাইয়া একটু দয়া হয় তাহার। "আচ্ছা নিয়ে যাই। ঠোঙা বানান চলবে। কিন্তু দাম কিছু কম হ'বে।" পালা পানসারায় ওজন হইতে থাকে কুসুমলতার সমস্ত জীবনের সাধনা। মাপিয়া ওজন করিয়া দাম ঠিক করে পুরান কাগজের ক্রেতা। "দুই টাকা সাড়ে দশ আনা।" কুসুমলতা কম্পিত হাতে গুণিয়া লয় দুই টাকা সাড়ে দশ আনা পয়সা। লোকটি গুছাইয়া লইতে থাকে কাগজ পত্রগুলি। একখানা পুরান খাতায় চোখ পড়ে আবার, পালা হইতে তুলিয়া লয় কুসুমলতা খাতাখানা, "দেখি একটু এই খাতাটি।" তাহারই বিগত জীবনের সকরুণ রোজনামচা। শেষবারের মত চোখ বুলায় সে। গাঢ়

ব্য থা ঘনাইয়া উঠে চোখে। প্রতিটি পাতা তাহারই বুকের রক্ত দিয়া লেখা যৌবনের প্রতিটি সন্ধ্যায়।

লোকটি একটু ব্যস্ত হইয়া উঠে, "মা বেলা, আর নেই। আমাকে অনেক দূরে যেতে হ'বে।"

কুসুমলতা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া দেয় খাতাখানা। লোকটি চলিয়া যায়।

বৃদ্ধা পয়সাগুলি হাতের মুঠিতে চাপিয়া বসিয়াই থাকে দুয়ারে। উঠিবার শক্তি আর নাই। অবশ হইয়া গিয়াছে যেন তাহার দেহের অবশিষ্ট শেষ শক্তিটুকু। মনে হয়, আজীবন স্নেহ মমতায় প্রতিপালিত একটি জীবন্ত সন্তানকেই বিক্রী করিয়া দিল সে আজ দুই টাকা সাড়ে দশ আনা পয়সার বিনিময়ে।

বিকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে পদ্মা অরুণাভের জন্য। সে জানে এ সময়ে সে আসিবে না। তবু একটু ক্ষীণ আশার ছোঁওয়া লাগিয়া থাকে মনের এক জাগ্রত কোণায়।

চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে পদ্মা, সবইত আছে তাহার, তবু বিরাট এক শূন্যতা যেন চাপিয়া থাকে সর্বক্ষণের জন্য মনের অতলে। অবুঝ ব্যথার ক্রন্দন আকাশে বাতাসে। চোখের পর্দার তলায় জল জমিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া। কিন্তু কাঁদিতে পারে না সে। শুধু ব্যথার চাপ অনুভব করে অনুক্ষণ।

মাঝে মাঝে মনে হয় তাহার, এক দিগন্ত-না-পাওয়া প্রকাণ্ড শূন্য মাঠের বুকে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি এ চাপা ক্রন্দনগুলি হালকা হইত মন হইতে।

মনে হয়—সবচাইতে বড় পাওয়া হইতেই বঞ্চিত তাহার সমস্তটা জীবন। পৃথিবীর এই রূপলাবণ্যময়ী প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর আবরণ দিয়া স্নেহ-পিপাসু শিশুমনের চাহিদাকে কিছুটা ভুলাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল সে। কিন্তু আজ আরম্ভ হইয়াছে সেই বঞ্চিত প্রাণশিশুর কান্না। ফাঁকি দিয়া ভরা মনের আর্তনাদগুলিকে ঘুমপাড়ানীর গান দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে আজ আর যেন পারিতেছে না সে।

এত অজস্র মানুষেরই সহ-পথচারী সেও ত। তবু কেন এত একা মনে হয় নিজেকে, একলা পথচলার শ্রান্তি আসে মনে। খুঁজিয়া বেড়াইতেছে তাহার মন সেই না-পাওয়া চিরবাঞ্ছিতকে—প্রাণের সহচরীকে।

মাঝে মাঝে অনুভব করে পদ্মা, যেন পৃথিবীর কোন এক নিবিড়তম শেষ সীমানায়, যেন এই অগণিত অর্বুদ মানুষের বহুদূরে—সীমাহীন আড়ালে, তাহারই প্রতীক্ষায় জাগিয়া আছে তাহার একান্ত ব্যথার জন।

স্নেহ পিপাসার কি গভীর কামনা—কি গভীর বেদনা! শূন্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন মিশিয়া আছে এই স্নেহ-কাতরতা।

পদ্মা ডাকে বুকভাঙ্গা অস্ফুট স্বরে, "উঃ—মা—মাগো—কোথায় তুমি —কতদূরে।"

তাহার ভিতর হইতে কেহ যেন বলিয়া দেয় ক্ষীণ কণ্ঠে—"আছে আছে সে।"

বহু বহু দূরে তাহার মনের দৃষ্টির দিগন্তে, এই পৃথিবীরই মাটিতে আলোতে বাতাসে মিশিয়া আছে তাহার সেই চিরবাঞ্ছিত মমতাময়ী শেষ আশ্রয়।

পদ্মার নিস্পলক চোখের মণির অতল গভীরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসে এক সুন্দর স্নিগ্ধ শিশুর ছায়া। পরী—তাহারই পরী! তাহার জীবনের শেষ সম্বল—শেষ আশ্রয়।

পদ্মা উঠিয়া যায়। খেলায় রত মেয়েকে কোলে তুলিয়া আদর করে। করুণ-কাতর আবেগে বলে সে "পরী মা—তুমিইত আমার মা—আমার একমাত্র আশা। তোমার এই ছোট্ট বুকখানাইত আমার শেষ আশ্রয়।"

স্নেহ-ঝরা কোমল চুম্বন করে অজস্র। পরীও একটু স্থির চোখে তাকাইয়া গ্রহণ করে মায়ের এ স্নেহার্দ্র আদর। বুঝিতে চেষ্টা করে বুঝি বা সে মায়ের আবেগে ভেজা কথাগুলি। মৃদু বিস্ময় ঝরে শিশু-চোখে। জীবনের স্বাদ গ্রহণ করে সেও। শিশুর মা তাকায় অপলক মায়াময় চোখে। চারিটি চোখের এ মিলন-আবেশে ধরা দেয় আদিমতম পৃথিবীর প্রথম রহস্য। প্রাণের ধারা বহিয়া চলে ধরিত্রীর বুকে।

বিপাশা উঠিয়া বসিয়াছে। পদ্মা লক্ষ্য করে, বিশ্বরূপের চোখে স্বস্তির নিশ্বাস ঝরিতেছে। এ কয়দিন নিদারুণ উদ্বেগের কাল ছায়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে।

গভীর স্নেহ আর দুশ্চিন্তার চাপ ভিতরে, তবু বাহিরে ধীর, স্থির প্রশান্ত, কোমল।

বিপাশার পাশে বসিয়া পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতেছে বিশ্বরূপ। পদ্মা চা লইয়া আসে। বেতের ছোট একটা টেবিলের উপর রাখে চায়ের সরঞ্জাম। পরীও হাজির হয় যথাসময়ে।

"কম, লাল ছেলাম।"

বিপাশা হাসিয়া বলে, "লালসেলামের ঘুষ দেওয়া হ'চ্ছে মেয়ে। লালসেলামের বদলে শুধু রুটিই পাচ্ছ না আর এরকম লাঠির বাড়িও পেতে হ'বে। যে যুগে জন্মেছ।"

বিশ্বরূপকে কমরেড ডাকিতে শিখাইয়াছে পদ্মা। পরী সম্পূর্ণটা বলিতে পারে না। শুধু "কম" ডাকে তাহাকে। বিশ্বরূপ আদর করিয়া হাত বুলায় মাথার নরম ঝাঁকড়া চুলগুলিতে।

অরুণাভ ঘরে ঢুকিয়া বলে, "খুবত আদর কুড়ানি মেয়ে।" বিপাশার দিকে তাকাইয়া বলে, "বাঃ বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে আজ বিপাশাকে। আর এ কদিন যা হিমসিম খাইয়ে তুলেছিল শ্রীমতী আমাদের।"

পদ্মা মেয়েকে বলে, "যাওত পরী, কাকাকে তুলে আন।"

পরী ছুটিয়া যায়। অরুণাভ বলে, "কাকার এখন মাঝরাত্রি দেখে এলাম। তিনি এখন উঠলেই হয়।"

সুপ্রিয় ঘরে ঢোকে, "না উঠে উপায় আছে? যা একটি কন্যা সৃষ্টি করেছ। নাকের ভিতর পেনসিল ঢুকিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ছাড়লো তোমার মেয়ে।"

বিপাশা হাসিয়া বলে, "বোধহয়—নাক ডাকছিলে। ও তাই একটু পরীক্ষা করে দেখে এল ব্যাপারটা কি।"

স্থপ্রিয় বলে, "পরী কি আমাদের ছোট্ট খুকু রয়েছে এখনও ভাব তোমরা। কাল বিকেলে দেখি, তিনি একটা কুকুরকে সমানে বকে চলেছেন মোটা গলায় 'কুকুর, ফের বলছি রাস্তায় যেও না। রক্ত পড়বে। আমি কিন্তু ওষুধ দিতে পারবো না। যেওনা বলছি কুকুর।' তাকিয়ে দেখি, কুকুরের অপরাধ, সে গাড়ীচাপা পড়ে রক্তপাত হওয়ার ভয় অগ্রাহ্য করেই বড় রাস্তার দিকে চলেছে।"

স্থপ্রিয় সস্নেহে তাকায় পরীর দিকে। "মেয়েটাও কাছে টানার যাদু জানে।"

প্রসাদ উপস্থিত হয় আসরে।

"কি খবর। এ অসময়ে যে।" ঠাট্টা করে অরুণাভ। "অসময়ে মানে? এর চাইতে যোগ্য সময় আর কি হত? রুটী মাখন জেলী। দস্তুরমত ফিস্ট। রোগীর নাম করে বুঝি শুশ্রূষাকারীদের দিব্যি চলছে।" বলিয়া একটা চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লয়। পদ্মা তাহার হাতের একটা বাণ্ডিলের দিকে তাকাইয়া বলে, "কি লিফলেট উড়বে নাকি আকাশ থেকে।"

"তা মাঝে মাঝে একটু আধটু না উড়লে ভরসা আসে কি করে— আমরা যে বেঁচেই আছি তার প্রমাণটাত চাই।"

বিপাশার দিকে তাকাইয়া দেখে একটু খুশির চোখে। "হাতটা ঠিক হ'য়ে গেছে ত।"

মাধুরী মাখা গৃহপরিবেশ। বহুদিনের দুশ্চিন্তার পর স্থন্দর হইয়া উঠিয়াছে সকালটুকু। প্রসন্ন মুখ সকলেরই।

বিপাশা বলে, "স্থপ্রিয়দা গান শোনার মতই কিন্তু আজকের সকালটা।

বিশ্বরূপ বলে, "ঠিকই বলেছে বিপাশা। গান দিয়েই অভিনন্দন জানিয়ে যাও স্থপ্রিয়।"

সুপ্রিয়, পদ্মা ও প্রসাদ গান ধরে একসঙ্গে : "আভ্ কোমরবান্ধ্ তৈয়ার হো লাখো কোটী ভাইয়োঁ ।।"

ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ আহ্বান।

সুরের ইন্দ্রজাল ছড়াইয়া পড়ে—প্রতিজ্ঞাদীপ্ত চোখেমুখে। গান শেষ হয়, তবু সুরের ধুয়া জড়াইয়া থাকে রৌদ্রস্নিগ্ধ ঘরখানিতে।

পরী কি চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠে হঠাৎ সকলের মৌনতা ভঙ্গ করিয়া, "কাকা, আবাল গাও।"

সকলে হাসিয়া উঠে। সুপ্রিয় বলে, "মেয়ে, তুমি যে মার স্বভাবটিই কেড়ে নিয়েছ।"

সন্ধ্যাবেলা পদ্মা উনানে আগুন দিয়া রাতের রান্নার আয়োজন সারিয়া লয়। পরীও আছে সাথেই। প্রতি কাজে মাকে সাহায্য করা চাই তাহার।

ডাল ফুটিতেছে কড়াইয়ে। পরী আসিয়া কতকগুলি নুন দিয়া দেয় ফুটন্ত ডালে। পদ্মা চেঁচাইয়া উঠে "এই যা, কি করলি, আজ আর কারও ডাল খেতে হ'বে না।"

পরী মাকে রাগিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসে তাহাকে খুশি করিতে, ছোট নরম হাতে মায়ের গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকে আদরকরান সুরে, "মা, কে বকেছে?" বাবা বকেছে তোমায়?"

পদ্মা হাসিয়া ফেলে।

"তোমায় আগে ঘুম পাড়িয়ে নি। না হ'লে কোন কাজ করতে দেবে না।" মেয়েকে কোলে শোওয়াইয়া ঘুমপাড়ানীর ছড়া

বলে পদ্মা। অশান্ত, ডাগর চোখে ধীরে ধীরে ঘুম জড়াইয়া আসে মায়ের কোলের একান্ত নির্ভরতায়।

ততক্ষণে চাঁদও উঠিয়া পড়ে আকাশে। আবেশ ঢালা ফিকা জ্যোৎস্না। পদ্মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে ঘুমন্ত মেয়েকে। তার ঘন কাল চোখের পাতাদুই টিতে মায়ার তুলি বুলান যেন।

পদ্মা মনে মনে বলিয়া উঠে, "কি সুন্দর, অপরূপ সুন্দর এই পৃথিবী আর পৃথিবীর এই সন্তান।" উনানের উপর ডাল সিদ্ধ হইয়া যায়। পদ্মা উঠিয়া গিয়া মেয়েকে শোওয়াইয়া রাখিয়া আসে পরিপাটি বিছানায়। অরুণাভ আসিয়াছে। কতকগুলি কাগজ পোড়াইতে আসে সে উনানের পাশে। জলন্ত উনানের লাল আভা আসিয়া পড়িয়াছে পদ্মার চোখে মুখে—অরুণাভ দাঁড়াইয়া একটু দেখে। বড় ম্লান বড় বিষণ্ণ, যেন দেখাইতেছে তাহাকে। পদ্মা উৎকণ্ঠার সাথে জিজ্ঞাসা করে, "কি হ'য়েছে।" চিন্তিত স্বরে বলে অরুণাভ, "সংবাদ খুব খারাপ পদ্মা। বড় দুর্দিন এসে গেল আমাদের। আমাদের পার্টি বেআইনী হ'য়ে গেল।"

পদ্মা স্তম্ভিত হইয়া যায়। ইহা যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জানিত সে, তবু আজ সংবাদটা বড় বেশী আকস্মিক মনে হয়। অদূরবর্তী এক অমঙ্গলের আশংকায় স্তব্ধ হইয়া যায় চেতনার সমস্ত স্নায়ুগুলি। বড় অবশ লাগে শরীর মন। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে সে, কি ভীষণ দুর্দিন আসিতেছে সম্মুখে। তাকাইয়া দেখে স্বামীর মুখে কত দুশ্চিন্তার গভীর উদ্বিগ্ন ছায়া নামিয়াছে।

অরুণাভ ঘুমন্ত মেয়ের কপালে মৃদু চুম্বন করে। পিতার আশীর্বাদ ঝরে উদ্বেগ কাতর চোখে। পদ্মাও উঠিয়া আসিয়া বসে পাশে। নিবিড় মমতায় ধরে তাহার বহু কাজের দায়িত্ব আঁকা বলিষ্ঠ হাতখানা।

আর বেশীদিন নয় এ ঐকান্তিক কাছে পাওয়া। নিঃশব্দ রাত্রির স্তব্ধতায় কত ব্যথা, কত বেদনা ঘন হইয়া উঠে। লক্ষকোটি আর্তনাদে ডুকরাইয়া কাঁদে পদ্মার অন্তরাত্মা। এই সুন্দর স্নিগ্ধ গৃহপরিবেশকে নিষ্ঠুর পদক্ষেপে পিষিয়া মারিতে চায় উহারা। নারীহৃদয়ের অন্তস্বত্বা কল্যাণী কামনাগুলি অভিশাপ ছড়ায় রাবণের বংশবীজের গায়ে।

নীচে রাস্তা দিয়া ভারী বুটপরা একদল সঙ্গিনধারী পুলিশ সশব্দে মার্চ করিয়া যায়। মধুর গৃহ-আঙ্গিনার প্রাণদেবতাকেই ছিনাইয়া লইতে আসিতেছে যেন উহারা। তাই এত আর্তনাদ উঠিয়াছে শান্তিকামী মানুষের ব্যথায়, বুদ্ধিতে আর কামনায়।

ছাত্রদের উপর আবার গুলি চলিয়াছে। একটি ছেলে মারা গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে। স্তম্ভিত হইয়া উঠে রাস্তার মানুষেরা। বাতাসের আগে আগে এ চঞ্চল সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। অরুণাভ সারাদিন ঘোরে সাইকেলে রাস্তায় রাস্তায়। স্বাধীন ভারতের প্রথম অভিনন্দন—গুলিকে কে কি ভাবে গ্রহণ করিতেছে লোকে, দেখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া। ক্ষুব্ধ ছাত্রদের সায়েস্তা করিতে ছুটিতেছে সঙ্গিনধারী দেশী-বিদেশী পুলিশ বোঝাই ট্রাকগুলি।

আরেকদিকে স্পষ্ট রৌদ্রের তলায় তরুণ দেহের কাঁচা রক্তগুলি জমিয়া জমিয়া উঠিতেছে। থান থান জমাট-বাঁধা রক্ত আগুন জ্বালাইয়া দেয় মস্তিষ্কে।

চতুর্দিকে তাকাইয়া দেখে অরুণাভ—ক্ষুব্ধ ঘৃণায় ফাটিয়া পড়িতেছে ক্রুদ্ধ জনতার চোখমুখ।

"এই স্কুলেপড়া কচি ছেলের বুকে অহিংস গুলি ছুঁড়ে দেশ শান্ত করছেন বীরপুরুষেরা।" অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাকায় এক পরিচিত শিক্ষক, মোড়ে দাঁড়ান বন্দুকধারী সার্জেণ্টের দিকে।

অরুণাভ লক্ষ্য করে নিঃশব্দে। কোন একজন নেতার মোটর গাড়ীটা দ্রুত চলিয়া যায়। ভিড়ের ভিতর হইতে ঘৃণামাখা বিদ্রূপ শোনা যায়, "শালা, উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করতে বেরিয়েছে। এ দেখি ব্রিটিশ আমলকেও ছাড়িয়েছে।"

সুদৃশ্য একটা বাড়ীর সামনে আরেকটি ভিড় জমিয়াছে। রেডিওর সংবাদ শোনার জন্য।

রেডিওতে সংবাদ দেয়—"...ছাত্ররা দেশের শান্তিভঙ্গ করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় পুলিশ গুলি ও কাঁদুনে বোমা ছুঁড়িতে বাধ্য হয়। হতাহতের সংখ্যা এখনও সঠিক জানা যায় নাই।"

আবার বিদ্বেষমাখান মন্তব্য আরম্ভ হয়, "ব্যাটারা সংবাদটা চেপে গেল।"

পথে পথে ভদ্রমানুষের উত্তেজনা লক্ষ্য করে অরুণাভ। মনে মনে ভাবে, ভাঙুক, দ্রুত ভুল ভাঙুক মানুষের।

গভীর রাত্রিতে চমকিয়া উঠে অরুণাভ "প্রসাদ এল নাকি এত রাতে।" উঠিয়া বসে সে। পদ্মা বসিয়া আছে তখনও।

"এ কি দিদি, এখনও ঘুমাও নি।"

"ঘুমত আসছে না—বড় অস্থির লাগছে।"

সমস্ত দিনের সংবাদে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে সে। স্কুলেপড়া ছেলের

প্রতীক্ষায় রত মায়ের কথাটা ভাবিতে পারে না পদ্মা। আর ত সে ঘরে ফিরিবে না শ্লেট, পেনসিল, বইয়ের ব্যাগ লইয়া!

প্রসাদের মুখে রাত ভরিয়া শোনে পদ্মা পুলিশের অত্যাচার কাহিনী। "মেয়েরাও বাদ যায়নি এবার।"

আর্তনাদ করিয়া উঠে পদ্মার সমস্ত অন্তর। ঐতিহ্যময় ভারতের এই কি উলঙ্গ পরিচয়?

অরুণাভ লক্ষ্য করে পদ্মার মুখের বিবর্ণ ছায়া। পদ্মার মনের অবস্থাটা বোঝে সে ও।

অরুণাভ প্রসাদের মশারীটা গুঁজিয়া দিয়া যায়।

"একটু ঘুমিয়ে নাও প্রসাদ।" মনে মনে ভাবে, "আজত দিদির সাথে কথা বলছে, কালই হয়তো কি ঘটে যেতে পারে।" মনে মনেই চমকিয়া উঠে অরুণাভ।

পদ্মা সযত্নে কাঠের পা খানি রাখিয়া দেয় ঘরের কোণায়।

প্রসাদ শুইয়া পড়ে, "শুয়ে পড়লাম দিদি। তুমিও যাও ঘুমাও গিয়ে।"

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া আবার বলে প্রসাদ, "আমাদের বহু ছেলেমেয়েই গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা এখন হাজত ঘরে দিব্যি ছাড়পোকার কামড় খাচ্ছে।" আসলে ঘুম আসে না তাহারও চোখে। সমস্ত দিনের উত্তেজনায় অস্থির, চঞ্চল মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি।

ভোরে উঠিয়াই প্রসাদ বাহির হইয়া যায়।

সমীরের সাথে প্রসাদ ও বিজয় আসিয়া দাঁড়ায় শহরতলীর একটা স্কুলের দুয়ারে। রুক্ষ উদভ্রান্ত চেহারা তিন জনেরই— উস্কোখুস্কো চুল, দৃষ্টিতে অগ্নিকণা।

ষ্ট্রাইক করাইতে আসিয়াছে তাহারা।

এই স্কুলের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠতা জানিয়া গিয়াছে সমীরের। আরও বহুবার আসিয়াছে সে। ইট বাহির করা স্কুলের এই দালান-টার পাশের ছোট মাঠটুকুতে বকুল গাছটার তলায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়া গিয়াছে বহুবার। ছাত্ররা ভালবাসে এই সমীরদাকে। সমীর-দার এই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আর তেজোদ্দীপক দৃষ্টি বহুবার তাহাদের শিখাইয়াছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে।

আজও তাহারা স্কুল ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসে। প্রথমেই বাহির হয় পিল পিল করিয়া ছোট ছেলেরা শ্লেট বই টিফিনের বাক্স হাতে। গুড়ি-গুড়ি ছেলে সব।

স্কুলের সামনের রৌদ্র-ভেজা ছোট্ট মাঠটুকুতে জমা হয় সবাই। রোদে চিক্ চিক্ করে ছোট ছোট শীতে-ফাটা গালগুলি। সমীর আসিয়া দুই ভাগ করিয়া দেয় ছেলেদের। বড়দের একদিকে আর পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত আরেক দিকে। তারপর ছোটদের দিকে তাকাইয়া বলে, "তোমরা এবার বাড়ী চলে যাও।" "কেন, আমরা প্রসেসনে যাব না ?" ছোট্ট কণ্ঠে আপত্তি জানায়।

"আর একটু বড় হ'বে যখন, তখন তোমাদেরও নিয়ে যাব। আজ বাড়ী যাও, কেমন। গুলি টুলি যদি চলে, কি করবে ?" "আমরা মরতে ভয় পাই না।" স্পষ্ট উত্তর আসে ছোটদের ভীড় হইতে।

"তোমাদের নিয়ে যাব আরেক দিন।" সমর্থনের চোখে বলে প্রসাদ। মনে মনে ভাবে "তোমাদেরও দিন আসছে শীগ গীরই।"

ছোটদের ভীড় ভাঙিয়া যায়।

একটি ছোট ছেলে কিছুতেই বাড়ী যাইবে না। ছিটের হাফসার্ট গায়ে পাতলা চেহারা। ড্যাবডেবে চোখ জোড়া কাকুতি জানায়।

কিন্তু তাহাকে লইতে রাজী হয় না বড়রা। সমীর আসিয়া মাথায় মৃদু অনুরোধ মাখা হাত রাখে, "লক্ষ্মী ছেলে—কথা শোন আজ।" অগত্যা বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থাকে সে বইয়ের ব্যাগ হাতে। প্রসেসন করিয়া চলিয়া যায় তাহার স্কুলের বড় ছেলেরা। তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে সে।

সমীর দূর হইতে দেখে, হাফপ্যাণ্ট-পরা ছেলেটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে রাস্তার ধারে। মনটা একটু খারাপ হইয়া যায়। মনে মনে ভাবে' আনলেই হ'ত ওকে। কেমন একটা মমতা মোচড় দেয় মনটায়, ছেলেটির এই ড্যাবডেবে চোখের করুণ দৃষ্টিতে।

দূর হইতে আরেকটা মিছিলের ধ্বনি কানে আসে—মেয়েলী গলার অর্বুদ প্রতিবাদ ফাটিয়া পড়ে, সশস্ত্র সেনার হাতে সঁপিয়া-দেওয়া বিক্ষুব্ধ রাস্তায়, "শিশু হন্তার ক্ষমা নাই।" দূর হইতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পোষ্টারের পর পোষ্টার আগাইয়া আসে। বড় বড় লাল অক্ষরে প্রতিহিংসার বলিষ্ঠ কামনাগুলি আছড়াইয়া পড়ে বিক্ষুব্ধ জনতরঙ্গে। সামনে আগাইয়া যায় সমীর। লক্ষ্য তাহাদের মেডিকেল কলেজের মর্গ।

মেয়েদের প্রসেসনের সাথে চলিয়াছে বিপাশা। উত্তেজিত, সতর্ক চোখ-কান ঘোরে চতুর্দিকে।

একটা পানবিড়ির দোকানের সামনে একজন ভদ্রবেশী মন্তব্য করে, "যত সব কমুনিষ্টদের গুণ্ডামী। ধিঙ্গিগুলিও বেড়িয়েছে আবার।"

"কি, কি বল্লেন! মেয়েদের সম্বন্ধেও কথা বলতে শেখেননি।"

দোকানের ধারে দাঁড়ান বছর বার বয়সের একটি ছেলে গর্জিয়া

উঠে। একটা ইটের খণ্ড তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারে কপাল লক্ষ্য করিয়া। ক্রুদ্ধ জনতাও ফাটিয়া পড়ে সাথে।

অদূরেই টহল দিতেছে এক সশস্ত্র পুলিশট্রাক। মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্য করা অব্যর্থ গুলি আসিয়া লাগে বালকের দেহে। মারাত্মক বিস্ফোরক গুলির আঘাতে আহত বালক লুটাইয়া পড়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন ভাঙিয়া-যাওয়া ভিড়ের মাঝে।

তীরের বেগে রক্ত ছোটে, তবু শেষ ঘৃণা জানাইয়া যায় বালক, "বাঁচবোত? বেঁচে উঠে দালালদের এর জবাব দিতে পারবোত?"

আর কথা বলিতে পারে না, জিহ্বা জড়াইয়া আসে। বিপাশা তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল ছিঁড়িয়া দেয় ক্ষতের মুখে।

ছোট মানুষটির দেহ হইতে রক্তগঙ্গা ছোটে। ভীষণ দৃশ্য। ছাত্ররা সবাই তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া যায় রাস্তার ধারের একটা বাড়ীর অন্দরে। তাহাদের চোখে ভাঙিয়া পড়ে, নির্ভীক বালককে বাঁচাইবার ঐকান্তিক কামনা। সদ্য-ফাটা বোমার মত কানে বাজে বালকের কণ্ঠস্বর "বাঁচবোত? দালালদের এর জবাব দিয়ে যেতে পারবোত?" গৃহপরিজনরা আগাইয়া আসে। মমতামাখা নির্ভর আশ্রয়। ছোট্ট একটি ফ্রকপরা মেয়ে ছুটিয়া পাখা লইয়া আসে; তাহার ছোট্ট ভীরু চোখে আতংক ঘনাইয়া উঠে। গৃহস্বামী দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় ট্যাক্সি ডাকিতে।

কিন্তু গাড়ী আসিয়া পৌঁছিবার আগেই সব শেষ হইয়া যায়। ঘৃণাভরা ছোট চোখজোড়া স্থির হইয়া যায় চিরদিনের মত। কিন্তু চিরদিনের মত জ্বালাইয়া রাখিয়া যায় বিপ্লবী মনের অমর ক্ষুধাকে। ক্ষুব্ধ নিস্তব্ধতা ঘরের ভিতরে। শুধু চোখে চোখে ঘোষণা জানায় প্রতিহিংসার অনন্ত কামনা।

একটি ছেলের পেছনে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে সমীর।

"প্রাণ আছে ত।" ক্ষীণ আশায় উত্তেজিত, অবরুদ্ধ জিজ্ঞাসা। মাথা নত করে সকলে। নিশ্চুপ গৃহপরিজনদের পেছনে আসিয়া দাঁড়ায় সমীর—প্রতীক্ষাকঠিন নিশ্চল মূর্তি। এক মুহূর্তে চিনিয়া ফেলে সে ছেলেটিকে, সকালের প্রত্যাখাত সেই নির্ভীক ছেলে, সেই ছিটের জামাটি গায়ে—রক্তে ভেজা, বিবর্ণ।

সমীর আসিয়া নীরবে বসে মৃত বালকের মাথার কাছে। স্নেহসিক্ত হাতে স্পর্শ করে কিশোর শহীদের হিমশীতল দেহ। মনে মনে শপথ লয়—প্রাণ থাকিতে এ অন্যায়ের কোনও ক্ষমা নাই।

বিপাশা চোখ তুলিয়া তাকায়—অশ্রুভরা, স্থির দৃষ্টি। "সমীর তোমার—" নিষ্ঠুর জিজ্ঞাসায়—কাঁদিয়া উঠে যেন তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা।

"ভাই।" উত্তর দেয় সমীর। অগ্নিগর্ভ সম্মুখের ইঙ্গিতময় সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মুখ নত করে আশ্রয়দাতা গৃহপরিজনেরা। ভদ্রলোকের বৃদ্ধা মা কাঁদিয়া ফেলে, "হায়রে পোড়ারমুখোরা, তোরা যে তোদের নিজের ছেলেকেই মারতেছিস। এ পাপ তোরা রাখবি কই?"

নীচে রাস্তায় অজস্রকণ্ঠে গর্জিয়া গর্জিয়া আসে আরেকটি মিছিল—"কংগ্রেস সরকারের ধাপ্পাবাজিতে—ভুলবো না ভুলবো না।"

পদ্মা হাঁটিয়া চলিয়াছে একটা ঠিকানার সন্ধানে। মনে মনে আওড়ায় আবার বাড়ীর নম্বরটা। পথের নির্দেশটা ঠিক রাখে মনে মনে। সম্মুখে ট্রাম লাইন আঁকা রাজপথ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সবেমাত্র। বহুদিন, বহুবার হাঁটিয়া গিয়াছে সে এই পথে। কিন্তু আজ যেন কোন বিরাট এক সংগ্রামের শুভ যাত্রার পদধ্বনি-গোণা

এ পথচলা। দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার লইয়া চলিয়াছে সে। তৃপ্তির ছোঁওয়া ছুঁইয়া যায় চিন্তাকুল মনে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা লয়— প্রাণ থাকিতে এ দায়িত্বকে ত্যাগ করিবে না সে। অরুণাভ, বিপাশা বিশ্বরূপ, প্রসাদ, সুপ্রিয় আর স্বর্গ—তোমাদের পদচিহ্ন ধরিয়াই যাত্রার আরম্ভ হোক আজ এ মাহেন্দ্র মুহূর্তে। পদ্মা হাঁটিয়া চলে। ছোট্ট একটা ফ্যাক্টরীর দিকে চলিয়াছে একদল মেয়ে মজুর ভোরের হাজিরা দিতে। ক্ষুধিত শিশু আছে কোলে কাঁখে।

পদ্মা মনে মনে বলে, "আগামী কালের জন্মদাত্রী তোমরা, সুন্দর পৃথিবীকে গড়িয়া তুলিবে তোমাদের অকৃপণ সৃষ্টির প্রাণরস দিয়া।"

আবার যুদ্ধের পদধ্বনি ভাসিয়া আসে শব্দ তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপিয়া কাঁপিয়া দুরন্ত সাগরের ওপার হইতে—রেডিওতে ভোরের সংবাদ দেয় :,—

…মার্কিন সৈন্যের বিপুলবাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে দুর্জয় রণ-সম্ভার লইয়া আলাস্কার দিকে।…

পদ্মা স্থির চোখে দেখে ফ্যাক্টরীর মজুরানীদের। ভিতরের মন আর্তনাদ করিয়া উঠে, 'জননী, জন্মদাত্রী, তোমাদের অন্তসত্বা প্রাণ শিশুকে হত্যা করিতে আসিতেছে মানুষেরই অনন্তক্ষমতার বিভ্রান্ত অপপ্রয়োগে।

পদ্মা মোড় ঘুরিয়া যায় একটা গো-বাথানের পাশ দিয়া। তারপর নিঃশব্দে ঢুকিয়া পড়ে এক জীর্ণ বাড়ীর আড়ালে।

কাজ শেষ হইয়া যায়। পদ্মা শ্রদ্ধাবিগলিত চোখে তাকাইয়া দেখে এ মহাযাত্রার সারথীকে—তাহার অগ্নিগর্ভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়াল হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে কল্যাণপ্রসূ স্বজন-স্নিগ্ধতা।

পদ্মা ফেরার পথে হাঁটে। আরও এক জায়গা ঘুরিয়া যাইতে হইবে। ট্রাম বাস, আর পথচারীর পথচলায় ঘন হইয়া উঠিয়াছে

পিচ ঢালা প্রশস্ত রাজপথ। কল্যাণীদের বাড়ীর পাশ দিয়াই হাঁটে। কিন্তু আজ আর সেখানে যাওয়ার কোনও তাগিদ নাই মনে। পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গিয়াছে আজ ভিন্ন আদর্শ-ধরা বান্ধবীদের মধুর সম্পর্কে। গভীর ব্যথার সাথেই বোঝে আজ পদ্মা, বন্ধুত্বের পুরান জীর্ণ গ্রন্থীগুলিকে আর জোড়া দিবার উপায় নাই।

বাসের অপেক্ষায় দাঁড়ায় আসিয়া পদ্মা। আরও দুইটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া বাসের প্রতীক্ষায়। তর্ক করিতেছে তাহারা কলম ধর্মঘটীদের লইয়া।

"এত ষ্ট্রাইক করলে এ শিশুরাষ্ট্রের পক্ষে দেশের উন্নতি করা সম্ভব হয় কি করে।"

"ছাত্রদের উপর গুলি চালানর সময় ত শিশুরাষ্ট্রের শিশুরূপ দেখা যায়নি।" আগুন ঠিকরাইয়া পড়ে যেন প্রতিবাদকারীর চোখে মুখে।

বাস আসিয়া পড়ে। পদ্মা উঠিয়া যায় বাসে। ভদ্রলোক দুইটির তর্ক থামে নাই তখনও।

পদ্মা বাসের জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখে তাহাদের—স্পষ্ট উত্তেজনা চোখেমুখে; ঘৃণা ঝরে সর্বাঙ্গে। যেন যুদ্ধরত বিপক্ষ শিবির হইতে দুইটি সৈন্য মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে দৈবক্রমে।

বাস ছুটিয়া চলিয়াছে। খোলা ময়দান, সুসজ্জিত দোকানপাট, হরেকরকমের বিজ্ঞাপনের বাহার, প্রাসাদ, গীর্জা সব ছাড়াইয়া বাস ছুটিয়াছে। পদ্মার মনও ছুটিয়া চলিয়াছে বাসের মতই দ্রুত।

মাঝে মাঝে চমক ভাঙ্গে, যাত্রীদের ওঠানামায়, কনডাক্টারের চিৎকারে—"একদম রোকে জেনানা আদমী।"

আবার চেঁচায়, "লেইক—লেইক—গড়িয়া হাটা। লেইক গড়িয়া হাটা।" ফুলস্পীডে চলে বাস। মাঝে মাঝে থামে আবার সময়ের হিসাব

লেখাইতে। ভিখারীরা ঘিরিয়া দাঁড়ায়, হকারেরা টেলিগ্রাম লইয়া ছুটাছুটি করে। "জোর খবর, জোর খবর। হায়দ্রাবাদে কমুনিষ্টদের জোর আক্রমণ।" আবার মোড় ঘুরিয়া চলে বাস।

কপাল-জোড়া সিন্দুর পরিয়া হাত গণনা করিতে বসিয়াছে সারি সারি পৈতাধারীরা। পয়সার ছড়াছড়ি, পিতলের থালার উপর; ভাগ্য-পরীক্ষার্থীর ভীড় সম্মুখে। মনে মনে তিক্তস্বরে আওরায় পদ্মা, "এইত ভারতের নিজ রূপ।" হলুদ রংয়ের একটা ঘুরান প্রাচীরের গায়ে কাল অক্ষরে লেখা জ্বল জ্বল করিতেছে—"কম্যুনিষ্টপার্টি জিন্দাবাদ।"

প্রসন্ন হইয়া উঠে মনটা—একটা আশার দীপ্তি খেলিয়া যায় চোখে।

বাস ষ্টপে আসিয়া পড়ে। পদ্মা নামিয়া যায় ভীড়ের আড়ালে।

কয়দিন একটানা রাত্রিজাগা ও দুশ্চিন্তায় বিশ্বরূপের শরীর আবার খারাপ হয়। তবু লেখার বিরাম নাই। যে কোনও মুহূর্তে গ্রেপ্তার হইয়া যাইতে পারে। তাহার আগেই, যে বইখানা নূতন শুরু করিয়াছে, শেষ করা চাই। পদ্মা সারা দুপুর বিশ্বরূপের ঘরে বসিয়া টুকিয়া দেয় পাতার পর পাতা। পড়িয়া শুনায়, বিশ্বরূপের নির্দেশমত অদল বদল করে। বিশ্বরূপ মাঝে মাঝে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু পদ্মার ক্লান্তি নাই। বিশ্বরূপ সস্নেহে দেখে, লিখনরতা পদ্মাকে। মনে মনে ভাবে, বিপাশা ইউ, জি তে ( আত্মগোপন করিয়া আছে )। অরুণাভ, সুপ্রিয়, প্রাসাদের উপর খাঁড়া ঝুলিতেছে। কি হয় কখন বলা যায় না। একা পদ্মা পড়িয়া থাকিবে এ বাহিরের জটিল পৃথিবীর ঘূর্ণিপাকের মাঝে।

একটা অসহায় ব্যথা থাকিয়া থাকিয়া স্পর্শ করে মনে। পদ্মার লেখা শেষ হইয়া যায়।

পাশের বাড়ীতে মধ্যাহ্নের রেডিওতে গাহিতেছে কোন এক ইংরাজ গায়ক—সুরের আড়ালে চলিতেছে পিয়ানোর উঁচুনীচু ঢেউ।

দূরে এক বড়লোকের বাড়ীর ছাদে প্রকাণ্ড তেরঙ্গা পতাকা উড়িতেছে বাতাসে। পদ্মা অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখে। মনের ভিতরে আর্দ্রস্বরে কে যেন বলিয়া উঠে, "জাতীয় জাগরণের ঐতিহ্যবাহী পতাকা তুমি! কিন্তু আজ একি নিদারুণ পরিণতি তোমার?"

পুতুল খেলার বয়স হইতে কত বিস্ময়, কত রোমাঞ্চভরা চোখে দেখিয়াছে সে এই পতাকাকে। কত ব্যথা, কত শ্রদ্ধা জমা রহিয়াছে তাহারই ভাইবোনদের বুকের রক্তে-রাঙ্গা ঐ মায়াময় রঙ্গের আড়ালে।

কিন্তু আজ শুধু বিদ্বেষে জড়াইয়া আসিতে চায় আশৈশবের শ্রদ্ধার কুহেলীমাখা চোখগুলি। শুধু ঘৃণায়। ইংরাজী প্রোগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে রেডিওতে। আবার হিন্দিতে গাহিতেছে কে—"ঝাণ্ডা উঁচা রহে…।"

কোন এক শ্রমিকদের সভায় দেখিয়া আসা লাল ঝাণ্ডার উজ্জ্বল ছবিটা ভাসে তাহার চোখের সামনে।

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবনানুভূতিকে অভিনন্দন জানায় সেই সুদীপ্ত পতাকা।

পদ্মা মনে মনে উচ্চারণ করে, "ইতিহাস সৃষ্টিকরা এ ঝাণ্ডা উঁচাই থাকিবে পৃথিবীর বুকে। অন্যায়ের পদলেহিত মানুষের এই অকল্যাণী গর্বগুলি চূর্ণ হইয়া যাইবেই একদিন।

একটি ভদ্রলোক আসিয়াছে বিশ্বরূপের কাছে। পদ্মা উঠিয়া আসিয়া চেয়ার টানিয়া দেয় বসিতে।

পদ্মার দিকে একটু তাকাইয়া বলে ভদ্রলোকটি, "কেমন আছেন? শরীর যেন বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না।"

উত্তর দেয় বিশ্বরূপ, "ভাল আর দেখাবে কি করে। ভাল থাকতে দিতে রাজী কি আর তোমরা?"

বিশ্বরূপের কথার ইঙ্গিতে বন্ধুটি একটু অপ্রস্তুত হইয়া সামলাইয়া লয়।

"তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কথা হ'চ্ছে, আমাদের অবস্থায় পড়লে আপনারাও ঠিক এই বিধানই, দিতেন। আমরাও তখন রেহাই পেতাম না। আপনাদের হাতেও তখন লাঠি গুলি সবই চলতো।"

বিশ্বরূপ জবাব দেয়, "গুলি চালান বা লাঠি চালান এটাই বড় কথা নয়। কে কি আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করছে, সেটাই বড় কথা।"

যুক্তির উপর পাল্টা যুক্তি, উদাহরণের পিঠে উদাহরণ। পদ্মা তন্ময় চিত্তে ভাবে, মানুষের মনের অন্তর্নিহিত কামনা—শান্তিপূর্ণ জীবনের ছবিগুলি কি স্বপ্ন হইয়াই থাকিবে চিরদিন? সে স্বপ্ন জীবনে দেখা দিবে কবে? কত দূরে আর!

ক্ষুধিত পশুর চিৎকারের মত রব উঠিয়াছে চতুর্দিকে—শৃঙ্খলা আর আইন; আইন আর শৃঙ্খলা। কিন্তু কিসের জন্য এ আইন! বাঁচিবার জন্যইত। এ সুন্দর পৃথিবীতে, সুন্দর ভাবে বাঁচিবার জন্যইত মানুষের প্রথম আইনের সৃষ্টি।

সুপ্রিয় একমনে পত্রিকাটায় চোখ বুলায়। জার্মানীকে লইয়া

আবার এক ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। আবার আরেক মহাযজ্ঞের কুট আয়োজন দিকে দিকে।

পত্রিকাটা হাতে লইয়া পদ্মার ঘরে ঢোকে সুপ্রিয়। আজই চলিয়া যাইবে সে, খবরটা জানান হয় নাই পদ্মাকে। ইচ্ছা ছিল আর এক সপ্তাহ থাকিয়া যাওয়ার। কিন্তু উপায় নাই। অন্তরের অনুরোধকে বড় করিয়া দেখার দিন হয়তো আসিবে একদিন, কিন্তু আজ এ হৃদয়ের ব্যথাকে পথের সঞ্চয় করিয়াই চলিতে হইবে শুধু।

নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে সুপ্রিয়। পদ্মা দেখিতে পায় না তাহাকে। একমনে কথা শুনিতেছে সে মেয়ের পায়ের কাছে মেঝেতে বসিয়া আর বক্তা বসিয়া আছে, পরী, চৌকীর উপর পা ঝুলাইয়া। সাম্রাজ্ঞীর মত লীলায়িত গর্বিত ভঙ্গী তাহার ক্ষুদ্র নরম গ্রীবায়। অশান্ত মনের চূর্ণ চূর্ণ হাসিগুলি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে ডাগর চোখের কোণায়।

সুপ্রিয় অপলক নেত্রে দেখে। কি মধুর, কি অপরূপ মধুর এই গৃহকোণ। কিন্তু কয়দিন আর?

একটু আবৃত্তির সুরে বলে সে, "পরীরানী, তোমার মা ত দেখছি, 'বিশ্বের রহস্যখানি তোমাতেই করিয়াছে অনুভব।"

পদ্মা লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া তাকায়। হাতের পত্রিকাটার দিকে তাকাইয়া বলে, "বোস, বল নূতন কি খবর আছে পত্রিকায়।"

"ইঙ্গ-আমেরিকান অধ্যায় শেষ না হ'তে কি আর নূতন খবর পেতে চাও পত্রিকায়। একেবারে ছক আঁকা ষড়যন্ত্র ঘরে বাইরে, সর্বত্র। কপালে বিস্তর দুঃখ আছে পদ্মাবতী। প্রস্তুত হ'য়ে থাক। মা হয়েছো, শেল ত তোমাদের বুকেই পড়বে।"

পরী উঠিয়া যায়। ঘরের কোণায় বসিয়া শূন্যের সাথে কথা বলিয়া চলে, "তুমি আলতা পলবে, মালা পলবে? চুলি পলবে?"

সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে, "ও কার সাথে কথা বলছে ?"

পদ্মা হাসে। "ও, ওর কাল্পনিক ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। দেখছো না, কেমন মা মা ভাব ফুটেছে মুখে।"

পদ্মা মেয়ের দিকে স্নেহ-ঝরা নিবিষ্ট চোখে তাকাইয়া বলে, "এমন সুন্দর শিশুগুলিকেও এরা বঞ্চিত করবে ?"

সুপ্রিয় উত্তর দেয় "বিচার হ'বে। এদেরও বিচার হবে।" তারপর যেন খানিকটা আত্মগতভাবেই বলে, "পরীরাণী, তোমাদেরই ত আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই মানুষের চামড়া-পরা প্রেতাত্মাদের হাত থেকে।"

পদ্মা তাকাইয়া থাকে তাহার বলিষ্ঠ কঠিন বাহুর দিকে। এই সব নির্ভীক সাহসী কণ্ঠেইত গর্জিয়া উঠিতেছে দিকে দিকে—"শিশু হত্যার, নারী হত্যার বিচার চাই।"

পদ্মা কান পাতিয়া শোনে, যেন গুরুগম্ভীর বজ্রকঠিন কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী "বিচার হবে—এদেরও বিচার হ'বে।"

পাশের ঘরে অরুণাভ বাহির হইবার জন্য জামা গায়ে দেয়।

পরী ছুটিয়া গিয়া সার্টটা ধরে শক্ত করিয়া—"বাবা তুমি যাবে না। আমার কাছে থাকবে।"

করুণ মিনতি কণ্ঠস্বরে।

অরুণাভের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে। এ পিছুটানকে ছিঁড়িয়াইত যাইতে হইবে তাহাকে। সে দিন আর বেশী দূরে নয়।

বিশ্বরূপ আবার শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। তাহার রোগ-যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাত-ভরিয়া মৃত্যুর সহিতই যেন সংগ্রাম করিতেছে বিশ্বরূপ। পদ্মা সহিতে পারে না এ দৃশ্য। এত বড়

চিন্তাশীল, পাণ্ডিত্যপ্রখর ব্যক্তিকেও এমন করিয়া শ্রান্ত করিয়া দিতেছে রোগ-জীবাণুরা !

পদ্মা প্রাণ ঢালিয়া সেবা করে। তাহার ঐকান্তিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠে রোগাক্রান্ত বিশ্বরূপের চোখে। নারীহৃদয়মথিত এ আন্তরিকতায় আরও একটি নারী-হৃদয়কে কাছে আনিয়া দেয়—বিপাশা।

বিপাশা ও পদ্মা। জীবনের সন্নিকটে দুইটি নারীমনের পরিচয় পাইয়াছে সে। দুইজনেই একটা উপায়হীন প্রশ্নজালেই শুধু ঘিরিয়া রাখিয়াছে তাহাকে। এ জটিল সমস্যা অমীমাংসিতই রহিয়া গেল জীবনে।

পদ্মা পায়ের কাছে বসিয়া হাতের উষ্ণতা দিয়া ধীরে ধীরে গরম করে ঠাণ্ডা পায়ের পাতা। মনে মনে আকুল হইয়া প্রার্থনা করে সে আয়ুর কামনায়।

নিঝুম হইয়া বালিশে কাৎ হইয়া বসিয়া আছে বিশ্বরূপ—প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করিতেছে সে রোগযন্ত্রণাকে নিজের ভিতর গুটাইয়া লইতে।

পদ্মা তাকাইয়া দেখে, বিশ্বরূপের চোখে-মুখে অসহ্য যন্ত্রণার নীরব আর্তনাদ। তবু বাহিরে এতটুকু অস্থিরতা নাই।

পদ্মা নির্বাক্ হইয়া ভাবে, এ মহান্ সহিষ্ণু মানুষের দেহেও এত দুঃখ যন্ত্রনা কেন ? ভিতরে ভিতরে ভয় পাইয়া যায় পদ্মা। অরুণাভ গিয়াছে ডাক্তার ডাকিতে।

বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকায় পদ্মা। সময়ের কি গতিহীনতা ! কখন আসিবে ডাক্তার। প্রতীক্ষায় অস্থির হইয়া উঠে মন। একটা সামুদ্রিক হাওয়া ঘুর্ণিপাক খাইয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়—জানালা দিয়া। বিশ্বরূপ পাশ ফিরিয়া বসে পদ্মার দিকে, বালিশে হেলান দিয়া। পদ্মা তাকায়—ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি।

"কিছু চাই, বিশ্বদা ?"

এই প্রথম পদ্মা বিশ্বরূপকে ভ্রাতৃত্বের সম্বোধনে স্বীকার করিতে পারিল। কৃত্রিম প্রচেষ্টায় যে সম্বন্ধকে মন হইতে স্বীকার করিতে বছর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছে পদ্মা দিনের পর দিন, আজ উহা এই উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্তে সহজগতিতে স্বাভাবিক হইয়াই ধরা দিয়াছে তাহার মনে। বিস্মিত হয় পদ্মা।

বিশ্বরূপও লক্ষ্য করে এ ভ্রাতৃত্বের সম্বোধন। তাকায় সে পদ্মার মুখের দিকে—তৃপ্তিভরা আনন্দের মৃদু স্নিগ্ধতা সে দৃষ্টিতে। সস্নেহে, নিঃশব্দে পদ্মার হাতখানা ধরিয়া ডাকে অস্ফুটস্বরে "পদ্মা।" কিন্তু পদ্মা লক্ষ্য করিতে পারে না বিশ্বরূপের এ আশীর্বাদ। আকুল হইয়া বলে সে, "বিপাশাকে সংবাদ পাঠাই ?" অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বিশ্বরূপ আবার, "এত ভয় কেন, ভীতু মেয়ে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে সে। দুয়ারে মৃদু টোকা পড়ে।

অরুণাভ ও বিপাশা ঘরে ঢোকে।

বিশ্বরূপের ঘুম ভাঙিয়া যায়; "কে পাশা? তুমি এলে!"

"এক ঘণ্টার জন্য শুধু।" নীরবে হাতখানা তুলিয়া লয় সে, "এখুনি ডাক্তার সেন আসবেন। ইনজেকসন দিলেই যন্ত্রণা কমে যাবে।" একটু থামিয়া বিপাশা আবার বলে, "আমি কালও আবার আসবো রাত্রিতে, যদি ওয়াচ না থাকে বাড়ীতে।"

বিশ্বরূপ মৃদু স্বরে বলে, বিপাশার হাতটা একটু চাপিয়া ধরিয়া, "উঁহু, এসো না আর।" একটু জিরাইয়া আবার বলে, "মন ত শক্ত করতেই হ'বে তোমাদের। প্রস্তুত হও।"

কথা বলা নিষেধ। মনে মনে ভাবে বিপাশা, এই হয়তো শেষ কথা। হয়তো জীবনের এই শেষ দেখা। তাই জানাইতে দেয়

বিপাশা, অতি কষ্টে উচ্চারিত বিশ্বরূপের এ হৃদয়ের অনুরোধকে। কিন্তু তাহার ভিতরটা যেন সহস্র কণ্ঠের নিঃসঙ্গ করুণ জিজ্ঞাসায় চুরমার হইয়া যায়, বিশ্বরূপ বাঁচিবে ত?

ডাক্তার সেন আসিয়া পড়ে। ইনজেকসন ফুঁড়িয়া দেয় রগে। সকলেরই মনে মৃদু আশা উঁকি মারিয়া যায় ইনজেকসনটা ফোঁড়ার সাথে সাথে—হয়তো এ যাত্রা বাঁচিয়া উঠিবে বিশ্বরূপ।

পদ্মা ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া "আশংকার কিছু নেইত ডাক্তার সেন?"

ডাক্তার উত্তর দেয় ধীর গম্ভীর সমব্যথার স্বরে। এ প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব তাহারও ত কম নয়। এ প্রাণের মূল্য যে কত, একজন কমরেডের জীবনাবসানের ক্ষতি, জানে বৈকি, জানে সেও। অন্তর দিয়াই অনুভব করে সে এ দায়িত্ব। পদ্মার ম্লান মুখের দিকে তাকাইয়া বলে, "ক্রাইসিস কেটে গেলেও, যা দুর্বল, হার্টফেইল করার ভয় আছে। খুব সতর্ক হ'য়ে চলতে হবে কিছুদিন।"

পদ্মার বুক কাঁপিয়া উঠে। তবু একটু যেন আশার সন্ধান পায় ডাক্তারের কথায়।

ডাক্তার চলিয়া যায়। বিপাশাও চলিয়া যায় ডাক্তার সেনের গাড়ীতেই। থাকার উপায় নাই। বাহিরের বিপুল দায়িত্বের ডাকে এ হৃদয়াবেগকে শক্ত করিতেই হইবে। বিশ্বরূপের অনুরোধের মর্যাদা প্রাণ থাকিতে সে অমান্য করিতে পারে না—প্রস্তুতই থাকিবে সে।

চলিয়া যায় বিপাশা। দুয়ার পর্যন্ত নামিয়া আসে পদ্মা। অন্ধকার সিঁড়ি। বিপাশা পদ্মার হাতটা শক্ত করিয়া একটু চাপিয়া ধরে। এ ব্যাকুল স্পর্শে চোখ ভিজিয়া উঠে পদ্মার।

গাড়ীটা মিলাইয়া যায় অন্ধকার একটা গলির ভিতরে। পদ্মা তাকাইয়া থাকে অন্ধকারের দিকে। বিশ্বরূপ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অরুণাভের চোখেও ঘুম ভাঙিয়া আসিতে চাহিতেছে। পদ্মা আসিয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাতখানি রাখিয়া বলে, "যাও, তুমি শোও একটু।"

সারাদিনের পরিশ্রম, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তার আর শেষ নাই। শেষ যে কবে হইবে কে জানে। এইত মাত্র শুরু ভাবে পদ্মা। বিনাশ-পর্বের প্রারম্ভ।

থাকিয়া থাকিয়া কত কান্না যেন বাহির হইতে চায় ভিতর হইতে। যেন একটা সর্বগ্রাসী অমঙ্গল ঘটিতে আসিতেছে তাহাদের জীবনে!

বিপাশা নিরাপদে পৌঁছাইবে ত। আবার বিশ্বরূপের সাথে দেখা হইবেত বিপাশার! সীমাহীন চিন্তায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে মন।

কোণের তেলের বাতিটা মৃদুশিখায় জ্বলিতেছে। একটা ক্ষীণাভ আলোর বলয় প্রদীপের চতুর্দিকে। আধা অন্ধকারে ঘরে ইজি চেয়ারে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকে পদ্মা।—অফুরন্ত চিন্তার ঘূর্ণিবাত্যা।

পৃথিবী ভরিয়াই আজ সহস্র সহস্র প্রাণবলি আরম্ভ হইয়াছে। কত অসহনীয় নৃশংস অত্যাচার। মুখোশধারী কায়েমী স্বার্থের দল নিষ্ঠুরতম জিঘাংসা চরিতার্থ করিতে কতদূর যে নগ্ন উন্মত্ততায় ভীষণ হইয়া উঠিতে পারে, তাহাত দেখিয়াছে তেলেঙ্গনায়—গ্রীসে—চীনে। ছিন্নমস্তক লুটাইয়া পড়িয়াছে রাস্তার তে-মাথায়। তবু এ নির্ভীক আত্মাদের হত্যা করিতে পারে নাই।

অরুণাভ ঘুমাইয়া আছে। তাহারই পাশে পরীও ঘুমাইয়া আছে, নিবিড় নির্ভরতায়। পিতার বলিষ্ঠ বুকখানা ধরা তাহার ছোট্ট হাতখানা দিয়া। অপলক চোখে দেখে পদ্মা।

অরুণাভের ঘুমন্ত মুখখানায় কত চিন্তার ছায়া। মনে মনে বলে সে, কত প্রেম, কত অনন্ত প্রেম এই পৃথিবীতে, তবু এই সুন্দর পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চাহে কোন দুরন্ত রাহু।

পদ্মা বসিয়া বসিয়া ভাবে, যাহারা আছে হাজতে, তাহাদের কথা। কত অত্যাচার অপেক্ষা করিতেছে তাহাদের জন্য ভাবিতেও পারে না সে। ভিতর হইতে এক সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন হইয়া উঠে সমস্ত সত্বা —এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেষবিন্দু শক্তিকে কাজে লাগাইবে সেও।

পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত ছাত্রদের সেই ব্যাণ্ডেজবাঁধা—রক্তে-ভেজা, দৃঢ়মুখগুলি ভাসে নিষ্পলক চোখের সামনে।...

নীচে দুয়ারে আচমকা জোরে কড়ানাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যায় সকলের। এক মুহূর্তে বুঝিয়া ফেলে অরুণাভ পুলিশ আসিয়াছে। তাহারই নাম ডাকিতেছে ঘন ঘন।

পলকের জন্য একটু চোখটা বুলাইয়া যায় সে ঘুমন্ত শিশুকন্যার দিকে, তারপর পদ্মার কাঁধে প্রগাঢ় অনুরোধের মৃদু নাড়া দিয়া বলে, "চল্লাম।"

নিমেষের ভিতর একটা সরু গলি দিয়া বাহির হইয়া যায় অরুণাভ।

পদ্মা দুয়ার খুলিয়া দেয়। বুকের ভিতরে যেন ঝড় বহিতেছে তাহার।

"অরুণাভ বাবু আছেন।" এক ঝলক মদের গন্ধ বাহির হইয়া আসে কথা বলার সাথে।

উপরে উঠিয়া আসে পুলিশ সার্জেণ্ট ও আই বি ইনসপেক্টার। বিশ্বরূপেরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে পদ্মার মৃদুস্পর্শে। যন্ত্রনার উপশম হইয়াছে অনেকটা ইনজেকশনের ফলে। এক মুহূর্তে টের পায় সেও, একটু আশ্বস্ত হয়, অরুণাভ সরিয়া পড়িয়াছে জানিয়া।

আই বি ইনসপেক্টার টেবিলের উপর ছড়ান কাগজ পত্রগুলি উল্টাইয়া দেখে। ঘরগুলিও তল্লাস করে। তারপর বিশ্বরূপের নিকটও একখানা কাগজ ধরে—গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাহারও নামে।

"অরুণাভ বাবুকেত পেলাম না, আপনি একাই চলুন।" পদ্মা বিস্মিত হইয়া বলে, "কিন্তু ওঁর যে শয্যাশায়ী অবস্থা।"

"তা ত আমরাও দেখছি। কিন্তু হুকুমের গোলাম মাত্র আমরা। কি করবো বলুন? তা ছাড়া ডাক্তার ত জেলখানায়ও আছে। অসুবিধা কোনও না হয়—তা নিশ্চয়ই দেখা হ'বে। এখনত আর—ব্রিটিশের জেলখানা নয়।"

পদ্মা কথা বলে না আর। তাহার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে রাস্তার মোড়ের দেওয়ালের গায়ে লাগান পোষ্টারটা—"জেলের ভিতরে আমাদের অসুস্থ শ্রমিক নেতাকে খুন করেছে কারা?"

এইত আরম্ভ। জাতীয় রাষ্ট্রের মুখোশ-ভাঙার দিনের সূচনা।

কিন্তু এই রুগ্ন দেহে বিশ্বরূপ এ পৈশাচিক অত্যাচার সহিবে কি করিয়া ভাবিয়া পায় না।

বিশ্বরূপ স্মিত হাসিয়া বলে পদ্মার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া, "ভয় পাবার কি হ'য়েছে এতে, পদ্মা।"

ধীরে ধীরে পদ্মার উপর ভর দিয়া নীচে নামে বিশ্বরূপ। গাড়ীতে ধরিয়া বসান হয় তাহাকে।

এই হয় তো শেষ দেখা। পদ্মার চোখ ভাঙিয়া জল আসিতে চায়। কিন্তু গভীর বিতৃষ্ণায় চাপিয়া রাখে সে এ উদ্বেলিত অশ্রুকে। এই নিষ্ঠুর শাসনতন্ত্রের যন্ত্রবাহীদের নিকট চোখেরও জল সে ফেলিবে না। বিপাশা, বিশ্বরূপ, অরুণাভকে অপমান করিতে পারে না সে উহাদের সম্মুখে চোখের জল ফেলিয়া।

বিদ্বেষে আর ঘৃণায় রূপান্তরিত হইয়া উঠে পদ্মার চোখের করুণ অসহায়তা।

বিপরীত বাড়ীর রোয়াকে ভোরের পত্রিকা পড়িতেছেন বৃদ্ধ গৃহস্বামী জোরে জোরে।

"আগামী দিনের অগ্নি, আজিকার ভস্মরাশির মধ্যে…"

মোটরে ষ্টার্ট দেয় ড্রাইভার, পুলিশ অফিসারের ইঙ্গিতে। গাড়ীটা দূরে মিলাইয়া যায়। রাস্তার ভবঘুরে ছেলেগুলি দেখে একটু ভিড় করিয়া। সমর্থনসুলভ ছোট্ট মন্তব্য উচ্চারিত হয় উচ্ছৃঙ্খলদের ভিতর হইতে "কম্যুনিষ্টদের উচিৎ শিক্ষা।"

পদ্মা দাঁড়াইয়া থাকে দুয়ারে—নির্বাক, স্তব্ধ, নিশ্চল মূর্তি।

অদূরে বৃদ্ধ গৃহস্বামী পড়িয়া চলিয়াছেন গভীর আবেগে "রক্তমেঘ সঞ্চিত হইয়াছে, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা নিদারুণ আক্রোশে ফাটিয়া পড়িবে। কিন্তু সৈনিক আমরা স্থির থাকিব…"

পদ্মার শিশুকন্যা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পাশে। তাহার ছোট্ট নরম হাত দিয়া জড়াইয়া ধরে মাকে—অবুঝ অসহায় শিশুর আধ-বোলা করুণ জিজ্ঞাসা ঝরিয়া পড়ে স্তব্ধ মৌনী-পৃথিবীর বুকে, "মা, বাবা কই? কম্ কই?"

পদ্মা মেয়েকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরে। সম্মুখে তাকাইয়া দেখে—একফালি রোদ আসিয়া পড়িয়াছে রোয়াকে।

---

২৪.৫.৪৮

কলিকাতা

# শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | লাইন | অশুদ্ধ | | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ১১৬ | ৭ | ঘাই | স্থানে | চাই |
| ১১৭ | ১৫ | রেখা | ,, | রেশ |
| ১১৯ | ৬ | কইয়া | ,, | বইলা |
| ১২২ | ১৯ | টানিয়া | ,, | ঢালিয়া |
| ১২৩ | ২ ও ৪ | তবু | ,, | একটু |
| ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৪০ | | শাশুড়ি | ,, | শাশুড়ী |
| ১২৫ | ১০ | ধর্মের | ,, | যক্ষের |
| ১৩৮ | ১ | হয়েছে | ,, | হইছে |
| ১৪৩ | ১৫ | মারডিং | ,, | সারডিং |
| ,, | ২২ | ক্যামেল | ,, | ক্যাসেল্ |
| ১৫১ | ৯ | সুদূর | ,, | সুন্দর |
| ,, | ,, | পড়ে | ,, | পড়ে না |
| ১৭৯ | ১৪ | ধরা দেয় | ,, | ধরা দিতে চায় |
| ১৮৬ | ১০ | কমলেশ | ,, | সমরেশ |
| ২১১ | ২ | তাহার যে বেগবতী | ,, | তাহার ভিতরে যে বেগবতী |
| ২৭৮ | ৭ | মনে মনের | ,, | মনে মনে |
| ,, | ১৫ | বুদ্ধিও | ,, | বুদ্ধিত |